সাইক্লোন

মণি বাগচি

জিজ্ঞাসা : কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ১৯৫৯

প্রচ্ছদ
শ্রীসুবীর সেন

নাম-পত্রে মাইকেলের নিজস্ব
প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে

প্রকাশক শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯
মুদ্রাকর শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

যুগপ্রবর্তক নাট্যাচার্য

শ্রী শিশিরকুমার ভাদুড়ি

শ্রদ্ধাস্পদেষু

রামমোহন, বিদ্যাসাগর তারপর মাইকেল—উনবিংশ শতকের বাংলায় বিদ্রোহের এই তিন বিগ্রহমূর্তি। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতোই বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে মাইকেল মধুস্দন দত্ত একটি মহৎ নাম। তিনি শুধু আধুনিক বাংলাকাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন নি—নিত্যকালীন কাব্যপ্রেরণার স্বর্ণোজ্জ্বল প্রতীক তিনি। বিদ্রোহী মাইকেল শুধু পয়ারের শৃঙ্খল ভাঙেন নি, বাঙালির মনকেও সেই সঙ্গে চিরকালের মতো শৃঙ্খলমুক্ত করে দিয়ে গেছেন তিনি। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে আমরা যদি পেয়ে থাকি বলিষ্ঠ বুদ্ধি ও বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের নির্দেশ, তাহলে এ-কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে, মাইকেলের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি বিশ্বব্যাপী হৃদয়ধর্মের স্বাদ। মাইকেলের জীবনচেতনা তাই বাঙালির জীবনের অক্ষয় সম্পদ।

'মাইকেল' সেই জীবনচেতনার ইতিহাস।

মণি বাগচি

৪।২বি, রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট
কলিকাতা-৬
১৯৫৯

Madhusudan Dutt

Poet, who first with skill inspired did teach
Greatness to our divine Bengali speech,—

. . ..

The high gods speak upon their ivory thrones
Sitting in council high,—till taught by thee
Fragrance and noise of the world-shaking sea.
Thus do they praise thee who amazed espy
Thy winged epic and hear the arrows cry
And journeyings of alarmed gods ; and due
The praise, since with great verse and numbers new
Thou mad'st her godlike who was only fair.

... ...

No human hands such notes ambrosial moved ;
These accents are not of the imperfect earth ;
Rather the god was voiceful in their birth,
The god himself of the enchanting flute
The god himself took up thy pen and wrote.

—*Sri Aurobindo*

॥ মণি বাগচির অন্যান্য বই ॥

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
মুস্তাফা কামাল পাশা
সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র
ছোটদের বার্নার্ড শ
ছোটদের অরবিন্দ
ছোটদের বিবেকানন্দ
ছোটদের ছত্রপতি
ছোটদের গৌতম বুদ্ধ
কাজলরেখা
লীলা-কঙ্ক
নিবেদিতা
নিবেদিতা-নৈবেদ্য
গৌতম বুদ্ধ
সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস
সিপাহী বিদ্রোহ
নানাসাহেব
রামমোহন
বিদ্যাসাগর
আমাদের বিদ্যাসাগর
বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র
বাংলা সাহিত্যের পরিচয়
কেমন করে স্বাধীন হলাম
আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ
SISTER NIVEDITA
OUR BUDDHA

॥ পরবর্তী বই ॥

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
পলাশির পরে

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

সাগরদাঁড়িতে রাজনারায়ণ দত্তের বাড়ি ও কপোতাক্ষ নদ—
এই ছবি দু'খানি শ্রীসুখরঞ্জন সেনগুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

। এক

কালের এক মহৎ লগ্নে ঊর্ধ্বলোক থেকে এই পৃথিবীতে নেমে এলো একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। এলো সে বাংলার শ্যামল মাটিতে—কপোতাক্ষ নদের তীরে, সাগরদাঁড়ি গ্রামে। কী দাহ সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের! সে দাহ মহতী কামনার দাহ—এক বিপ্লবী-চিত্তের যন্ত্রণাদাহ। দেহ তাকে ধারণ করতে পারে নি। জীবনে নিষ্ফল, কিন্তু কাব্যলোকে অমর।

দৈবী-প্রতিভা নিয়েই এসেছিল সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সেই প্রতিভার সঞ্জীবনী স্পর্শে বাংলাকাব্যের কুঁড়েঘর যেন রূপান্তরিত হয়ে গেল কুসুমদাম-সজ্জিত এক বিরাট প্রাসাদে। ধ্বনিত হলো একসঙ্গে তুমুল মেঘগর্জন ও সিংহনাদ। পয়ার-লাচাড়ী ছন্দ মুখরিত বাণীর দেউলে সহসা আবির্ভূত হলেন সে কোন্ পুরুষসিংহ কবি, যাঁর কবিতা মরকত-দ্যুতির মতো উজ্জ্বল আর দৈববাণীর মতোই অমোঘ? কে সেই মহাকবি, যিনি এলেন মানবধর্মের বৈজয়ন্তী হাতে নিয়ে?

তিনি দত্ত-কুলোদ্ভব মধুসূদন।

তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

সংঘাত-মুখর নবজাগরণের যুগ। সেই যুগে এক নূতন জ্যোতির্ময় ভাবপরিমণ্ডল সৃষ্টি করবার মহতী কামনা নিয়েই মাইকেলের জন্ম। বিশ্বকর্মার নির্মাণশালায় ইতিহাসের এক নিগূঢ় প্রয়োজনে এই প্রচণ্ড প্রতিভার নির্মাণ-কার্য সংসাধিত হয়েছিল অতি যত্নের সঙ্গে। পুরাতন জীবনধারাকে অস্বীকার করে নিজের পৌরুষে বিশ্বাসী নূতন মানবসত্তা তখন বাংলার জীবনে আবির্ভূত হচ্ছিল; তারই প্রথম প্রকাশ রামমোহনে এবং পরিণত প্রকাশ বিদ্যাসাগরে। সেই জীবনচেতনাকে কাব্যে রূপ দেবার জন্যেই মাইকেলের আবির্ভাব।

সুদূর নভোনীলিমা থেকে বাংলার মাটিতে নেমে এলো একটি দুরন্ত প্রবাহ। মাইকেলের জীবন সর্বতোভাবে একটি অলৌকিক প্রতিভার ইতিহাস। স্বল্পায়ু সে-প্রতিভা বিস্তারে ও বর্ণ-বিন্যাসে বিস্ময়কর। সেই রুদ্র চারণ উচ্চারণ করলেন উদাত্ত গম্ভীর স্বরে মহাছন্দ—মহাকাব্যের আকারে রচনা করলেন বাঙালি-জীবনের গীতিকাব্য। গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও ঝঙ্কারে পৌরুষ জাগলো বাঙালির মনে ; জাগলো স্পন্দন-শিহরণ বাংলার কাব্যাকাশে। বাঙালির মানসচেতনায় ঝলমল করে উঠলো কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা। পুরাণ ও পাঁচালির যুগ শেষ হলো ; কপোতাক্ষের জলে কল্লোলিত হলো জলধির উত্তাল গর্জন—অমিত্রাক্ষরের অমৃতধারা। মহাজীবনের সঙ্গীত। কাব্য রচনা নয়—বাণীসৃষ্টি।

এই মাইকেলকে জানবার প্রয়োজন আছে।

বিদ্রোহী মাইকেলের চিত্তে জেগেছিল একটা বিরাট অনুভূতি। নীলাম্বু-বিস্তার ও জল-কল্লোল। সৌধ-কিরীটিনী স্বর্ণলঙ্কার স্বপ্ন দেখেছিলেন মাইকেল। কাব্যের স্বপ্নকে তিনি চেয়েছিলেন বাঙালির জীবন-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করতে। বেণু-বীণার নিক্কণ নয়, কোদণ্ড টঙ্কার। বাউলের একতারা নয়, ক্ষাত্রতেজের বাণীরূপ। ভিখারী রাঘব নয়, বাসব-বিজয়ী মেঘনাদ। অশ্রুমুখী সীতা নয়, বীর্যবতী প্রমীলা। কবিতা নয়—কাব্যবাণী। সেই বাণীর ছন্দের ঘন ঘর্ঘর মন্দ্রে বাঙালি শুনলো গঙ্গোত্রীর ভীমস্রোত। সেই স্রোতে প্রতিফলিত পুরুষের যৌবনদৃপ্ত স্বর্ণকান্ত রূপ। মেঘনাদবধ কাব্যের মেঘনির্ঘোষে প্রতিধ্বনিত মহিমময় পুরুষের বন্দনা। আত্মপ্রত্যয়ের বলিষ্ঠ বাণী। নবজাগরণের প্রাণোচ্ছল ও প্রাণপ্রদ সঙ্গীত।

এই কবিকে জানবার প্রয়োজন আছে।

প্রয়োজন আছে তাঁর জীবনোচ্ছ্বাসের মূল প্রেরণাকে জানবার—তাঁর রহস্যাবৃত, উদ্দাম অসংযত প্রকৃতির কেন্দ্র বিন্দুকে বুঝবার। মাইকেলের

জীবনেতিহাস প্রকৃতপক্ষে একটি অলৌকিক কবি-সত্তার ইতিহাস। অপরিণত-জীবন এক মহাপথিকের ইতিহাস।

বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে কবি মধুসূদন যেন প্রথম বন্ধনমুক্ত প্রমিথিউস। যৌবনের দীপ্ত প্রত্যয় তিনি। মধ্যযুগীয় বৈচিত্র্যহীন পয়ার-লাচাড়ী ছন্দে গ্রথিত বাংলা গাথা-সাহিত্য বিদ্রোহী বিশ্বামিত্রের আবির্ভাবে যেন দীপ্ত হয়ে উঠলো। কাব্য-রমণীর অঙ্গ হতে খসে গেল পয়ারের শিথিল বিন্যাস, লাচাড়ীর বৈচিত্র্যহীনতা। বিদ্রোহী-কবি মাইকেলের মানসলঙ্কায় যে গর্জনোন্মুখ জোয়ার-কল্লোল জেগে উঠেছিল, তারই দুর্নিবার প্রয়োজন মেটাবার জন্যে কোমল কাব্য-রমণীকে হতে হলো বীরাঙ্গনা, প্রমীলার অপরাজেয় প্রমত্ততা নিয়ে তাকে অগ্রসর হতে হলো স্বর্ণলঙ্কার পথে। শ্যামের বাঁশী পরিণত হলো তরবারিতে, গাথা-কাব্যের বুকে সহসা সঞ্চারিত হলো ক্ল্যাসিক্যাল এপিক কাব্যের নর্তনশীল বৈভব।

এই নবসঙ্গীতময় ছন্দের স্রষ্টাকে জানবার প্রয়োজন আছে। "কবির শুধু নামধাম নয়—মৃতজনের পরিচয় নয়—তাঁর অমর আত্মার অমৃতবাণী কান পেতে প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে।" শুনতে হবে বাণীর দেউলে সেই প্রমত্ত মধুপের কবিত্বের 'রাজবদুন্নত ধ্বনি'—যার মধ্যে চিরন্তন হয়ে আছে বন্ধনমুক্ত একটি বিদ্রোহী জীবনের অগ্নিগর্ভ চেতনা।

তাঁর জীবনব্যাপী কাব্যসাধনার ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত আছে মাইকেলের জীবনের ইতিহাস। মাইকেলের সারস্বত সাধনা পার্বত্য নদীর দুর্বার স্রোত—সেই স্রোতোধারায় নবীনের অভিষেক করেছেন তিনি। সহস্র পদচিহ্নাঙ্কিত পথের পথিক নন মাইকেল—তিনি শৈলীর নভোচারী ঈগল। গিরিশৃঙ্গের স্বর্ণাভ চূড়ায় তার ক্ষণকালের পক্ষ-বিশ্রাম—তারপর আবার অনন্ত কল্পনার নভোলোকে বিহার। একনিষ্ঠতার স্বর্ণপিঞ্জর সে-ঈগলের জন্য নয়। কবি সর্বাত্ম, তার কোনো ব্যক্তিক চরিত্র নেই। মাইকেলের কোনো ব্যক্তিক চরিত্র নেই। এক কবিধর্ম ভিন্ন অন্য কোনো ধর্মের আনুগত্য তিনি স্বীকার করেন নি। নবীন জীবনাদর্শের কবি মাইকেলকে বুঝতে হলে সকলের আগে বুঝতে হয় বাংলার নবজাগরণকে।

বাংলার নবজাগরণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মননশক্তির সংঘাত ও সমন্বয়ের ফল।

ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায়, যখনই বাইরে থেকে কোনো নূতন চিন্তার ঢেউ এসে কোনো জাতির চিত্তকে আঘাত করে, তখনই ঘটে সে-জাতির নবজাগরণ এবং ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের উন্মোচন। বাংলাদেশে ইংরেজের আগমনে অনুরূপ ভাবেই ইতিহাসের এক বিস্ময়কর কক্ষের দ্বারোদ্‌ঘাটন হলো। এই দেশে ইংরেজের আবির্ভাব সামান্য ঘটনা নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দুই সভ্যতার মহামিলন ঘটেছে এই বাংলা দেশেই। তাতে ভারতের পূর্ব-প্রান্তে অবস্থিত এই সমতল গাঙ্গেয় ভূমি যে মহাতীর্থের গৌরব অর্জন করেছে, এমন আর কোনো দেশের ভাগ্যেই ঘটেছে কি না সন্দেহ। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও দুই মহাসভ্যতার সমন্বয়ে এমন মহাজাগরণের দৃষ্টান্ত বিরল। স্পেনে এবং গ্রীসে খ্রীষ্টীয় ও ইসলামিক সভ্যতার মিলন ঘটেছিল বটে, কিন্তু সে মিলনে নব-চিত্তোদ্‌বোধনের প্রেরণা ছিল না। একদিকে ছিল প্রচণ্ড আধিপত্য এবং অন্যদিকে ছিল একান্ত অভিভব। ফলে দুই শক্তির সমবায়ে নূতন আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হবার সুযোগ ঘটে নি। কিন্তু বাংলাদেশে তাই ঘটেছে। এর তটভূমিতে ঘটেছে মহামানবসাগরের প্রথম তরঙ্গস্পর্শ।

বাংলার এই নবজাগরণের আরম্ভ পলাশির রণক্ষেত্রে। বাংলার ইতিহাসের এক যুগশক্তির অবসান এবং আর এক যুগশক্তির অভ্যুদয় সেদিন এখানে ঘটেছিল একই সঙ্গে—এ যেন যুগপৎ একই আকাশের একদিকে চন্দ্রের অস্তগমন এবং আর একদিকে বিকশিত অরুণচ্ছটার মধ্যে সূর্যের অভ্যুদয়। এই যুগপৎ পতন আর অভ্যুদয়ই হলো ইতিহাসের চিরন্তন ধারা। এরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ইহলোকের ভাগ্যচক্র। পলাশির প্রান্তরে আমরা সেদিন ইতিহাসের এই লীলাই প্রত্যক্ষ করলাম।

পলাশি বাংলার কলঙ্ক ও গৌরব দুই-ই।

বাঙালির জাতীয় শক্তির চরম পরীক্ষাক্ষেত্র পলাশি। তার জয়-পরাজয় দুই-ই ঘটেছে এখানে একসঙ্গে। পলাশি দেখিয়ে দিলো—রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে বাঙালির সংহতি শক্তি কত দুর্বল। অন্যদিকে পলাশি দেখিয়ে দিলো যে, তখন থেকেই এদেশে যে সংস্কৃতি-সংঘাত আরম্ভ হলো

তাতে দেখা গেল যে, মননশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঙালি দুর্বল নয়। এই মননের ক্ষেত্রে দুই শক্তির মধ্যে যে যুগব্যাপী সংগ্রাম দেখা দেয় তাতে বাঙালি পরাভব স্বীকার করে নি। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহু মনীষীর নায়কতায় সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে বাঙালি যে নূতন ইতিহাস রচনা করেছে, তার তুলনা কোথায় ?

পলাশির আরো একটু পিছনের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামিক—এই দুই সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ ঘটেছিল ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী ধরে। এই দুই মনোধারার মিলনকে দারা শিকো তুলনা করেছিলেন দুই মহাসমুদ্রের মিলনের সঙ্গে। কিন্তু এই মহা-মিলনের ফলশ্রুতি কি ? চরম ব্যর্থতা। এই মিলন ও সংঘাতের ফলে জয়নাল আবেদীন ও আকবরের মতো দুই-একজন আদর্শ রাজা এবং কবীর নানক দাদু প্রভৃতির মতো কয়েকটি সাধুপুরুষের আবির্ভাব ভিন্ন আর কোনো মহৎ পরিণতি ঘটে নি ভারতবর্ষের ইতিহাসে। পাঠ করি মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস। দেখি,—দুইটি মহাসংস্কৃতি পরস্পরের অতি কাছাকাছি এসেছিল বটে, কিন্তু একত্র মিলতে পারে নি। দুই দিকে দুই মহাসিন্ধু তরঙ্গিত-কল্লোলিত হয়েছে, কিন্তু মাঝখানে কোন্ এক অজ্ঞাত পানামা বা সুয়েজ যোজক তাদের মধ্যে এক সংকীর্ণ অথচ এক অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান রচনা করে রেখেছিল। খাল কেটে পানামা বা সুয়েজের ব্যবধানকে অস্বীকার করবার শক্তি তখনো দেখা দেয় নি। তারই ফলে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি ছিল, কিন্তু মিলতে পারেনি।

কিন্তু পলাশির ক্ষেত্রে যে শক্তি ও সংস্কৃতি এ দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো তার প্রকৃতি অন্য রকম। যে শক্তি উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে, যে শক্তি সুয়েজ বা পানামার ব্যবধানকে বিদীর্ণ করতে পারে, সেই শক্তিই দেখা দিলো পলাশির রণভূমিতে। সে শক্তির কাছে আমরা পরাভূত হয়েছি সত্য, কিন্তু সেই শক্তিই আমাদের মুমূর্ষু স্নায়ুতে সঞ্চার করেছে নবজীবনের প্রেরণা। উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রমণের ইতিহাস

বস্তুতঃ ইতিহাসের সমস্ত অন্তরায় অতিক্রমণেরই ইতিহাস। সে ইতিহাস শুধু ভাস্‌কো-ডা-গামা বা পোর্তুগালের পক্ষেই উত্তম আশার বার্তা বহন করে নি, সমস্ত পৃথিবীর পক্ষেই সেদিন উত্তম আশার প্রথম আলোকপাত ঘটেছিল।

বাংলার ইতিহাসের রুদ্ধদ্বারও সে আশার করাঘাত থেকে বঞ্চিত হয়নি।

সুয়েজ-পানামার কঠিন ব্যবধান অতিক্রম করবার জন্যে যে প্রণালী খনন করা হয়েছে তাতে প্রশান্ত, অতলান্তিক ও ভারত মহাসমুদ্রের মধ্যবর্তী সমস্ত অন্তরায়ই অন্তর্হিত হয়েছে। তিন মহাসমুদ্রের মধ্যেই ঘটেছে মহামিলন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে এ দেশের মাটিতেই। এই সাংস্কৃতিক মহা-মিলনের ফলেই ভারতের পুণ্যতীর্থে নবজাগরণের সূচনা। সে তীর্থের সোপানাবলী রচিত হয়েছে বাংলা দেশের মাটিতে, সে জাগরণের অগ্রদূত-স্বরূপ প্রথম অরুণোদয়ও ঘটেছে বাংলার আকাশেই। এই-ই বাংলার গৌরব। বাংলার ইতিহাসের এই পর্ব তার পূর্ববর্তী সব পর্বকেই দিয়েছে ম্লান করে। এই বিশ্বমিলন এবং তার ফলে এই যে নবসংস্কৃতির অভ্যুদয়, বাংলার ইতিহাসে তা আকস্মিক ঘটনা নয়। এর জন্যে বাঙালির কৃতিত্বকে স্বীকার করতেই হয়। দুই সংস্কৃতির সমবায়ে কোনো নূতন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটতেই পারে না, যদি দুই পক্ষেই নবসৃষ্টির শক্তি, প্রেরণা ও সক্রিয় সহযোগ না থাকে। কই, মধ্যযুগের বাংলায় দুই সংস্কৃতির দীর্ঘকালের সমাবেশ সত্ত্বেও তো নবসংস্কৃতির উজ্জীবন ঘটে নি? সেই নিস্ফলতার ইতিহাস উপলব্ধি করতে পারলেই, বাংলার নবজাগরণের স্বরূপ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে।

ইংরেজ এ দেশে এলো এক হাতে শক্তির তরবারি, আর এক হাতে ব্যবহারিক জ্ঞানের মশাল নিয়ে। আমরা ইংরেজের অধীন হলাম বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যযুগীয় বিভীষিকা-রজনীর অন্ধকারও কেটে গেল, নবযুগের অরুণাভাযে দিক্‌প্রান্ত হয়ে উঠলো উজ্জ্বল। ইংরেজ শুধুই দোর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ে আসে নি; তার হাতে ছিল বন্ধনের রজ্জু আর কণ্ঠে ছিল মুক্তির মন্ত্র। সকলের অলক্ষ্যে ইতিহাসের অমোঘ গতি তার কাজ করে চললো।। আমাদের দেহ ইংরেজের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হলো, কিন্তু তখনই

আমাদের মন নূতন মুক্তির আনন্দে হয়ে উঠলো চঞ্চল। এই আনন্দেরই প্রকাশ আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য। পলাশির পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল বাংলাদেশ নব দাসত্বের পীড়নে ও বেদনায় আড়ষ্ট। কিন্তু তারপরেই উনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই বাংলা সাহিত্য মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে নূতন জীবনের পথে যাত্রা শুরু করলো। সেই যাত্রার গতিবেগস্পন্দিত ইতিহাসই বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস।

মাইকেলের জীবনের দৃশ্যপটে আছে সেই অদৃশ্য ইতিহাস।

॥ দুই ॥

ইংরেজ বণিকেরা কোম্পানীর নামে ভারতবর্ষের দক্ষিণসমুদ্রের উপকূলে কয়েকটি স্থানে প্রথম কুঠি ও বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে। বাংলায় তারা আসে অনেক পরে। কিন্তু এই সমতল গাঙ্গেয় ভূমিতেই ইংরেজরা কোম্পানীর অধীনে প্রথম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, আর এখান থেকেই তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ভারতে। তাই উনিশ শতকের ভারতবর্ষের ইতিহাসে নবজাগরণ মানেই বাংলার নবজাগরণ। প্রাণের প্রবাহ এখান থেকেই পরিব্যাপ্ত হয়েছিল সেদিন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে—সেই সব অঞ্চলে বাঙালিই গিয়েছিল এই জাগরণের মশাল হাতে নিয়ে। উনবিংশ শতকের ভারতবর্ষ মানেই বাংলা। অন্ততঃ এর প্রথমার্ধ তো বটেই।

সেদিন পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হবার প্রথম সুযোগ বাঙালিই পেয়েছিল। বাঙালিই প্রথম পরিচিত হয়েছিল য়ুরোপের উন্নতিশীল বিপ্লবাত্মক আন্দোলনগুলির সঙ্গে। এর ফলে বাঙালির চিত্তে যে মানবিকতার জাগরণ হলো, কখনো তার শেষ হয় নি। কালক্রমে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই মানবিকতা বোধ ছড়িয়ে পড়ে—ছড়িয়ে পড়ে এই মানবিকতার অনুভূতি সমগ্র ভারতে। নবজাগরণ বা নবজাগৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ *Renaissance*, রেনেসাঁ। এর মূল অর্থ 'নবজন্ম'। সুতরাং কথাটির একটি ইতিহাস ভিত্তিক ব্যাখ্যা আছে। নবজাগৃতির সূচনা খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে ইতালিতে। এখান থেকে পশ্চিম য়ুরোপে এর বিস্তৃতি। এর ফলে অসার পাণ্ডিত্য, সামন্ততন্ত্র ও পাদ্রীতন্ত্রের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় এবং ঐগুলির স্থান অধিকার করে 'ন্যাসনালিজম্' বা জাতীয়তা। পেত্রার্ক ও বোক্কাচিও গ্রীক সাহিত্য ও রোমান সাহিত্য পুনরুদ্ধার করলেন। অভ্যুদয় হলো নব বিদ্যার—তাতে স্বীকৃত হলো মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য, দরদ ও দায়িত্ব। শুধু স্বীকৃত হওয়া নয়, বাস্তব জীবনেও তা প্রদর্শিত হলো। এই নবজাগরণের ফল হলো সুদূরপ্রসারী। মানুষের আচার-আচরণ, দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞান, ধর্ম, রাজনীতি এবং শিল্পকলা—সবই এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করল।

চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কনস্টান্টিনোপলের পতন হলো।

য়ুরোপীয় রেনেসাঁর ইতিহাসে এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মুসলমান ধর্মাবলম্বী তুর্কীর সুলতান গ্রীসের স্বাধীনতা হরণ করলেন। গ্রীক সাহিত্য ও বিবিধ বিদ্যায় সুপণ্ডিত লোকেরা য়ুরোপে নির্বাসিত হতে লাগলেন। তাঁরা ছড়িয়ে পড়লেন সারা য়ুরোপে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল গ্রীক সাহিত্যের মানবিকতামূলক ভাবধারা। ঠিক সেই সময়ে আবিষ্কৃত হলো দিক-নির্ণয় যন্ত্র, উত্তমাশা অন্তরীপের পথ, আমেরিকা মহাদেশ, মুদ্রাযন্ত্র আর লিখবার কাগজ। এর সঙ্গে এসে মিলিত হলো আরো দুটো জিনিস—খ্রীষ্টীয় ধর্মসংস্কার আন্দোলন আর পুরাতন শিল্পরীতির অনুশীলন। এই এতগুলি ধারা একত্র মিলে সার্থক করে তুললো নবজাগরণকে।

য়ুরোপীয় নবজাগণের এই সর্বব্যাপী পরিপূর্ণ রূপের নিরিখে উনিশ শতকে বাংলা দেশে যে নবজাগরণ এলো, এইবার তার কথা। কিন্তু তার আগের ইতিহাস আমাদের একটু জানা দরকার। ইংরেজ আমল তো দু'শো বছরের; বাঙালি কি মাত্র দু'শো বছরের বিপ্লবী? ইতিহাস তো সে সাক্ষ্য দেয় না। স্মরণ করি আর্য-বিজয়ের যুগ। বাঙালিরা প্রভুত্ব মানতে চায় নি—যুদ্ধেও তারা পরাজিত হয় নি। তখন বড়ো বড়ো আর্য রাজারা বাধ্য হয়ে বাংলার রাজন্যসমাজের সঙ্গে বৈবাহিক-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের সঙ্গে স্থাপন করলেন বন্ধুত্ব। 'শতপথ ব্রাহ্মণ'-এর যুগে মিথিলায় যখন আর্যদের উপনিবেশ, মগধ-বাংলা তখনো স্বাধীন। পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন: "যখন আর্যগণ মধ্য এশিয়া হইতে পাঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন তখন বাংলা সভ্য ছিল।··· বাংলার সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহারা বাঙালিকে ধর্মজ্ঞানশূন্য এবং ভাষাশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।" বাঙালির সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক যুদ্ধে পরাভূত গর্বিত আর্যদের এ স্পর্ধাবাক্য মাত্র। এ যেন একালে বাংলা তথা ভারতের বিরুদ্ধে ইংরেজদের অপপ্রচার।

উত্তরভারতের পশ্চিমাংশ বিজয়ী আর্যদের কাছে পরাজিত হলেও তারপর বহুদিন পর্যন্ত বাংলা ছিল স্বাধীন। বাঙালিরা কখনো আর্যপ্রভুত্ব স্বীকার করে নি। তটভূমি যেমন সাগর-তরঙ্গকে রোধ করে, সেকালের বাঙালিরা তেমনি করেই আর্যবিজয়-তরঙ্গকে রোধ করেছিল। ক্রমে তারা আর্যসংস্কৃতির

কিছুটা আত্মসাৎ করেছিল বটে—কিন্তু নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারায় নি। তাম্র-লিপ্তের ইতিহাস পাঠ করি। রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ধরেছিলেন তাম্রলিপ্তপতি ময়ূরধ্বজের পুত্র তাম্রধ্বজ। 'জৈমিনি ভারতে' বর্ণিত আছে যে, সে ভীষণ যুদ্ধে কৃষ্ণার্জুনের মত বীরকে মূর্চ্ছিত হতে হয়। সেকালে যে ভূখণ্ডের নাম ছিল তাম্রলিপ্ত একালে তাই ছিল বাংলারই একটা অংশ। কানিংহাম নির্দেশ করেছেন যে, উত্তরে বর্ধমান ও কালনা এবং দক্ষিণে কাঁসাই নদীর তীর পর্যন্ত ভাগীরথীর পশ্চিম তটস্থ ভূভাগ তাম্রলিপ্তের অন্তর্গত ছিল। মহাভারতকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে গণ্য করলে এ কথা নিঃসন্দিগ্ধভাবেই প্রমাণিত হয় যে, সে সময়েও বাংলা ছিল বিপ্লবী, বাঙালি ছিল বিপ্লবতন্ত্রে দীক্ষিত। সেই বাংলার বীর বাঙালিরা রাজা যুধিষ্ঠিরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে চান নি বলেই অশ্বমেধের অশ্বটি ধরেছিলেন। মধ্যম পাণ্ডবের দিগ্বিজয়ে বাধা দিয়েছিলেন বঙ্গরাজ পৌণ্ড্রাধিপতি, তাম্রলিপ্তপতি প্রভৃতি রাজন্যবর্গ। দিগ্বিজয়ীর অপরিম্লান ললাট-তিলক নিয়ে তাঁরা বাংলা দেশ থেকে ভীমকে যেতে দেন নি। আবার দেখি সব্যসাচী ফাল্গুনী যজ্ঞাশ্ব নিয়ে জয়গৌরবে সমুদ্র-তীর পর্যন্ত এলে পর সমুদ্রতীরস্থ 'বঙ্গান' এবং 'পুণ্ড্রান'দের সঙ্গে তাঁর ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। বিপ্লবী বাঙালি অর্জুনকে বিনা বাধায় দিগ্বিজয়ী হতে দেয় নি।

তাম্রলিপ্তের বিহারীদত্তের বাণিজ্যতরী দূর সিংহল, দূরতর যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপে ঘুরে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মানুষের সঙ্গে সংযোগস্পর্শ নিয়ে দেশে ফিরত। সমুদ্রযাত্রায় বাঙালির বিপুল অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের কথা উড়িয়ে দেবার নয়। এ হাজার বছর আগের কথা।

ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ সকল পুরাণ, সংহিতা ও তন্ত্রে বাংলা একটি অতি প্রাচীন আর্যাবর্তসংলগ্ন সুসভ্য দেশরূপে উল্লিখিত হয়েছে। সকল প্রাচীন গ্রন্থেই বাংলার সমৃদ্ধি ও বাঙালির শৌর্যবীর্যের কথা বলা হয়েছে। বৌদ্ধযুগেও বাঙালি তার মনীষার পরিচয় দিয়েছে। নালন্দা, তক্ষশীলা, পাটলীপুত্র, রাজ-মহেন্দ্রপীঠ প্রভৃতি বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠে বাঙালি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের স্থান গ্রহণ

করেছিলেন ; বাঙালি সেদিনও তিব্বত, জাপান ও চীন প্রভৃতি দেশে বুদ্ধের বাণী প্রচার করে এসেছিল। বাঙালির এই দিগ্বিজয়ী প্রতিভার কথা উল্লেখ করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন ঃ

> "আমাদিগকেই এখন ঘোষণা করিতে হইবে যে, বাঙালি একদিন দিগ্বিজয়ী ছিল—বারাণসী প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে লক্ষ্মণ সেনের জয়স্তম্ভ এবং বঙ্গের দেবপাল সমগ্র ভারতের সম্রাট বলিয়া পরিকীর্তিত। আমাদিগকে এখন বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, পাঠান শাসনেও বাঙালির প্রকৃত পরাভব ঘটে নাই, ঘটিলে তাহাদের মানসিক দীপ্তি নিভিয়া যাইত। অপূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্য, নূতন স্মৃতি ও নব্য ন্যায়ের সৃষ্টি কখনই সম্ভবপর হইত না। এই সমস্ত সত্যের প্রতিষ্ঠার ভার আমাদের উপর। একদিন গঙ্গারাঢ়ী বাঙ্গালিদিগের প্রতাপ শুনিয়া সর্বজয়ী আলেকজেন্দর গঙ্গাতীর হইতেই প্রত্যাবর্তন করা শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিলেন। সাক্ষী তাঁহারই স্বজাতীয় মেগাস্থিনিস। এই বঙ্গের গঙ্গাবংশ একদিন উড়িষ্যায় রাজ্যস্থাপন পূর্বক একদিকে যেমন পুরীর মন্দির ও কোণার্কের আশ্চয প্রাসাদাবলী নির্মাণ করিয়াছিলেন, অপরদিকে সেইরূপ তিন শত বৎসর ধরিয়া বিজিগীষু পাঠানদিগকে পদে পদে পরাভূত ও লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন, এমন কি চিতোর ভিন্ন আর কোন হিন্দু রাজবংশই মুসলমানকে এমন শিক্ষা দিতে পারে নাই। আত্মবিস্মৃত বাঙালি! এ সমস্ত কথা কি তোমায় অপরে স্মরণ করাইয়া দিতে আসিবে?"

মুঘল যুগেও বাঙালি তার বৈপ্লবিক মনীষার পরিচয় দিয়েছে। আকবরের স্বর্ণমণ্ডিত লৌহশৃঙ্খল গ্রহণ করে বাংলার হিন্দু ভৌমিকেরা এ-দেশের সংহতি ও সেই সঙ্গে হিন্দু ধর্মকে আনত করতে অস্বীকার করেছিলেন। বাঙালি মুসলমান আক্রমণ তিনশো বছর পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছিল—সমস্ত গৌড়বঙ্গকে প্লাবিত হতে দেয় নি। ভারতের ইতিহাসে এমন আর একটা উদাহরণ দুর্লভ। ইংরেজ বা ইংরেজের সভ্যতা আসবার বহু পূর্বে চিত্রশিল্পে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে

বাংলা ছিল একদিন শ্রেষ্ঠ। শিল্পের সঙ্গে সাহিত্যরীতি। এক সময়ে বাংলা দেশে সাহিত্য রচনার যে নূতন রীতি উদ্ভূত হয়েছিল তার নাম ছিল গৌড়ীয় রীতি। সমস্ত ভারতবর্ষ তখন সেই রীতিকে মান্য করেছিল। হ্যাভেল প্রমুখ বৈদেশিক পণ্ডিতেরা প্রমাণ সহকারে স্বীকার করেছেন যে, বাঙালি নানা স্থানে উপনিবেশ ও রাজ্য গঠন করেছে আর সেই সঙ্গে দূরদেশেও প্রতিষ্ঠিত করেছে তার শিল্পরীতি ও সংস্কৃতিকে। সাড়ে চারশো বছর আগে শ্রীচৈতন্যের সমাজ-বিপ্লব বাঙালির মনীষার আর একটি বড়ো দৃষ্টান্ত। বিপ্লব বাঙালির অস্থিতে, মজ্জায় ও শোণিতে। বাল্মীকি ও ব্যাসের কাব্যসৃষ্টিকে পরিপাক করে বাঙালির প্রতিভা ভাষায় নূতন কাব্য রচনা করেছে। সুতরাং উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ আকস্মিক নয়, ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের পথেই এর অভ্যুদয়। বাংলার পলিমাটিতেই ছিল এর বীজ। বাঙালির প্রাণশক্তির রস আর য়ুরোপীয় সভ্যতার বারিসিঞ্চনে হলো তা অঙ্কুরিত। ফসল যা ফললো তা একান্তভাবেই বাংলার মানসলোকের সম্পদ। সেই সম্পদের পুঁজি নিয়েই শুরু হলো ভারতের নবজন্ম। এই নবজাগরণ, এই বিপুল প্রাণবন্যা সেদিন বাংলার উর্বরভূমি ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোথাও সম্ভবপর হতো না।

বাংলার নবজাগরণ আর য়ুরোপের রেনেসাঁ এক জিনিস নয়। স্থানকাল-পাত্রভেদে উভয়ের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো-কথা এই যে, য়ুরোপে, বিশেষ করে পশ্চিম য়ুরোপে, রেনেসাঁ কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হতে লেগেছিল তিনশো বছর। বাংলাদেশ পশ্চিমের সংস্পর্শে এসে গত শতাব্দীর প্রথম পাদেই রেনেসাঁর পরিণত কল্যাণময় রূপটি আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ করে তুলতে পেরেছিল। নিঃসন্দেহে এ দেশের মাটির গুণ, এর অন্তর্নিহিত বৈপ্লবিক মনীষার গুণ। ফরাসী বিপ্লব তথা সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শ সমস্ত য়ুরোপে মানবিকতার বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়ে দিলো। তিনশো বছরের রেনেসাঁ এর মধ্যে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করলো। আমরা এই নতুন ভাবাদর্শের সঙ্গেও পরিচিত হবার সুযোগ পেলাম।

বাংলার নবজাগরণের সূচনা অষ্টাদশ শতকের চতুর্থ পাদে।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এই সময়ে একটি আইন পাশ করলেন—রেগুলেটিং এ্যাক্ট। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে কোম্পানীর যথেচ্ছ শাসন নিয়মিত করা। আবার এই সময়েই নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম। বাংলাদেশে রামমোহনের অভ্যুদয় সেই মাৎস্যন্যায়ের যুগে এক বিস্ময়কর ঘটনা। য়ুরোপীয় নূতন ভাবধারাকে ভগীরথের মতো তিনিই ভারতবর্ষে নিয়ে এসেছিলেন। এই সময়েই বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা এবং তখন থেকে ভারতবর্ষে প্রাচ্য সাহিত্য দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান ও শিল্পচর্চার সূত্রপাত। শাসনে সংযম, নূতন ভাবাদর্শ গ্রহণে শক্তি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনার তৎপরতা বাংলায় নবজাগরণের ভিত্তি রচনায় বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল।

ভারতে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রতি কুড়ি বছর অন্তর কোম্পানীকে পার্লামেণ্টের কাছ থেকে সনন্দ নিতে হতো। ভারতে কোম্পানীর যথেচ্ছ শাসন ও অনাচার, অত্যাচার ও উপদ্রবের কাহিনী তখন ইংলণ্ডে গিয়ে পৌঁছেছে এবং পার্লামেণ্টের সদস্যরা এর তীব্র নিন্দা ও কঠোর সমালোচনা করতেন। এর ফলে পার্লামেণ্ট সনন্দ আইন বিধিবদ্ধ করলেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান মিশনারিদের অবাধ প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হলো। কিন্তু এ-দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনে তখনো পর্যন্ত কোম্পানী বা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কোনো উৎসাহ বা চেষ্টা দেখা যায় নি ; বরং এই নূতন সনন্দে শিক্ষাখাতে যে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল তার সবটাই প্রাচ্যবিদ্যা চর্চায় ব্যয় করা সাব্যস্ত হলো। বিশ বছর বাদে আবার যে নূতন সনন্দ কোম্পানীকে দেওয়া হয় তার একটি ধারা লক্ষ্য করবার বিষয়। বেসরকারী যেসব ইংরেজ সেই সময় ভারতে আসতেন কোম্পানীর কাছ থেকে তাঁদের অনুমতি পত্র নিতে হতো এবং এঁদের মধ্যে কাউকে যদি কোম্পানী অবাঞ্ছনীয় মনে করতেন, তা'হলে তাঁকে ইংলণ্ডে ফেরৎ পাঠাবার নিয়ম ছিল। এর ফলে ভারতে সরকারী ও বেসরকারী য়ুরোপীয়দের মধ্যে প্রায়ই অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হতো। ইংরেজ সংবাদ-পত্রসেবীরা কোম্পানীর শাসনের ভুলত্রুটি অনবরত প্রকাশ করতেন। রামমোহনের বন্ধু, ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক জেমস্ সিল্ক বাকিংহামকে এই জন্যেই সেদিন ভারতবর্ষ থেকে নির্বাসিত হতে হয়েছিল। ১৮৩৩-এর

সনন্দে এই বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হলো। কিন্তু যতদিন এই বিধিনিষেধ বলবৎ ছিল ততদিন বেসরকারী য়ুরোপীয়েরা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের বিরোধী দলের মতো ভারতবর্ষে কার্য করতেন এবং তাঁদের এই ধরণের কার্যকলাপ ভারতবাসীর পক্ষে হিতকর হয়েছিল। তারপর ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দলাভের সময়ে কোম্পানীকে পার্লামেণ্টের সম্মুখে ভীষণভাবে জবাবদিহি করতে হয়। কিন্তু সে অন্য কাহিনী। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অন্ততঃ তিনটি শাসনতান্ত্রিক নীতির দরুণ বাঙালির সমাজজীবন অত্যন্ত আলোড়িত হয়—এর একটি হলো কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, দ্বিতীয়—নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত-করণ এবং তৃতীয় বেণ্টিঙ্ক কর্তৃক সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরেজি ভাষার নির্ধারণ। শেষেরটি সম্ভব হয়েছিল রামমোহনের আন্দোলনের ফলে।

॥ তিন ॥

বাংলার নবজাগরণের প্রকৃত উদ্বোধক রাজা রামমোহন রায়। নূতন উষার স্বর্ণদ্বারে তিনিই প্রথম পথিক। ভারতে ইংরেজশাসনের গুরুত্ব ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র রামমোহন ছাড়া আর কেহই গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেন নি। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতে ইংরেজ-শাসনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। কলকাতায় স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করার বহুপূর্ব থেকেই তিনি ইংরেজ সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তখনই তিনি বুঝেছিলেন যে ইংরেজ বুদ্ধিতে অপরাজেয়, আদর্শে অভিনব। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোবৃত্তি আর চারদিকে নিজেদের পঙ্কিল সমাজজীবন, প্রচলিত হিন্দু সামাজিক আচার-আচরণের উপর তিনি তখন থেকেই বিরূপ হয়ে ওঠেন। মন ও মানসজীবনের দিক-থেকে রামমোহন তখন থেকেই প্রবেশ করেছিলেন নূতন এক পৃথিবীতে, সেখানে তাঁর পিতৃপুরুষের ভাবরাশির স্থান ছিল না। তারপর যখন জন ডিগবির সহায়তায় তিনি ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির সুগভীরে প্রবেশ করলেন, তখন ইংরেজের সাহিত্য, সামাজিক ন্যায়-বিচার, যুক্তিধর্মী মন ও মনন, বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা, শিক্ষা ও আইনের সার্বভৌম আদর্শ তাঁকে অজানা পৃথিবীর সন্ধান দিলো। যা কিছু জানা সম্ভব তিনি জানলেন, যা কিছু অধ্যয়ন সম্ভব তিনি অধ্যয়ন করলেন, এবং এই অধ্যয়ন-উপার্জিত সম্পদ তিনি ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনে প্রয়োগ করতে শিখলেন। রামমোহনের জীবনেতিহাস পাঠকদের নিকট এ-কথা অবিদিত নয় যে, তাঁর মানসজীবনের বিবর্তনের ইতিহাসে অনেক কিছুর প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষণীয় এবং ইহাই নিয়ম। ইতিহাস, ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্র, পরিবেশের প্রবাহিত জীবনধারা ও ঘটনাপুঞ্জ মনের উপকরণ যোগায়, এবং অধ্যয়ন-মনন-অনুশীলনের সাহায্যে মন তা অবলম্বন করে জীবনাদর্শ রচনা করে। এই জীবনাদর্শ বাইরের জীবনধারার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্পৃক্ত, বহু ক্ষেত্রেই তা এক। তাই দেখা যায়, যাঁরা ইতিহাস-স্রষ্টা, যুগধর্ম-নিয়ামক তাঁদের অন্তর-প্রেরণার সঙ্গে কালের অন্তর-প্রেরণার কোনো বিরোধ নেই, বরং

সর্বত্র ঐক্যবন্ধনে বাঁধা। রামমোহনের মধ্যে যুগের অন্তর-প্রেরণা তাঁর বহু কর্মপ্রয়াসের ভেতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। ইংরেজ-শাসন অজ্ঞাতসারে ভারতে সমাজবিপ্লব সংসাধিত করে চলছিল। সেই বিপ্লব ছিল নূতন বিকাশধারার সম্ভাবনায় ও প্রতিশ্রুতিতে পরিপূর্ণ। রামমোহন তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভাদ্বারা এই সম্ভাবনার তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহনের আবির্ভাবকাল থেকে কলকাতায় বসবাসস্থাপন পর্যন্ত (১৭৭২—১৮১৬)—এই বিয়াল্লিশ বছরে বাঙালি-সমাজ বহু পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে চলে একটি নূতন যুগের আস্বাদ পেয়েছে। কলকাতায় যখন তিনি অধিষ্ঠিত তখন রামমোহন একজন পরিপূর্ণ মানুষ। আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, ইংরেজি—এই চারটি ভাষা তাঁর আয়ত্তে। এই সমুদয় ভাষা-সাহিত্য থেকে তিনি মানবধর্মের মূল কথা অবগত হয়েছেন। ইংরেজের সংস্পর্শে এসে তিনি য়ুরোপীয় সমাজের উন্নতির মূল কারণ সমূহও প্রত্যক্ষভাবে জানবার অবকাশ পান। এর সঙ্গে তুলনা করে নিজের জাতি ও সমাজের অধঃপতনের কারণগুলোও তাঁর সম্পূর্ণ উপলব্ধি হতে থাকে। কলকাতায় বসবাস শুরু করেই রামমোহন আত্মীয়সভা স্থাপন করলেন। এই সভার মঞ্চ থেকেই তিনি নবজাগরণের শঙ্খধ্বনি করে ঘুমন্ত জাতিকে ডাক দিয়েছিলেন। আত্মীয়সভার আলোচনা থেকেই হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য এগিয়ে এলেন মহামতি ডেভিড হেয়ার। সমাজ-সংস্কার বিষয়েও এখানে আলোচনা হতো আর সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে রামমোহনের অভিযানের সূত্রপাত হয় এখান থেকেই। মূলতঃ একটি ধর্মীয় সভা হলেও, বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে রামমোহনের এই আত্মীয়সভার গুরুত্ব ও কৃতিত্ব অপরিসীম।

মানবধর্মের ভিত্তির উপরই রামমোহন রেনেসাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই মানবধর্ম প্রধানতঃ বেদান্ত, তারপর মূল বাইবেল ও কোরান থেকে আহৃত জ্ঞানের উপরই স্থাপিত এবং তিনি মনে প্রাণে এই ধর্মেই ছিলেন বিশ্বাসী আর শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় তিনি ছিলেন আচার্য শঙ্করের অনুবর্তী। রামমোহন-প্রচারিত মানবধর্মের সম্মুখে পুরোহিততন্ত্র-শাসিত উপধর্ম, গোঁড়া পাদ্রীদের প্রচারিত তথাকথিত খ্রীষ্টান ধর্ম, নারীজাতির প্রতি অবিচার এবং

পরাধীন দেশের উপর বিদেশী শাসকের অত্যাচার সমানভাবেই তিরস্কৃত হতো। কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে নরনারী নির্বিশেষে সমান অধিকার ঘোষণা, এ যুগে সর্বপ্রথম করলেন রাজা রামমোহন রায়। সেদিন নবজাগরণের অনুকূল সকল আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন তিনিই। আবার ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য তিনিই লেখনী ধারণা করেন। দেশের আর্থিক উন্নতির দিকেও ছিল রামমোহনের সমান দৃষ্টি। তিনি ভারতবর্ষে বীমা প্রথার প্রবর্তনের বিষয় তাঁর নিজস্ব সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রথম আলোচনা করেছিলেন। য়ুরোপীয় অর্থ, বুদ্ধি ও কর্মকুশলতাকে স্বদেশবাসীর কল্যাণার্থে নিয়োজিত করতেও তাঁর ব্যগ্রতার সীমা ছিল না। কিন্তু এর চেয়েও বড়ো জিনিস তাঁর চিন্তায় ধরা পড়েছিল। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করলেন যে ভারতবাসীদের অবনতির কারণ অনৈক্য আর এর মূলে আছে শ্রেণী ও সম্প্রদায়গত ভেদ-বৈষম্য। রামমোহন নানাভাবে এসব দূর করতে প্রয়াসী হন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালেও তিনি স্বদেশবাসীর হিতচিন্তায় রত ছিলেন। কোম্পানীর শাসন-পদ্ধতিতে যে সাধারণ বাঙালি-সমাজ উপকৃত হয় নি, এ কথা তিনি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দেবার সময়ে। মোট কথা, বাংলাদেশে নব-জাগরণের সূচনায় রামমোহনের বহুমুখী প্রয়াস যে কত কার্যকরী এবং কিরূপ সুদূরপ্রসারী হয়েছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার অম্লান স্বাক্ষর আছে।

বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস আলোচনায় এশিয়াটিক সোসাইটির উল্লেখ অপরিহার্য। রেনেসাঁর একটি প্রধান লক্ষ্য ও কাজ—বিদ্যার পুনরুজ্জীবন। রামমোহনের জন্মের বার বছর পরে এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অন্যতম উদ্যোক্তা স্যর উইলিয়ম জোনস্ এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকালে এর মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন: "এশিয়ার মানুষ ও প্রকৃতি বিষয়ে এইখানে আলোচনা চলিবে। প্রাচ্যের বিবিধ বিদ্যা যাহা সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভাষায় লিখিত আছে—জ্ঞান এবং বিজ্ঞান দুই-ই ইহার অন্তর্ভুক্ত—তাহার আলোচনা-গবেষণা ক্ষেত্র হইবে এই সোসাইটি।" স্যর উইলিয়ম জোনস্-এর কিছু পূর্বে প্রাচ্য-বিদ্যার গবেষণায় যে দু'জন ইংরেজ মনীষী আত্মনিয়োগ

করেছিলেন, তাঁরা হলেন হ্যালহেড ও চার্লস উইলকিন্স্। হ্যালহেড ইংরেজির মাধ্যমে বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন। উইলকিন্স্ গীতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে সমগ্র জগতের বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যালোচনা এশিয়াটিক সোসাইটির একটা প্রধান কাজ ছিল। এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির আদর্শে ব্রিটেনে ও ফ্রান্সে, এবং পশ্চিম ভারতে বোম্বাইতে একই উদ্দেশ্যে সোসাইটি স্থাপিত হয়। স্যর জন কোলব্রুক ও ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসন সোসাইটির প্রধান স্তম্ভ ছিলেন। কিন্তু বাংলার নবজাগরণে সোসাইটির প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভূত হয় উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষে। এই সময়ে রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি কয়েকজন খ্যাতনামা বাঙালি সোসাইটির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন।

কোম্পানীর শাসনের ক্রমিক রূপ-পরিবর্তন, রাজা রামমোহন রায়ের যুগান্তকারী ভাবাদর্শ এবং বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্য-বিদ্যার পুনরুজ্জীবন সম্পর্কিত কার্যকলাপ—এই তিনটি জিনিস বাংলার সমাজজীবনে বিস্তৃতি ও স্থিতিলাভ করে এর নবজাগরণকে ত্বরান্বিত করে দিয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উল্লেখ করতে হয়। নবজাগরণের উষাকালে উনবিংশ শতকের প্রথম বছরেই এর জন্ম। এখানে সংস্কৃত, আরবী ও ফারসীর বিভিন্ন অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। এক-একজন অধ্যাপকের অধীনে প্রাদেশিক ভাষাসমূহের শিক্ষাদানে ব্যবস্থা হয়। ছাত্র বিলাত থেকে আগত যুবক সিবিলিয়ান কর্মচারী। উইলিয়ম কেরী ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত। সেদিন কলকাতার এই প্রতিষ্ঠানটি প্রাচ্য-বিদ্যাচর্চ্চার একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থা মুখ্যতঃ য়ুরোপীয় সিবিলিয়ানদের জন্য নির্দিষ্ট হলেও এর দ্বারা ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী বিশেষ উপকৃত হয়। কারণ প্রাচীন ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক আঞ্চলিক ভাষা—হিন্দুস্থানী, মারাঠী, তেলেগু, বাংলা প্রভৃতিতে বইও রচিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে। এর ফলে একদিকে ভাষাগুলি যেমন একটি স্পষ্ট রূপ লাভ করবার অবকাশ পায়, অন্যদিকে তেমনি তরুণ সিবিলিয়ানরা দেশবাসীর সঙ্গে মিলবার সুযোগ পায় এবং দেশ-শাসনে

জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে তৎপর হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সব চেয়ে বড়ো দান—বাংলা ভাষা। এখান থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে প্রেরণা লাভ করে তাই একে অল্পকালের মধ্যেই পরিণতির পথে নিয়ে যেতে সহায়তা করে।

শিক্ষার দিক দিয়ে অবশ্য বাঙালি সমাজের পক্ষে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দান অকিঞ্চিৎকর। সমাজে নূতন যুগোপযোগী শিক্ষাদানে উদ্যোগী হলেন কা'রা? লোকশিক্ষার প্রচুর আয়োজন ছিল, অক্ষর-জ্ঞান লাভের ব্যবস্থাও কিছু কিছু ছিল। কিন্তু নূতন যুগের পক্ষে এসব তো যথেষ্ট নয়। দু'চারজন বাঙালি যাঁরা ইংরেজি শিখতেন তা নিতান্ত ব্যবসায়িক প্রয়োজনে। ঠিক ইংরেজি শেখা নয়, কয়েকটি ইংরেজি শব্দ মাত্র তাঁরা শিখেছিলেন যাঁদের য়ুরোপীয়দের সঙ্গে ছিল কিছু বাণিজ্যিক সংস্রব। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য দুই-একজন ইংরেজ শহরের এখানে-ওখানে দুই-একটি পাঠশালা খুলেছিলেন। পরবর্তী কালের রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন, রসময় দত্ত প্রমুখ খ্যাতনামা বাঙালি প্রধানেরা এই ধরণের পাঠশালাতেই ইংরেজির প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন। ক্রমে পাঠশালা থেকে একটু উন্নত ধরণের ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ড্রামণ্ড সাহেবের ধর্মতলা একাডেমি ছিল এই রকম একটা উন্নত ধরণের ইংরেজি স্কুল। ড্রামণ্ড জাতিতে স্কচ্, তখনকার যুক্তিবাদী দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবিত। নব্যবঙ্গের অন্যতম দীক্ষাগুরু ডিরোজিও ছিলেন ড্রামণ্ড সাহেবের ধর্মতলা একাডেমির একজন কৃতী ছাত্র। ফিরিঙ্গি ও বড়লোক বাঙালির ছেলে দুই-ই এখানে পড়তো। ড্রামণ্ডের শিক্ষায় ডিরোজিও ইংরেজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্যদর্শন আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন এবং তাঁরই শিক্ষায় যুক্তিবাদের প্রতিও ডিরোজিওর বিশেষ প্রীতি জন্মে। বাংলার সমাজজীবনে ড্রামণ্ডের স্কুলের প্রভাব পরোক্ষ হলেও স্মরণীয়। কিন্তু সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিত ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা তখনো দূরে অপেক্ষা করছিল।

এগিয়ে এলেন খ্রীষ্টান মিশনারিরা। বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণে এই বহু-নিন্দিত মিশনারিদের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। ইংরেজি শিক্ষাই ছিল

নবজাগরণের মূলে আর এই ইংরেজি শিক্ষাকে সাধারণগ্রাহ্য করে তুলতে সর্বপ্রথম মিশনারিরাই এগিয়ে এসেছিলেন। এ হলো উনবিংশ শতকের প্রথম দশকের অব্যবহিত পরের কথা। কোম্পানীর আইনে তার আগে পর্যন্ত এ দেশে মিশনারিদের গতিবিধি ও কার্যকলাপ অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ছিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দে এই বিধিনিষেধ শিথিল হয়। মিশনারিরা তখন থেকে এ দেশে স্বাধীন-ভাবে বিচরণের সুবিধা পেলেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ অতঃপর নিছক ধর্মপ্রচারে লিপ্ত না থেকে, এই দেশীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে মন দিলেন। পাদ্রি রবার্ট মে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচূড়াকে কেন্দ্র করে বহু প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করেন। রেভারেণ্ড মে লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির প্রচারক ছিলেন। তিনি চুঁচূড়াতেই বাস করতেন। প্রথম দিন মে সাহেবের স্কুলে মাত্র ষোলটি ছাত্র উপস্থিত ছিল। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা যখন বাড়তে থাকে তখন ওলন্দাজদের পরিত্যক্ত পুরাতন কেল্লাতে স্কুলটি উঠে আসে। দুই-এক বছর পরে আরো কয়েকটি শাখা-স্কুল স্থাপিত হয়ে মে সাহেবের স্কুলের ছাত্রসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল হাজারে। এইসব স্কুলে নূতন শিক্ষাদানরীতি প্রবর্তিত হলো। শ্রীরামপুরে ব্যাপ-টিস্ট মিশনারিরা ঐ অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। পাদ্রি মে চুঁচূড়ায় একটা কেন্দ্রীয় ইংরেজি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরামপুরে একটি কলেজ স্থাপিত হলো ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে। পাদ্রিদের সহায়তায় য়ুরোপীয় মহিলারা দেশীয় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্ত্রী-বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রসর হন এই সময় থেকেই। তাঁরা পরপর কয়েকটি সোসাইটি গঠন করে তাদের মাধ্যমে কলকাতায় ও মফঃস্বলে অনেকগুলো বালিকা বিদ্যালয় খুলেছিলেন। স্কুল সোসাইটি গঠিত হলো ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে। উদ্দেশ্য, শহরের পুরাতন বাংলা পাঠশালাগুলির সংস্কার ও পুনর্গঠন। এর আগের বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি; উদ্দেশ্য—উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা করা। এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিদেশী সুপণ্ডিত ও নেতৃস্থানীয় বাঙালিরা। এইভাবে বাংলাশিক্ষার একটা সুন্দর ব্যবস্থা এ দেশে চালু হলো।

কিন্তু উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ ইংরেজি কোথায়?

পাঠশালা আর ধর্মতলা একাডেমি তো যথেষ্টই নয়, কারণ এসব স্থানে সাধারণগ্রাহ্য সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-লাভের সুযোগ বড়ো একটা ছিল না। এই

সুযোগ এলো হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। বাংলার নবজাগরণের সিদ্ধপীঠস্থানই হলো এই হিন্দু কলেজ। আবার এই হিন্দু কলেজই হলো মাইকেলের বিদ্রোহী কবিসত্তার সূতিকাগার। তাই এই শিক্ষায়তনের ইতিহাস একটু বিস্তারিত ভাবেই আমাদের জানা দরকার।

যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখছেন ঃ

> "মধুস্থদন যে সময়ে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিলেন তখন ইহার পূর্ণ যৌবনাবস্থা। ছাত্র এবং শিক্ষকগণের গৌরবে তখন হিন্দু কলেজ বঙ্গদেশের বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। যদিও ডিরোজিও সে সময় কলেজ ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন রিচার্ডসন, গণিত শাস্ত্রবিদ্ রিজ, হালফোর্ড, ক্লিণ্ট প্রভৃতি সে সময়কার প্রসিদ্ধনামা অধ্যাপকগণ ইহাতে অধ্যাপনা করিতেন। সুতরাং মধুস্থদন সে সময় এদেশের পক্ষে যতদূর উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভের অবসর প্রাপ্ত হইলেন।"

এইবার এই হিন্দু কলেজের কথা।

॥ চার ॥

হিন্দু কলেজের ইতিহাসই বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস।

হিন্দু কলেজের কথা বলবার আগে শহর-কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষার প্রাথমিক চেহারাটা কি রকম ছিল সেটা আর একটু দেখা দরকার। কলকাতায় স্থপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হলো রামমোহনের জন্মের এক বৎসর পরে। তখন থেকেই ইংরেজি শিক্ষার প্রচার শুরু। নূতন শাসক, নূতন ভাষা। এই ভাষা শিখতে পারলে স্থবিধা অনেক। প্রথম স্কুল করলেন ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হিউজ সাহেব আর্মানি গির্জার কাছে। পরের বছর গ্রিফিথ সাহেব বৈঠকখানার কাছে তাঁর বাগান বাড়িতে একটা বোর্ডিং স্কুল খুললেন। ঐ সময়ে আর্চার সাহেবও একটি ছেলেদের স্কুল খুলেছিলেন। আন্দিরাম দাস নামে একজন বাঙালি ব্যবসায়ীও তাঁর নিজের বাড়িতে একটা স্কুল খুলেছিলেন। সেখানে শুধু হিন্দু ছেলেরা পড়তো। আর দু'জন অবাঙালির নাম পাওয়া যায় যাঁরা ইংরেজি শিক্ষায় স্থপণ্ডিত বলে সেই সময়ে খ্যাত ছিলেন। এঁদের নাম রামরাম মিশ্র ও তাঁর ছাত্র রামনারায়ণ মিশ্র। রামরাম মিশ্র একটি স্কুল করেছিলেন, সেখানেও হিন্দু ছাত্র পড়তো। মাইনে ছিল মাসিক ৪৲ টাকা থেকে ১৬৲ টাকা। ধর্মতলা একাডেমির কথা আগেই বলা হয়েছে। ড্রামণ্ড সাহেবই প্রথমে তাঁর স্কুলে গ্রামার ও গ্লোবের ব্যবস্থার পত্তন করেন। এ ছাড়া ফ্যারেলস সেমিনারি, ক্যানিঙ সাহেবের স্কুল ও শেরবর্ণ সাহেবের স্কুল ছিল। এ সবই ছিল প্রত্যেকের বাড়িতে। ডিরোজিও পড়েছিলেন ড্রামণ্ডের স্কুলে, রাধাকান্ত দেব ক্যানিঙ সাহেবের স্কুলে আর দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামগোপাল ঘোষ শেরবর্ণ সাহেবের স্কুলে। মোহন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, ভুবন দত্ত, শিবু দত্ত, আরটুন পিক্রস (পিটার্স) প্রভৃতির অধীনেও কয়েকটি স্কুল ছিল।

'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে প্যারীচাঁদ মিত্র (হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন ইনি) এই সময়কার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে এই রকম বর্ণনা দিয়েছেন :

> "প্রথম যখন ইংরাজেরা কলিকাতায় বাণিজ্য করিতে আইসেন, সে সময়ে সেট বসাখ (শেঠ বসাক) বাবুরা সওদাগরি করিতেন। কিন্তু কলিকাতায় একজনও ইংরেজি ভাষা জানিত না। ইংরাজদিগের

সহিত কারবারের কথাবার্তা ইশারা দ্বারাই হইত। মানবস্বভাব এই যে, চাড় পড়িলেই ফিকির বেরোয়, ইশারা দ্বারাই ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু ইংরাজি কথা শিক্ষা হইতে আরম্ভ হইল। পরে সুপরিম কোর্ট স্থাপিত হইলে, আইন-আদালতের ধাক্কায় ইংরাজি চর্চা বাড়িয়া উঠিল। ঐ সময় রামরাম মিশ্রীর শিষ্য রামনারায়ণ মিশ্রী উকিলের কেরানিগিরি করিতেন ও অনেক লোকের দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন। তাঁহার একটি স্কুল ছিল, তথায় ছাত্রদিগকে ১৪।১৬ টাকা করিয়া মাসে দিতে হইত। পরে রামলোচন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু প্রভৃতি অনেকেই স্কুল মাষ্টারগিরি করিয়াছিলেন। ছেলেরা তামস্‌ডিক পড়িত, ও কথার মানে মুখস্থ করিত। বিবাহ অথবা ভোজের সভায়, যে ছেলে আইন ঝাড়িতে পারিত, সকলে তাহাকে চেয়ে দেখিতেন ও সাবাস বাওহা দিতেন। ফ্রেনকো ও আরাতুন পিট্রন প্রভৃতির দেখাদেখি শরবোরণ সাহেব কিছুকাল পরে স্কুল করিয়াছিলেন। ঐ স্কুলে সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলেরা পড়িত।"

এইভাবে ইংরেজি শিক্ষার ধারা চলতে লাগল।

বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার এই প্রাথমিক অবস্থা খুব আশাপ্রদ ছিল না। কোম্পানী নিষ্ক্রিয়, শহরের সম্ভ্রান্ত ধনীরা উদ্যমহীন।

এই পটভূমিকায় এলেন মহামতি ডেভিড হেয়ার। ইংরেজি শিক্ষার রীতিমতো একটা ব্যবস্থা করবার জন্য তিনি উদ্যোগী হলেন। নিজে প্রথমে একটা স্কুল স্থাপন করলেন (হেয়ার স্কুল) এবং সর্বপ্রথম তিনিই হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন। শুধু প্রস্তাব করা নয়, তিনিই ছিলেন এর প্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্যোগী। বাংলার নবজাগরণে মানবপ্রেমিক ডেভিড হেয়ারের দান অবিস্মরণীয়। রাজনারায়ণ বসু তাই সকৃতজ্ঞচিত্তে লিখেছেন :

"ডেভিড হেয়ার এই দেশে ঘড়ির ব্যবসায় দ্বারা লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বদেশ স্কটলণ্ডে ফিরিয়া না গিয়া সেই সমস্ত অর্থ এতদ্দেশীয় লোকের হিতসাধনে ব্যয় করিয়া পরিশেষে দরিদ্র দশায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এতদ্দেশীয়দিগের

ইংরাজি শিক্ষার স্বষ্টিকর্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি হেয়ার স্কুল স্থাপন করেন ও হিন্দু কলেজ স্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। আমি একজন তাঁহার ছাত্র ছিলাম। আমি যেন দেখিতেছি, তিনি ঔষধ হস্তে লইয়া পীড়িত বালকের শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; অথবা যেখানে যাত্রা হইতেছে, তথায় হঠাৎ আসিয়া অভিনেতা বালককে নীচ আমোদক্ষেত্র হইতে বলপূর্বক লইয়া যাইতেছেন।"

পরবর্তী কালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথও তাঁর আত্মচরিতে ডেভিড হেয়ারের কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করেছেন। সুরেন্দ্রনাথের পিতা দুর্গামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ডেভিড হেয়ারের অন্যতম প্রিয় ছাত্র ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"The memory of David Hare, one of the pioneers of English education in Bengal, is still adored though more than two generations have elapsed since his death; and on the first of June every year, the anniversary of his death, the unpretentious monument standing on unconsecrated ground is covered with flowers and wreaths by those who never saw him in the flesh, but who enshrine his memory in their grateful hearts. He came out to India as a watch-maker and died as a prince among philanthropists, loved in Hindu homes by their inmates, with whom his relations were friendly, and even cordial."*

১৮১৩।

কোম্পানীর সনন্দে ভারতবর্ষে শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ ধার্য হলো। কিন্তু সেই টাকা দিয়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনে কোনো

* ডেভিড হেয়ারের খ্রীষ্টান প্রথানুসারে সমাধি হয় নি। গোঁড়া পাদ্রিরা তাঁকে নাস্তিক বলে ঘৃণা করতেন। কলেজ স্কোয়ারের একাংশে হেয়ারের সমাধি বিদ্যমান।

রকম সাহায্য করা হলো না। কোম্পানী ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেন, কিন্তু পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা এই ব্যাপারে কোনো রকম সহায়তা করতে বা উৎসাহ দিতে বিরত রইলেন। কারণ—তখনো পর্যন্ত সরকারী নীতি ইংরেজি শিক্ষার পরিপোষক ছিল না মোটেই। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব, পরিকল্পনা রচনা এবং এই সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা যা কিছু হয়েছিল তা বেসরকারী ভাবেই। রামমোহনের আত্মীয় সভায় এর সূচনা আর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের ভবনে এর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। আত্মীয় সভায় একদিন ডেভিড হেয়ার এই বিষয়ে প্রথম আলোচনা তুললেন। তখন তাঁর নিজের স্কুল আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। হেয়ার স্কুলের প্রথম নাম ছিল স্কুল সোসাইটির স্কুল। ইংরেজি শিক্ষা প্রচারে এই স্কুল সোসাইটির নামও স্মরণীয়। এঁরা ঠনঠনিয়া কালীতলায় মেয়েদের জন্য একটা বড়ো স্কুল ও দুটো ইংরেজি স্কুল সংস্থাপন করেছিলেন; এরই মধ্যে একটি ছিল হেয়ার সাহেবের স্কুল। এই সোসাইটি শহরের বাংলা পাঠশালার গুরুমশাইদের পারিতোষিক দিয়ে শিক্ষার উন্নত প্রণালী অবলম্বন করতে উৎসাহ দিতেন। রাধাকান্ত দেবের শোভাবাজারের বাড়িতে এই পারিতোষিক বিতরণ করা হতো। এই সোসাইটির উৎসাহেই শিক্ষার ব্যাপারে রাধাকান্ত দেব সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর 'স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক' ও 'নীতিকথা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রধানতঃ সোসাইটির উৎসাহেই রচিত হয়েছিল।

রামমোহন বললেন—স্কুল সোসাইটি ত বেশ কাজ করছে।

ডেভিড হেয়ার বললেন—তা ঠিক, কিন্তু ঠিকমতো ইংরেজি শিক্ষা এখনো হচ্ছে না। ভালো প্রণালীতে একটা বড়ো ইংরেজি স্কুল করা দরকার।

রামমোহন বললেন—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এ বিষয়ে আত্মীয় সভার বাইরে একটা সভা হওয়া দরকার।

সভা হলো। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি তখন স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্ট। ডেভিড হেয়ার তাঁকে ডেকে আনলেন। কলকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন—রাধাকান্ত ছিলেন, রামমোহনও ছিলেন। তখন রামমোহনের ধর্মসংস্কার নিয়ে হিন্দুসমাজে প্রবল আলোড়ন শুরু হয়েছে। রাধাকান্ত বললেন,—রামমোহন রায় এর মধ্যে থাকলে আমরা থাকব না।

—আমি থাকলে যদি বিদ্যালয়ের স্থাপন ও উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে, তবে আমি এর সংস্রবে থাকব না,—বললেন রামমোহন।

১৮১৭। ২০শে জানুয়ারি।

বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে এই বৎসরটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম এই বৎসরের প্রসিদ্ধ ঘটনা।

গরানহাটায় গৌরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে কুড়িজন ছাত্র নিয়ে স্কুল স্থাপিত হলো। তখনো হিন্দু কলেজ নাম হয় নি। একটি কমিটি হলো। কমিটিতে রইলেন—ডেভিড হেয়ার, গোপীমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ আর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ইংরেজি, বাংলা, ফারসী এবং পরে সংস্কৃত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয় এই স্কুলে। কিছুদিন পরে গরানহাটা থেকে স্কুল উঠে এলো চিৎপুরে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে। সেখান থেকে টেরিটি বাজার। তারপর ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে পটলডাঙায়, সংস্কৃত কলেজের নব-নির্মিত ভবনে। বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর আর গোপীমোহন ঠাকুর দশ হাজার টাকা করে বিশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন এই স্কুল স্থাপনের জন্য। তার আগে শিক্ষার ব্যাপারে এই পরিমাণ বেসরকারী কোনো দানের দৃষ্টান্ত বাংলা দেশে দেখা যায় নি। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি সংস্কৃত কলেজের প্রস্তাবিত নূতন ভবনে ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট। এই সময়ে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য রাজা রামমোহন রায় তুমুল চেষ্টা করছিলেন এবং ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের ঠিক এক বছর আগে ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচলন করবার জন্য তিনি লর্ড আমহার্ষ্টকে একখানি পত্র লিখেছিলেন। এই চিঠিখানিই ছিল এ দেশে ইংরেজি শিক্ষার আসল ভিত্তি-প্রস্তর। তখনো ইংরেজদের মধ্যে এ দেশের লোককে ইংরেজি শিক্ষা দেবার বিধেয়তা নিয়ে তুমুল আন্দোলন চলছিল। তাঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে, কেউ বিপক্ষে; ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসন প্রমুখ প্রাচ্যবিদ্যাবিশেষজ্ঞ ইংরেজরা কেবল আরবি, ফারসী,

ও সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে ছিলেন। এই নিয়ে দুই দলে ঘোরতর বিবাদ। হিন্দু কলেজ পটলডাঙায় আসবার আগে থেকেই এই বিতর্কের সূত্রপাত এবং তারপরও এই বিতর্ক চলেছিল দশ বছর। দশ বছর পরে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট লর্ড মেকলের স্থপারিশ অনুযায়ী এ দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বেশি করে মনোযোগ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মেকলের স্থপারিশ প্রধানতঃ রামমোহনের ১৮২৩-এর চিঠিতে প্রদর্শিত যুক্তির উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়।

প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে, পটলডাঙার নূতন বাড়িতে নূতন সংস্থাপিত সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ সন্নিবেশিত ছিল। প্রাচ্য ভাবধারার সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবধারা এইভাবে সেদিন মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল, মাঝখানে ছিল শুধু একটা শক্ত বেড়া। বেড়ার একদিকে মুগ্ধবোধ, ওদিকে মিলটন ও বেকন; একদিকে ধুতি-চাদর, অন্যদিকে হ্যাটকোট-প্যাণ্ট। প্রথম ষোল বছর (১৮১৭-৩৩) হিন্দু কলেজের হেড মাষ্টার ছিলেন ডেনসেলেম। তাঁর সময়ে শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন টাইটলার, রস, থিওডর ডিকেন্স আর জন পিটার গ্র্যাণ্ট। টাইটলার সাহেব সাহিত্য ও গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। অতি সুপণ্ডিত। এই সময়ে হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ডিরোজিও—হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। জাতিতে পর্তুগীজ। রাজনারায়ণ বস্থ লিখেছেন:

> "ছাত্ররা ডিরোজিও সাহেবের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। তাঁহার একটি বিশেষ গুণ ছিল যে, তিনি বালকদিগের মন বিশেষ-আকর্ষণ করিতে পারিতেন। তিনি স্কুলের সময়ের পূর্বে ও পরে বালকদের সহিত কথোপকথনচ্ছলে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তিনি তাহাদিগকে Mental philosophy অর্থাৎ মনস্তত্ত্ব, ইংরাজি সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন। তাঁহার উপদেশের প্রভাবে ছাত্রগণের মনে হিন্দুধর্মের প্রতি অনাস্থার ভাব উদয় হইয়াছিল।"

সত্যই সেদিন হিন্দু কলেজের আকর্ষণের কেন্দ্রই ছিলেন ডিরোজিও। ছাত্ররা তাঁকেই বেশি করে চিনতো, ভালোওবাসত। কেউ কেউ কলেজ থেকে তাঁর ধর্মতলার বাড়িতে পর্যন্ত গিয়ে পড়ে আসতো। প্রগাঢ় বিদ্যা

আর অকৃত্রিম স্নেহ—এই দিয়ে তিনি তাদের বশীভূত করেছিলেন। তাদের মনের মধ্য তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন যুক্তির অগ্নিস্রাব। ডিরোজিওর জনপ্রিয়তার আরো একটা নিগূঢ় কারণ ছিল। এই প্রিয়ম্বদ ও সুকবি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভারতবর্ষকেই তাঁর নিজের দেশ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন—তাঁর চিন্তায় অন্যান্য ফিরিঙ্গিদের মতো ইংলণ্ড ছিল না। এই দেশকে তিনি স্বদেশ জ্ঞান করে এর প্রতি যথেষ্ট মমতা করতেন। একটি কবিতায় তিনি এর স্বাক্ষর রেখে গেছেন :

"My country ! in thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as deity thou wast,
Where is that glory, where that reverence now ?

এই 'My country' 'আমার স্বদেশ' বলতে ডিরোজিও ভারতবর্ষকেই বুঝতেন। তখনকার সময়ে একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেবের পক্ষে ভারতবর্ষকে এমন প্রেমের চক্ষে দেখা সত্যই এক বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। ভারতবাসীকে তাঁর নিজের স্বজাতি বলে মনে করতেন ডিরোজিও। কবিতায়, উপদেশে, খবরের কাগজে গৈরিকস্রাবের মতোই নির্গত হতো তাঁর হৃদয়ের অনুরাগ। সাধারণ স্কুল-মাষ্টারি করেন নি ডিরোজিও—তাঁর সকল চিন্তার কেন্দ্রে ছিল এই অধঃপতিত ও আত্মবিস্মৃত জাতির কল্যাণ। ছাত্রদের তিনি সেই পথেই উৎসাহ দিতেন। নানাভাবে তাদের চিন্তাশক্তি ও তর্কবুদ্ধিকে উন্মেষিত করে তিনি ছেলেদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন যুক্তি ও বুদ্ধিবাদের পতাকা আর তাদের চক্ষে দিয়েছিলেন নূতন দৃষ্টি। ফুলের পাঁপড়ির মতো দলে দলে বিকশিত হয়ে উঠেছিল তাদের চিত্ত। সর্বসংস্কারমুক্ত নব উদ্‌বোধিত সেই চিত্তের স্বর্ণবেদীতেই সেদিন রচিত হয়েছিল নবজাগরণের আসন। দুঃখের বিষয়, লাঞ্ছনা ও অপবাদের মধ্যে ডিরোজিওর জীবনদীপ নিভে যায় মাত্র তেইশ বছর বয়সে।

ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে পাঁচজন খুব প্রসিদ্ধ—রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামতনু লাহিড়ী। ছাত্ররা যে তাঁর কত প্রিয়পাত্র ছিল, তাদের ওপর তাঁর

কত আশা-ভরসা ছিল আর তাদের তিনি কত যত্ন করতেন, তার প্রমাণ তাঁর এই কবিতাটির মধ্যে পাই :

To the Students of the Hindu College :
Expanding like the petals of young flowers,
I watch the gentle opening of your minds
And sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers……"

ডিরোজিওর আশা বিফল হয় নি।

তাঁর ছাত্রদের সকলেই পরবর্তী জীবনে অশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ—এই ছিল ডিরোজিওর সবচেয়ে বড়ো দান এবং বাংলার নবজাগরণের পক্ষে সেদিন এই স্বাধীন চিন্তাশক্তিই ছিল সর্বপ্রধান উপাদান। স্থতরাং ডিরোজিওকে পরোক্ষভাবে বাংলার রেনেসাঁর অন্যতম স্রষ্টা বলে গণ্য করা যেতে পারে। হিন্দু কলেজের প্রাগ্রসর ছাত্ররা সেদিন ডিরোজিওর ভবনে যেমন নিষিদ্ধ পানভোজনের অভ্যাস করেছিলেন, তেমনি স্বাধীনচিন্তার অনুশীলনও করেছিলেন যথেষ্ট। ডিরোজিও শুধু শিক্ষক ছিলেন না, বিপ্লবী-চেতনা-সম্পন্ন শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের হাতে তিনি ব্র্যাণ্ডির গেলাস তুলে দিয়েছিলেন এ কথা যেমন সত্য, তেমনি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মনে বিপ্লব আনবার জন্যে তাদের নিয়ে একটি একাডেমিক এসোসিয়সনও গড়ে তুলেছিলেন। সেদিন বাংলার সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাসে এই একাডেমিক এসোসিয়েসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মোটকথা, হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মনে নব-জীবনের সঞ্চার করে দিয়েছিলেন এবং সেই পথ দিয়েই এসেছিল নবজাগরণ।

রামমোহন দিয়েছিলেন য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চমৎকারিত্বের ইঙ্গিৎ ; ডিরোজিও দিলেন জ্ঞানের স্বাদ, ইংরেজি সাহিত্য দর্শন ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির নূতন বাণী। প্রাণোচ্ছল ও প্রেরণাময় সেই বাণী। সেই অবিচল কণ্ঠ থেকে সেদিন বজ্রনির্ঘোষে ধ্বনিত হয়েছিল স্বাধীন চিন্তা আর

সত্যনিষ্ঠা। ছাত্রদের মধ্যে জাগলো বিদ্রোহ, তাদের জীবনের প্রবাহপথে দেখা দিল সর্বগামী উদারচিত্ততা আর বোধ ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা। সমাজ-জীবনে সে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। যুগবিপ্লবের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস। To live and die for truth—শিক্ষকের এই বাণী তরুণ ছাত্রদের মনে জাগিয়ে তোলে বিদ্যুৎতরঙ্গ।

ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও—এই দুটি নামই বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ১৮২৩-এ লর্ড আমহার্ষ্টকে চিঠি লিখে রামমোহন নবযুগের প্রথম যে শঙ্খধ্বনি করেছিলেন, স্বদেশবাসীদের মুখ পূর্ব থেকে পশ্চিমের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, হিন্দু কলেজের শিক্ষার ভেতর দিয়ে তা ক্রমশঃ একটা স্থায়ী এবং সুস্পষ্ট রূপ নিতে লাগলো। নবজাগরণের সেই রূপলেখার আলিম্পন এঁকে দিয়েছিলেন ডিরোজিও। ডিরোজিওর জীবনচরিতকার এডওয়ার্ড টমসন লিখেছেন:

> "Derozio fostered their (students) taste in literature; taught the evil effects of idolatory and superstition; and so far formed their moral cenceptions and feelings as to place them completely above the antiquated ideas and aspirations of the age. Such was the force of his instructions that the students of the College were all considered men of *truth*".

নবজাগরণের এই আর একটি উপাদান—*truth* অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠা এবং ডিরোজিওর ছাত্রগণ উচ্ছৃঙ্খল আচার-আচরণ সত্ত্বেও এই একটি মহৎ ধর্ম তাদের প্রিয় শিক্ষকের নিকট থেকে লাভ করেছিল। নূতনের পথে এই-ই ছিল তাদের প্রধান পাথেয়। স্বাধীন চিন্তা আর সত্যনিষ্ঠা—এই-ই ছিল সেদিন হিন্দু কলেজের বিশেষ দান এবং এরই উপর ভিত্তি করে দেখা দিল নবজাগরণ। হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে 'ডিরোজিও-বৃক্ষের ফল' তাঁরা হলেন: কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাম-গোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এঁরা সকলেই ঊনবিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেন।

হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হয় কাপ্তেন রিচার্ডসনের সময়ে মাইকেল এই রিচার্ডসনেরই ছাত্র ছিলেন।

এ সিদ্ধান্ত অনৈতিহাসিক নয় যে, হিন্দু কলেজের ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমেই বাংলা দেশে নবজাগরণ পুরোপুরি সম্ভব হয়ে উঠেছিল। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে রেনেসাঁর স্ফুরণ হতে থাকে। এই হিন্দু কলেজ থেকেই আমরা পেয়েছি উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকবি মাইকেলকে, প্রথম ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রকে আর বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে। আর কিছুর জন্য না হোক, অন্তত এই তিনটি বিষয়ের জন্য বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে হিন্দু কলেজের নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে। এই সঙ্গে অবশ্য রামমোহনের এ্যাংলো-হিন্দু স্কুলেরও নাম করতে হয়। রামমোহনের এই স্কুল থেকে আমরা পেয়েছি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। দুইটিই প্রায় সমসাময়িক। সুষ্ঠুভাবে ইংরেজি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রামমোহনের স্কুলেই প্রথম হয়। তার ওপর রামমোহনের স্কুলটি ছিল অবৈতনিক, গরীবের ছেলেরাই এখানে ইংরেজি শিক্ষা লাভ করতো, হিন্দু কলেজ ছিল বড়লোকদের ছেলেদের জন্য। রামমোহনের স্কুলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁর বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর। হিন্দু কলেজ ও এ্যাংলো-হিন্দু স্কুল—বাংলার নবজাগরণের দুইটি কেন্দ্র বিন্দু।

॥ পাঁচ ॥

এই হিন্দু কলেজে পড়তে এলেন মধুসূদন দত্ত।

মুন্সী রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে মধুসূদন দত্ত। বয়স তখন তাঁর তেরো।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ তখন কাপ্তেন ডেভিড লিষ্টার রিচার্ডসন। তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু তাই বলে তিনি সংশয়বাদীও ছিলেন না। কবি-প্রকৃতির মানুষেরা সাধারণতঃ যে রকম হয়ে থাকেন, রিচার্ডসনও ছিলেন ঠিক সেই রকম—কতকটা শেলীর প্রকৃতি, নাস্তিক হলেও কাব্যে আস্তিক। এখনকার ছেলেরা সবাই রিচার্ডসনের ছাত্র। ছেলেদের তিনি ইংরেজি পড়ান। শেক্সপীয়ার তাঁর কণ্ঠস্থ। বিদ্যানুরাগ মধুসূদনের সহজাত। হিন্দু কলেজে এসে সেই অনুরাগ আরো গভীর হলো। প্রতিভাদীপ্ত চেহারা, প্রশস্ত ললাট, উদার উজ্জ্বল চোখ, সুন্দর কণ্ঠস্বর, পোযাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য এবং ল্যাভেণ্ডার ও পমেটম-সুরভিত সৌখিনতা—মধুসূদনের সবই ছিল বিস্ময়কর। হবে না কেন? তিনি যে মুন্সী রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে। আট-বেহারার পালকি চড়ে খিদিরপুর থেকে পটলডাঙায় পড়তে আসেন মধুসূদন। স্কুলে এসে পাঁচবার তিনি পোষাক বদলান। ছাত্র থেকে শিক্ষক সবাই দেখে অবাক। বাঙালির ছেলে, কিন্তু খাটি সাহেবিধরণে পোষাক পরতে জানেন। এমন বিশুদ্ধ ইংরেজি কথা বলেন, এমন কি ইংরেজি কবিতা লেখেন, ছন্দে ও মিলে নির্ভুল, ভাবে ও ব্যঞ্জনায় ইংরেজ কবিদেরই সমতুল্য। ইংরেজ শিক্ষকেরা বিস্মিত হন। এ যে দৈবী প্রতিভা? মধুসূদনের ওপর রিচার্ডসনের তাই একটু বিশেষ দৃষ্টি।

হিন্দুকলেজে এসে মধুসূদন যাঁদের সহাধ্যায়ীরূপে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নাম-করা ছাত্র ছিলেন প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জগদীশনাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, দিগম্বর মিত্র, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, বেণীমাধব বসু আর গৌরদাস বসাক। সহপাঠীদের মধ্যে মধুসূদনের প্রিয় বন্ধু ছিলেন তিনজন, রাজনারায়ণ, ভূদেব আর গৌর। আবার এই তিনজনের মধ্যে রাজনারায়ণই ছিলেন তাঁর প্রিয়তম বন্ধু। গৌরের বাবা, রাজকৃষ্ণ বসাক

ছিলেন রাজনারায়ণ দত্তের বন্ধু—সেই সূত্রে মধুসূদন ও গৌরের মধ্যে শুধু বন্ধুত্ব নয়, নিবিড় আত্মীয়তাও ছিল। গৌরদাসের মতো বন্ধু না থাকলে মাইকেল কোনো দিন বাংলা লিখতেন কি না সন্দেহ। মাদ্রাজ-প্রবাসী মাইকেলকে তিনিই বারবার বাংলা লিখবার জন্যে অনুরোধ করতেন, অনুযোগও করতেন। বন্ধুরা সবাই মধুসূদনকে ভালবাসতেন। ভালবাসতেন তাঁর প্রতিভার জন্য, আর তাঁর উদারতা ও শিশুসুলভ সরলতার জন্য। এত বড়-লোকের ছেলে, এমন বুদ্ধি, কিন্তু কী উদার হৃদয়। উদ্দাম, অসংযত আর চঞ্চল মধুসূদন অল্প দিনের মধ্যেই হিন্দু কলেজের একজন ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র বলে পরিগণিত হলেন। ধাপে ধাপে তিনি ওপরে উঠে যেতে লাগলেন, পেছনে পড়ে থাকে তাঁর চেয়ে বয়সে বড়ো ছাত্ররা। কিশোরী হালদার, প্যারীচরণ সরকার, বঙ্কুবিহারী দত্ত, গৌরদাস বসাক—সকল সহপাঠীরাই পরবর্তী কালে তাঁদের এই সহপাঠী সম্বন্ধে একবাক্যে বলেছেন—আমাদের মধ্যে সেরা ছাত্র ছিলেন মধুসূদন—যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে বৃহস্পতি। তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি প্রতিভাদীপ্ত। ইংরেজিতে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না।

হিন্দু কলেজের দেয়ালে তখনো ডিরোজিওর উত্তাপের স্পর্শ।

ভর্তি হয়ে অবধি মধুসূদন শুনে আসছেন তার কথা।

ডিরোজিও—ডিরোজিও! সবাই বলে ডিরোজিওর কথা। একদিন ক্লাসে মধুসূদন রিচার্ডসনকে জিজ্ঞাসা করলেন—স্যর, হু ইজ্ দিস্ ডিরোজিও?

—এ গ্রেট জিনিয়াস, মাই সন্! আমাদের স্কুলের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন তিনি, বললেন অধ্যক্ষ।

—স্যর, ডিরোজিও সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলুন, অদম্য কৌতূহল মধুসূদনের কথায়।

ইংরেজির পাঠ্যপুস্তক বন্ধ করলেন রিচার্ডসন। শুরু করলেন ডিরোজিওর কথা।

সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ। ছেলেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছে। মধু শুনছে তন্ময় হয়ে। পাশাপাশি বসে ভূদেব, গৌরদাস, রাজনারায়ণ, আর মধুসূদন।

এখনকার ইয়ং বেঙ্গল।

ডিরোজিওর জীবন-কাহিনী শেষ করে রিচার্ডসন শেষে বললেন: "মাই বয়েজ, কবিত্বশক্তি বা বিদ্যাবুদ্ধির জন্য ডিরোজিওর প্রশংসা নয়। তাঁর হাতে ছিল রেনেসাঁর মশাল। তারই উত্তাপ দিয়ে, আভা দিয়ে তিনি তাঁর ছাত্রদের মন দিতেন রাঙিয়ে, স্বাধীন চিন্তায় উদ্‌বোধিত করতেন তাদের—They were all brilliant boys like you!"

মধুসূদন শুনতে শুনতে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছেন যে, ক্লাস ভেঙে যাবার যাবার পর তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত বেঞ্চিতে নিস্তব্ধভাবে বসে রইলেন। গৌর কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, মধু বাড়ি যাবে না?

মধুসূদনের যেন হুঁস হলো এতক্ষণে। তখনো তাঁর কানে বাজছে রিচার্ডসনের কণ্ঠে আবৃত্তি-করা ডিরোজিওর কবিতা:

My country! in thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow...

—গৌর, আমরা যদি ডিরোজিওর ছাত্র হতে পারতাম, মধুসূদন বললেন ভাবার্দ্র কণ্ঠে।

—কেন, আমাদের রিচার্ডসন সাহেব ত কম নন, বললেন ভূদেব।

—ভূদেব, তুমি যাই বলো ডিরোজিওর মতো মাষ্টার হয় না, বলেন দিগম্বর মিত্র।

—হিন্দু কলেজের নাম তো তাঁরই জন্যে, বললেন রাজনারায়ণ।

—ইউ আর কোয়াইট রাইট, রাজ—বললেন মধুসূদন।—চলো, একদিন আমরা ডিরোজিওর বাড়ি যাই—লেট আস্ টাচ্ দি সেক্রেড প্লেস হয়ার হি লিভড্। To live and die for truth —কি সুন্দর কথা, গৌর?

সেদিন স্কুল থেকে ফিরতে মধুর দেরি হলো।

জাহ্নবী দেবী উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রতীক্ষা করছেন ছেলের জন্য। শিবরাত্রির সলতে।

—এমন দেরি তো হয় না কোনো দিন, গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে সরিয়ে বললেন মুন্সী রাজনারায়ণ। জানো বড়ো বৌ, সেদিন গৌরের বাবা, রাজকৃষ্ণ আমাকে বলছিল যে, মধু নাকি হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্র। ওর চেয়ে বয়সে বড়ো অনেক ছেলে পড়ে, কিন্তু ঐ নাকি ক্লাসের ফার্স্ট বয়।

এমন সময়ে দূরে পালকির আওয়াজ শোনা গেল। পালকি এসে থামলো দত্তবাড়ির সদর দরজার সামনে। মধুসূদন লাফ দিয়ে নামলেন। ডাকলেন—মা! মা!

—কী রে আজ তোর এত দেরি হলো? জিজ্ঞাসা করলেন রাজনারায়ণ।

—ডিরোজিওর গল্প শুনছিলাম, বাবা।

—ডিরোজিও!

—হ্যাঁ বাবা, a born rebel, a genius—আবেগে উত্তেজনায় মধুর সকল সত্তা স্পন্দিত।

—সে আবার কে? জিজ্ঞাসা করলেন জাহ্নবী দেবী।

চাকর এসে পোষাক ছাড়িয়ে দিলো। আর একজন রূপোর বাটি করে নিয়ে এলো গরম দুধ। তার হাত থেকে দুধের বাটিটা নিয়ে, ছেলের দিকে তাকিয়ে জাহ্নবী বলেন, মধু, এই নে। বলিষ্ঠ হাত দুখানি বাড়িয়ে কিশোর পুত্র দুধের বাটিটা নিলেন মায়ের হাত থেকে, নিঃশেষ করলেন এক চুমুকে।

—জানো মা, ডিরোজিও বড়ো সুন্দর মানুষ ছিলেন, আমাদের স্কুলেরই মাষ্টার ছিলেন তিনি। আমি তাঁর মতো হব।

মা চেয়ে থাকেন নির্বাক বিস্ময়ে ছেলের মুখের দিকে। গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নামিয়ে রাজনারায়ণ বলেন—ওসব ডিরোজিও-ফিরোজিও রাখ, মধু।

—ডিরোজিও, ডিরোজিও! বাবা, তুমি জানো না—

ছেলের কথা শেষ হবার আগেই জাহ্নবী দেবী তাকে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

সেদিনের রাতটা মধুসূদন ডিরোজিওর স্বপ্ন দেখে কাটিয়ে দিলেন। খিদির-পুরের নিভৃত পল্লী নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধ দত্তবাড়ি। মাঝে মাঝে জাহাজের বাঁশির শব্দ। স্বপ্নের মধ্যেই মধুসূদনের কানে প্রতিধ্বনিত হয় ডিরোজিওর বাণী—সত্যের জন্য জীবন অথবা মৃত্যু।

খিদিরপুরের দত্তবাড়িতে এমন বিচিত্র স্বপ্ন আর কেউ কখনো দেখে নি।

ডিরোজিওর মতো রিচার্ডসনও হিন্দুকলেজের ছাত্রদের খুব প্রিয় ছিলেন। স্পীড সাহেবের মতো তাঁর হাতে কেউ কোনো দিন বেত দেখে নি। অত্যন্ত বিদ্বান ও সুরুচিসম্পন্ন শিক্ষক রিচার্ডসন। প্রফেসর থেকে প্রিন্সিপল হন। ছেলেদের তিনি খুব যত্নের সঙ্গে ইংরেজি-সাহিত্য পড়াতেন। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন: "তিনি অতি সুন্দররূপে শেক্সপিয়ার বুঝাইয়া দিতে পারিতেন ও অতি মনোহররূপে শেক্সপিয়ার আবৃত্তি করিতেন। মেকলে সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, 'বিলাতে যাইলে আমি ভারতবর্ষের সমস্ত বিষয় ভুলিতে পারি, কিন্তু তুমি যেমন করিয়া শেক্সপিয়ার পাঠ কর, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না।' রিচার্ডসন সাহেবের নাম উচ্চারণ করিলে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তির হৃদয় কৃতজ্ঞতা রসে আপ্লুত হয়। ছাত্রদিগকে ইংরাজি সাহিত্যের মর্মজ্ঞ করিতে ও তাহাদিগের মনে তদ্বিষয়ে সুরুচি উৎপাদন করিতে তিনি যেমন পারগ ছিলেন, এমন অল্প লোক প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। বালকদিগের সহিত কাপ্তেন সাহেবের বিলক্ষণ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল, এমন কি পরিহাস পর্যন্ত চলিত। তিনি শব্দশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন।"

ডিরোজিও আর রিচার্ডসন—মধুসূদনের ছাত্রজীবনে এই দু'জন ইংরেজ অধ্যাপকের প্রভাব তাঁর চরিত্রে ফুটে উঠেছিল। তিনি যখন হিন্দুকলেজের ছাত্র তখন ডিরোজিও সেখানে ছিলেন না, তবু তিনি ছাত্রমহলে যে বিপ্লব-তরঙ্গের সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন, পরোক্ষভাবে মধুসূদন তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে ডিরোজিওর ছাত্র না হলেও, তাঁর শিক্ষা তাঁর জীবনেও কার্যকরী হয়েছিল। ডিরোজিওর মতো রিচার্ডসনও মধুর আদর্শস্বরূপ ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক রিচার্ডসন ছিলেন মধুসূদনের কল্পনাজগতের পথ-প্রদর্শক। মধুর কাছে এই রিচার্ডসন এত প্রিয় ছিলেন যে, তিনি তাঁর শিক্ষকের গুণগুলির অনুকরণ ত করতেনই, এমন কি তাঁর দোষগুলিও অনুকরণ করতে ভালবাসতেন। আত্মশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশসাধন—এই বীজমন্ত্র পেয়েছিলেন মধুসূদন রিচার্ডসনের কাছ থেকে। প্রকৃতির লীলাভূমি কপোতাক্ষ নদের তীরে মধুসূদন লালিত-পালিত এবং শৈশবে মায়ের মুখে রামায়ণ মহাভারত শুনে তাঁর মধ্যে কবিত্বশক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। আজ হিন্দুকলেজে এসে রিচার্ডসনের শিক্ষায়, আদর্শে ও

অনুপ্রেরণায় সেই বীজ উদ্ভিন্ন হবার সুযোগ পেলো—মাতৃভাষায় নয়, ইংরেজি ভাষায়। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালেই মধুসূদন ইংরেজিতে কবিতা রচনা করতেন। সময়ে-সময়ে কবিতা লিখে রিচার্ডসনকে দেখাতেন। তিনি ছাত্রকে উৎসাহ দিতেন। রিচার্ডসন তাঁর প্রিয় ছাত্রের কবিতা-রচনা-নৈপুণ্যে বিমোহিত হলেন। কিছু-কিছু কবিতা তাঁর নিজের কাগজে সমাদরে প্রকাশ করলেন। ছাপার অক্ষরে সিনিয়র দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র মধুসূদনের কবিতা বেরুলো। একটু অহঙ্কার হলো বৈ-কি—ইংরেজ শিক্ষক যার কবিতার প্রশংসা করেন এবং তাঁর নিজের কাগজে আগ্রহ করে তা ছাপান, সে নিশ্চয়ই সত্যিকারের কবি, সহপাঠীরা ভাবেন। বন্ধুর সাফল্যে তাদেরও গর্ব কম নয়। মধুসূদন তাঁর সহপাঠীদের কাছে হয়ে উঠলেন আলেকজান্দার পোপ। 'পোপ' বললে মধু পুলকিত হতেন। ডেভিড হেয়ারের নজরে পড়লেন মধুসূদন। তিনিও তখন হিন্দু কলেজের অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক। মধুসূদনের প্রখর বুদ্ধি ও রচনা-শক্তি দেখে হেয়ার সাহেব তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। ইংরেজি সাহিত্যের জন্যে যেসব পাঠ্যপুস্তক ক্লাসে নির্দিষ্ট ছিল, মধুসূদন কবেই সেসব পড়ে হজম করে বসে আছেন। দুর্নিবার ছিল তাঁর বইয়ের ক্ষুধা—অক্লান্ত ছিল তাঁর অধ্যয়ন-স্পৃহা। ইংরেজি সাহিত্যের নানা বিষয়ের বই তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্রাবস্থাতেই পড়ে শেষ করেছিলেন।

স্কুলে একবার প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হলো। মধুসূদন তখন সিনিয়র বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। 'স্ত্রীশিক্ষা' সম্বন্ধে ইংরেজিতে রচনা লিখতে হবে। এই রচনা-প্রতিযোগিতা ঘোষণা করেছিলেন রামগোপাল ঘোষ—হিন্দুকলেজের প্রসিদ্ধ প্রাক্তন ছাত্র, যাঁর ইংরেজি জ্ঞান দেখে ইংরেজ অধ্যাপকেরা বিস্মিত হতেন। রামগোপাল তখন অর্থ ও প্রতিপত্তিতে শিক্ষিত সমাজের একজন হয়ে উঠেছিলেন। প্রতিযোগিতার সঙ্গে দুইটি পদকের প্রতিশ্রুতিও ছিল। গৌর, ভূদেব, রাজনারায়ণ, প্যারীচরণ, মধুসূদন সবাই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করলেন। প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন ক্যামেরন সাহেব—গভর্ণর-জেনারেলের ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য সি. এইচ. ক্যামেরন। প্রতিযোগিতায় মধুসূদন প্রথম

হয়ে সোনার মেডেল পেলেন ; ভূদেব হলেন দ্বিতীয়, তিনি পেলেন রূপোর মেডেল। মধুসূদনের বয়স তখন সতর-আঠার। রচনার বিষয় ছিল 'স্ত্রীশিক্ষা'। লক্ষ্য করবার বিষয়, সেই বয়সে এইরকম একটা গুরুতর বিষয়সম্পর্কে মধুসূদনের চিন্তা কি রকম প্রগতিশীল। এর আগে হিন্দুকলেজের আর এক প্রাক্তন ছাত্র—একই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে প্রতিযোগিদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন। তাঁর নাম কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই একই বিষয়ে প্রতিযোগী মধুসূদন। প্রবন্ধের শেষ প্যারাগ্রাফে মধুসূদন লিখলেন :

> "In India, I may say in all the Oriental countries, women are looked upon as created merely to contribute to the gratification of the animal appetites of man. This brutal misconception of the design of the Almighty is the source of much misery to the fair sex···The people of this country do not know the pleasure of domestic life, and indeed, they cannot know, until civilization shows them the way to attain it."

এ যেন রামমোহনের চিন্তা, মধুসূদনের কলম দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। বাংলার সমাজে নারীর দুর্গতিময় জীবনের কথা সবে মাত্র তিনি তখন বলে গিয়েছেন। সেই চিন্তা যে রেনেসাঁর খাত বেয়ে নিঃশব্দে কাজ করে চলছিল, মধুসূদনের এই রচনাটি তার একটি অভ্রান্ত প্রমাণ। স্কুলের রচনা, হয় ত সেদিন বাইরে সাধারণ্যে প্রচারিত হয় নি—তবু এ-চিন্তার মূল্য অনেক।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে, আর মধুসূদন সঙ্গতিসম্পন্ন রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে। ভূদেব ফর্সা, মধুসূদন কালো। কিন্তু সেই কৃষ্ণবর্ণের তলায় কী শুভ্র, সুন্দর একটি মন ছিল তার পরিচয় পেলেন একদিন সহপাঠী ভূদেব। স্কুলে ভূদেবের কয়েক মাসের মাইনে বাকি পড়েছিল, মাইনে দেবার সঙ্গতিও ছিল না। ঠিক করলেন স্কুল ছেড়ে দেবেন। কথাটা মধুসূদনের কানে গেল। একদিন টিফিনের ছুটিতে গোলদীঘির ধারে তিনি ভূদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, শুনলাম তুমি নাকি পড়া ছেড়ে দিচ্ছ ?

—হ্যাঁ, বিষণ্ণ মুখে বললেন ভূদেব।—বাবা বামুনপণ্ডিত, অত টাকা কোথায় পাবেন ? চার মাসের মাইনে বাকি।

—আমি তো হাতখরচ অনেক টাকা পাই ; আমি তোমার মাইনে দিয়ে দেব, ভূদেব।

সেইদিনই মধুসূদন এক মোহর দিয়ে চুল ছেঁটেছেন সাহেব নাপিতের দোকানে। ভূদেব জানতেন মধু বড়লোকের ছেলে। কলেজের সে সেরা ছাত্র—প্রতিভা ও পয়সা দুইয়েই। স্কুলেই তিনি বার দুই-তিন পোষাক বদলাতেন আর কত বিভিন্ন রকমের সেসব পোষাক ! তাই মধু যথন বললেন, আমি তোমার মাইনে দিয়ে দেব, তখনই তিনি তাঁর সহপাঠীর হৃদয়ের সত্যকার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। পরবর্তী জীবনে, ছাত্রজীবনের এই কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে মনীষী ভূদেব লিখেছিলেন : "মধুসূদনকে ধনীর সন্তান বলিয়া জানিতাম। প্রতিভায় যেমন, ঐশ্বর্যের দীপ্তিতেও মধু তেমনি দীপ্যমান ছিলেন—দশহাতে তিনি টাকা খরচ করিতেন দেখিতাম। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ যে এমন উদার ছিল তাহা আমি সেইদিনই প্রথম জানিতে পারিয়াছিলাম।"

মধুসূদন যখন হিন্দুকলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র তখন তাঁর পাঠ্যতালিকায় অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে ছিল, বেকনের রচনাবলী ; শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ, কিং লিয়ার, ওথেলো ও হ্যামলেট ; মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট, লাইসিডাস, কোমাস ও চতুর্দশপদী কবিতাবলী। একদিন রিচার্ডসন ক্লাসে হ্যামলেট পড়াচ্ছিলেন। মধুসূদনের পরই ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। এঁর বাবা নন্দকিশোর বসু পড়েছিলেন রামমোহনের স্কুলে এবং ইনিই ছিলেন রাজার একজন প্রাথমিক শিষ্য। রিচার্ডসন রাজনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করলেন—মাই বয়, এক্সপ্লেন দিস্ লাইন :

That shows its hoar leaves in the glassy stream.

শেক্সপিয়ারের কথা শুনতে সহজ, কিন্তু অর্থ করা কঠিন। রাজনারায়ণ পারলেন না। অধ্যক্ষ তখন বুঝিয়ে দিলেন—গাছের পাতা সবুজ, কিন্তু তার

নিচের দিকটাই জলে প্রতিবিম্বিত হয়, সেই অংশ শাদা বলেই কবি 'hoar leaves' কথাটি প্রয়োগ করেছেন। মধুসূদন একমনে শুনছিলেন আর বিস্মিত অন্তরে ভাবছিলেন কী আশ্চর্য কবিত্ব-শক্তি শেক্সপিয়ারের! মধুসূদনের অন্যান্য সহপাঠীদের মধ্যে একমাত্র রাজনারায়ণই প্রকৃত কাব্যরসিক ছাত্র এবং মধুর মতো তিনিও ইংরেজি কবিতা পড়তেন না, গিলতেন। উভয়ের এই অসাধারণ কাব্যপ্রীতিই পরস্পরের বন্ধুত্বের যোগসূত্র ছিল।

মোট পাঁচ বছর মধুসূদন হিন্দু কলেজে পড়েছিলেন।

এই পাঁচ বছর সকল শ্রেণীতে তিনিই ছিলেন অগ্রগণ্য। কাব্য ও ইতিহাসেই তিনি ছিলেন বেশি মনোযোগী। মধুর ছাত্রজীবনের প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন:

> "আদুরে ছেলের চরিত্রে যেসকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা এ সময়ে মধুসূদনের চরিত্রে সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হইত। তিনি অমিতব্যয়ী, বিলাসী, আমোদ প্রিয়, কাব্যানুরাগী ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি প্রীতিমান ছিলেন। ধূলি মুষ্টির ন্যায় অর্থমুষ্ঠি ব্যয় করিতেন। সে সময়ে সুরাপান ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একটা সৎসাহসের কার্য বলিয়া গণ্য ছিল। মধুসূদনের সময়ে কলেজের অনেক ছাত্র সুরাপান করাকে বাহাদুরির কাজ মনে করিত। মধু তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মধুসূদন জ্ঞানানুশীলনে কখনই অমনোযোগী হইতেন না। কলেজে তিনি কাপ্তেন রিচার্ডসনের নিকট ইংরাজি সাহিত্য পাঠ করিতেন। সৎক্ষেত্রে পতিত কৃষির ন্যায় রিচার্ডসনের কাব্যানুরাগ মধুর হৃদয়ে পড়িয়া সুন্দর ফল উৎপন্ন করিয়াছিল। তিনি ছাত্রাবস্থাতেই ইংরাজি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন।"

কবিতা লেখেন, পড়াশুনায় ভালো, অদম্য জ্ঞানস্পৃহা আর জীবনে উচ্চাশা, সকলেই অনুমান করলেন, মধুসূদন নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে দেশের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হবেন। রাজনারায়ণ দত্ত ও জাহ্নবী দেবীও সে আশা করেছিলেন। কিন্তু যে প্রতিভার গুণে তিনি অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করতেন, সেই প্রতিভাই তাঁকে সুস্থির থাকতে দিল না। যৌবনের উন্মেষ হতে না হতে

তাঁর ভেতরের শক্তি তাঁকে অস্থির করে তুললো। সেই শক্তি তাঁকে তাঁর সমাজ ও পরিবার থেকে একেবারে কেন্দ্রচ্যুত করে দিল। গতানুগতিকের চিরপরিচিত পথ তাঁর জন্য নয়। দশজন যা করে, দশজন যা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, মধুসূদনের মতো প্রকৃতির লোকেরা চিরদিন তার ব্যতিক্রম। নূতন উত্তেজনার প্রচণ্ড প্রবাহ তাঁকে একদিন পরিবার ও সমাজের বন্ধন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল।

মধুসূদনের জীবনের সেই কাহিনী এইবার বলবো।

॥ ছয় ॥

স্থান—খিদিরপুর। সময়—মধ্যরাত্রি।

মধুস্থদন কবিতা লিখছেন :

> I sigh for Albion's distant shore,
> Its valleys green, its mountains high ;
> Tho' friends, relations, I have none
> In that far clime, yet, oh ! I sigh
> To cross the vast Atlantic wave
> For glory, or a nameless grave !

সতর বছরের একটি বাঙালি ছেলের কলম দিয়ে বেরুলো এই কবিতা। হিন্দু কলেজে তখন তাঁর চার বছর পড়া চলছে। কিন্তু তখন থেকেই মধুস্থদনের আকাঙ্ক্ষা তিনি কবি হবেন—মহাকবি হবেন আর তিনি বিলেত যাবেন। এ শুধু আকাঙ্ক্ষা নয়, এ তাঁর মনের দৃঢ় প্রত্যয়। এই প্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে এই সময়ে বন্ধু গৌর বসাককে লেখা একখানি চিঠিতে—"গৌর, যদি একবার ইংলণ্ডে যেতে পারি তাহলে আমি নিশ্চয়ই একজন বড় কবি হবো জেনো এবং তখন তুমি আমার জীবনচরিত লিখো"—'I am almost sure' এই একটি মাত্র কথার মধ্যেই মধুস্থদনের স্থনিশ্চিত ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। নিজেই নিজের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন এবং তা করছেন যখন তাঁর বয়স সতর-আঠারো বছর। তখন অবশ্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল তিনি ইংরেজি ভাষার কবি হবেন, বাংলার নয়। কিন্তু নবজাগরণের যে বিরাট শক্তি তখন খরবেগে দেশের ওপর দিয়ে বয়ে চলছিল, সেই শক্তি মধুস্থদনকে শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষারই মহাকবি করে তুলেছিল।

পৃথিবীতে কবিই শ্রেষ্ঠ, কবির চেয়ে বড়ো কিছু হতে পারে না—এই ধারণাও মধুস্থদনের ছাত্রজীবনেই পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবনীকার তাঁর ছাত্রজীবনের একটি স্থন্দর ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সাহিত্য-প্রীতি মধুস্থদনের সহজাত, কিন্তু অঙ্কেও তাঁর মাথা খেলতো। তবে আকর্ষণটা সংখ্যার চেয়ে কাব্যের দিকেই বেশি ছিল। "একবার ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সহপাঠীদিগের সহিত, শেক্সপিয়ার ও নিউটনের মধ্যে

প্রতিভায় কে শ্রেষ্ঠ, বিষয় লইয়া ঘোরতর তর্কযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। মধুসূদন শেক্সপিয়ারের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিলেন, 'শেক্সপিয়ার চেষ্টা করিলে নিউটন হইতে পারিতেন; কিন্তু নিউটন চেষ্টা করিলে কখনও শেক্সপিয়ার হইতে পারিতেন না।"

ইংরেজি-শিক্ষার প্রথম স্বাদ বাঙালির মনে এনে দিয়েছিল একটা মোহ, একটা মাদকতা। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বর্ণচ্ছটা এনে দিলো তাদের মনে বিহ্বলতা। মধুসূদনের চোখেও লাগল ধাঁধা। হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়ে অবধি "তিনি ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত, ইংরেজি-মন্ত্রে দীক্ষিত, ইংরেজিভাবে অণুপ্রাণিত ও ইংরেজী-তন্ত্রে রূপান্তরিত" হয়ে পড়েন। হিন্দু কলেজে পড়বার সময়ে মধুসূদন যেসব ইংরেজি কবিতা রচনা করেন সেগুলো সমসাময়িক বিভিন্ন ইংরেজি বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রাতে বাড়িতে কবিতা লেখেন, দিনের বেলায় স্কুলে এসে বন্ধুদের পড়ে শোনান; তারপর একে-ওকে বিলিয়ে দেন। টুকরোটুকরো কাগজে লেখা সেসব মণিমাণিক্য বন্ধুরা সযত্নে রেখে দিতেন—এ বিষয়ে গৌরদাসই ছিলেন সবচেয়ে বেশি যত্নশীল। প্রায়ই কবিতা কোনো কোনো বন্ধুর নামে উৎসর্গ করে লেখা (বেশির ভাগই গৌর বসাককে) আর সব কবিতার নীচেই কবির স্বাক্ষর থাকতো—M. S. Dutt. নানা ভাবের, নানা বিষয়ের ওপর তিনি কবিতা লিখতেন এই সময়ে; সন্ধ্যাবেলায় গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে চারদিকের পরিবেশ তাঁকে মুগ্ধ করলো, লিখলেন একটা কবিতা; কখনো বা রাত্রে নক্ষত্রপুঞ্জশোভিত আকাশের সৌন্দর্য দেখে কবি বিমোহিত হলেন, এমনি সেই বিষয় নিয়ে রচনা করলেন একটি কবিতা; কখনো বা কোনো সহপাঠীর বিদ্যানুরাগ, বিবিধ সদ্গুণ ও তার বন্ধুত্বে পরিতৃপ্ত হয়ে কবি লিখলেন একটি কবিতা; সন্ধ্যায় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, অমনি কবির ভাবজগৎ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো, রচনা করলেন একটি কবিতা; আবার কখনো কোনো ইংরেজ-কবির কোনো কবিতার মধ্যে একটি ভালো লাইন মনে জাগল, অমনি সেই ভাবটিকে কেন্দ্র করে নিজে রচনা করলেন আর একটি স্বতন্ত্র কবিতা। এইভাবে হিন্দু কলেজে পড়বার সময়েই মধুসূদন ইংরেজি কবিতা রচনা করেছিলেন। উনবিংশ শতকের বাংলাভাষার প্রথম মহাকবির কবি-জীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই

ইংরেজি কবিতাগুলি কবিতা হিসেবে নিখুঁত না হলেও মূল্যহীন নয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে পাশ্চাত্ত্যভাবের উগ্র মদিরা পানে বিহ্বলচিত্ত হলেও, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ স্বজাতির গৌরবে গৌরববোধ—মধুসূদনের মধ্যে তাঁর ছাত্রজীবনেই পূরো মাত্রায় দেখা গিয়েছিল। তাঁর মনের এই দিকটি, যে বিদ্যায়তনের তিনি ছাত্র ছিলেন, সেই হিন্দুকলেজের উদ্দেশে লেখা একটি ইংরেজি সনেটে অতি সুন্দররূপে প্রতিফলিত হয়েছে। স্কুলকে তিনি তুলনা করেছেন চারাগাছ সংরক্ষণের বাগানের সঙ্গে আর সহপাঠিদের তুলনা করেছেন পুষ্পকোরকের সঙ্গে—তারাই একদিন দলে দলে বিকশিত হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। মধুসূদনের কল্পনায় এই চিত্রটি এই ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল সেদিন :

Oh ! how my heart exulteth while I see
These future flowers, to deck my country's brow,
Thus kindly nurtured in this nursery !

এই বোধ, এই চিন্তা নবজাগরণের প্রবাহপথে স্বাভাবিক নিয়মেই মধুসূদনের মধ্যে সেই বয়সে দেখা দিয়েছিল। রেনেসাঁ এইভাবেই সেদিন তাঁর ভেতর দিয়ে অজ্ঞাতসারে কাজ করে চলেছিল। মধুসূদনকে হিন্দুকলেজে রেখে, আমরা আর একবার বাংলার নবজাগরণের অরুণচ্ছটার দিকে দৃষ্টিপাত করবো।

মধুসূদনের জন্মের সময়ে রেনেসাঁ হিন্দুকলেজীয় শিক্ষার ধারাপথে ক্রমশঃ দুর্বার হয়ে উঠেছিল। এই ধারার প্রবর্তক ছিলেন যুক্তিবাদী ও ভারতপ্রেমিক হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও। তাঁর ছাত্ররা তাঁদের হৃদয়ের পাত্রে তাঁদের দীক্ষাগুরুর যে অগ্নিবাণী আহরণ করে রেখেছিলেন, ডিরোজিওর মৃত্যুর পর সেই বাণী ইয়ং বেঙ্গলের নানা কর্মপ্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। তারই "ঘাত-প্রতিঘাতে বাংলার সমাজ-প্রাঙ্গন কলরব মুখর হয়ে উঠল। ইতিহাসের এক নতুন কলরব, প্রাণহীন স্থিতিশীল সমাজে যা শোনা যায় না কখনো। আলাপ-আলোচনা, তর্ক, বিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ, আলোড়ন

আন্দোলনের মধ্যে সমাজের এই নতুন প্রাণচাঞ্চল্য আত্মপ্রকাশ করে।” রামমোহন ও ডিরোজিও, নব্য বাংলার এই দুই দীক্ষাগুরু বাঙালির সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে দিয়ে গেলেন। স্বাধীন চিন্তার কিরণদীপ্তিতে বাংলার আকাশ-বাতাশ তখন দীপ্যমান। ইতিহাসের নিয়মই এই যে, “নতুন কোনো নীতি বা জীবনাদর্শ যখন বাইরে থেকে সমাজের মধ্যে আমদানি হয়, তখন প্রথম দিকে সেটা অনেকটা বিস্ফোরকের কাজ করে। কিছুদিন পরে তার প্রাথমিক উত্তাপ যখন কমে যায়, তখন আবার মানসিক ভারসাম্য ফিরে আসে।”

মাইকেলের জন্মকালে এবং তাঁর শৈশবের প্রথম ছয় বৎসর বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে উত্তাপ-উত্তেজনার মাত্রাই বেশি। তখন বাংলাদেশে প্রত্যক্ষভাবে রামমোহনের যুগের পূর্ণ একটি পর্ব অতিক্রান্ত হয়েছে এবং নবীন দীক্ষাগুরু ডিরোজিওর শিক্ষা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মনে নিয়ে এসেছে প্রবল ভাব-বিপ্লব। নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্বে, প্রাচীনরা তখনো কিছুটা প্রবল। নবজাগরণের এই সংঘর্ষমুখর অধ্যায়ে পাদ্রি ডাফ সাহেব এসে পৌছলেন কলকাতা শহরে। তিনি এসে কী লক্ষ্য করলেন? শিক্ষিতদের মনে Revolution বা ভাব-বিপ্লব। “তিনি এসে এমন একদল যুবককে দেখতে পেলেন, যারা যে কোনো বিষয় নিয়ে সর্বপ্রথম স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে, অবাধে আলাপ-আলোচনা করতে শিখেছে। দেখলেন, “তারা যে শিক্ষা পেয়েছে, তার মধ্যে ধর্মশিক্ষার স্থান নেই।” ডাফের ভারতবর্ষে আসার আসল উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রচার। কিন্তু ডিরোজিওর শিক্ষার ফলে ইয়ংবেঙ্গল তখন ধর্মের ত্রিসীমানা দিয়ে হাঁটত না—তা সে হিন্দু ধর্মই হোক, আর খ্রীষ্টান ধর্ম হোক। ডাফ তখন সোজাসুজি প্রচারের পথ ছেড়ে অন্য পথে গেলেন। তাঁর স্কুলের একতলার হলঘরে খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে প্রকাশ্য বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন; বক্তৃতার পর স্বাধীনভাবে সমালোচনা করা ও বক্তাকে প্রশ্ন করার অধিকার প্রত্যেক শ্রোতাকে দেওয়া হলো। ফাঁদটি তিনি ভালই পেতেছিলেন বলতে হবে। কলকাতার লোকেরা ভাবল খ্রীষ্টান করার এ এক নূতন কৌশল। হিল সাহেবের বক্তৃতার পরই উঠলো বাদ-প্রতিবাদের তুমুল কোলাহল। হিন্দু কলেজের ছেলেরাই বেশির ভাগ এইসব বক্তৃতা শুনতে যেত

ও আলোচনায় যোগদান করতো। অভিভাবকদের নজরে এলো ব্যাপারটা। তাঁরা স্কুলের কর্তৃপক্ষের গোচরে নিয়ে এলেন বিষয়টা। সঙ্গে সঙ্গে কলেজ থেকে ছাত্রদের ওপর আদেশ জারি হলো—তোমরা কোনো ধর্মালোচনায় যোগদান করতে পারবে না। কিন্তু বাংলার বিশেষ করে কলকাতার তথনকার সমাজজীবনের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রামমোহন তথন এক বিরাট সামাজিক অগ্রগতির সূচনা করেছিলেন এবং পরবর্তী ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তা ক্রমে হয়ে উঠল আবর্তসঙ্কুল এবং ঠিক সেই মুহূর্তে রামমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং তিনি আর ফিরে আসেন নি। তথনই নবীনের সঙ্গে প্রবীণের সংঘর্ষ ঘনীভূত হয়ে উঠল। ইতিহাসের বিচারে এ দ্বন্দ্ব ছিল যৌবনের সঙ্গে স্থবিরত্বের। সংঘাত ক্রমে তীব্র হয়ে উঠল। হতে বাধ্য। সংঘাত ছাড়া নবজাগরণ কোথায়?

এই সংঘর্ষের পথ দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই এলো নানা রকমের সভাসমিতি এবং এই সভাসমিতির ভেতর দিয়েই দানা বেঁধে উঠল স্বাধীন চিন্তা, অবাধ আত্মপ্রকাশ আর পরস্পর মিলনের অধিকার। নবজাগরণের এই তিনটিই প্রধান স্তম্ভ। মধ্যযুগীয় বাংলায় এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এই অধ্যায় থেকেই প্রকৃত চিন্তাবিপ্লবের শুরু। পাশ্চাত্যজগতে এই চিন্তাবিপ্লবের শুরু অষ্টাদশ শতকে এবং যাঁদের রচনায় এর সূত্রপাত তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্পিনোজা, ভলটেয়ার, লক, হিউম ও টম পেইন। এঁরাই সেদিন নবযুগের নবীন চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক আলোড়নের সৃষ্টি করেন। তারপর "অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে ভলটেয়ার, হিউম, লক, টম পেইন প্রমুখ নবযুগের চিন্তানায়কদের রচনাবলী গ্রন্থাকারে কলকাতার বন্দরে আমদানী হতে থাকে। এগুলো ছিল বিদেশী ব্র্যাণ্ডির চেয়ে বেশি উত্তেজক। ডাফ সাহেব স্বচক্ষে দেখেছেন যে, "এক হাতে ব্র্যাণ্ডি, আর এক হাতে বই নিয়ে ইয়ংবেঙ্গল দল চিন্তাবিপ্লবের উদ্যোগ করেছিলেন।" টম পেইনের *Age of Reason* আর *Right of Man* বই দুখানি সেদিন হাজার হাজার কপি আমদানি হয়েছিল।

তারপর হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের ছাত্ররা নূতন মানবাধিকার ও অবাধ চিন্তার আদর্শে হলেন অনুপ্রাণিত। প্রাচীনপন্থীদের বিরুদ্ধে তাঁরা শুরু করলেন

সংগ্রাম। যুক্তির আলোকরশ্মি নিয়ে তাঁরা অগ্রসর হলেন যুক্তিযুগের প্রতিনিধি হিসেবে। পত্রিকা ও সভা-সমিতির ভেতর দিয়ে শুরু হলো তাঁদের অভিযান। প্রাচীনরা ধর্মসভার বেদী থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে ঘন ঘন তোপধ্বনি করলেন। ইয়ংবেঙ্গল অবিচলিত। প্রথম যুগের ছাত্রদের মধ্যে তখন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন—তাই নিয়ে সমাজে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ১৮৩১, ডিসেম্বর মাস। ডিরোজিওর মৃত্যু হলো। হয়ত মৃত্যুর সময়ে সেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত বিপ্লবী এই কামনা করেছিলেন যে, "অদূর ভবিষ্যতে একদিন মুক্ত বিহঙ্গের মতন ইয়ং বেঙ্গল তাদের বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভার পক্ষ বিস্তার করবেন, গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন।" ডিরোজিওর এ-কামনা নিস্ফল হয় নি। মৃত্যুর আগে একটি বড় সম্পদ তিনি তাদের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন—এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন। তাদের দিয়ে তিনি কাগজও বের করিয়েছিলেন। এই পত্রিকা আর সভাসমিতির আশ্রয়েই ইয়ং বেঙ্গল সত্যই বুদ্ধি ও যুক্তির পক্ষ বিস্তার করেছিল। ১৮২৪ থেকে ১৮৩০—মাইকেলের জন্মের ছ' বছরের মধ্যেই "দেশের সামাজিক অবস্থার যে কত দ্রুত পরিবর্তন হয়ে ছিল, সভা-সোসাইটির অভাবনীয় সংখ্যাবৃদ্ধি থেকেই তা বোঝা যায়। তার ফলে যে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার প্রসার হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

কলকাতা শহরে যখন এই রকম প্রচণ্ড আলোড়নের ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়ে নবজাগরণকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে এসেছে, সেই সময়ে মধুসূদন সাগরদাঁড়ি গ্রামে মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় তাঁর শৈশবের দিনগুলি যাপন করছেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামের দত্ত-বংশে মধুসূদনের জন্ম। পিতা ছিলেন তখনকার কলকাতার সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিসম্পন্ন আইনজীবি রাজনারায়ণ দত্ত আর মাতা জাহ্নবী ছিলেন খুলনার বিখ্যাত জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের দুহিতা। নানা গুণে গুণবতী ছিলেন জাহ্নবী। মধুসূদন রাজনারায়ণের একমাত্র পুত্র—একমাত্র পুত্র এই অর্থে যে জাহ্নবীর পরবর্তী আর দুইটি পুত্র অল্প বয়সেই মারা যায়। জন্মের পর তেরো বছর বয়স পর্যন্ত মধুসূদনের জীবন অতিবাহিত হয়েছিল কপোতাক্ষ-বিধৌত পল্লী-জননী সাগর-

দাঁড়ির স্নেহচ্ছায়ায়। মধুসূদনের যখন সাত বছর বয়স তখন থেকেই রাজনারায়ণ স্থায়িভাবে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। খিদিরপুরের বাড়ি সেই সময়েই তৈরি হয়। মধুসূদনের প্রথম শিক্ষা ক্ষেত্র—তাঁর জন্মভূমি, সাগরদাঁড়ি গ্রাম। মধুসূদনের জীবন থেকে এই সাগরদাঁড়ি কোনোদিন মুছে যায় নি—খ্রীষ্টান হবার পরেও নয়। বাংলার চির-পরিচিত চণ্ডীমণ্ডপেই তাঁর হাতে খড়ি এবং প্রথম শিক্ষা। কিন্তু তাঁর কবিত্বের প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন মায়ের কাছ থেকেই। মধুসূদনের জীবনচরিতাকার উল্লেখ করেছেন যে, 'জাহ্নবী অসাধারণ গুণশালিনী মহিলা ছিলেন। বিদ্যাচর্চায় তিনি মানসিক মহত্ত্ব ও হৃদয়ের প্রসারতা লাভ করেন।…পরদুঃখকাতরতা, সহৃদয়তা, বদান্যতা এবং স্বার্থশূন্যতা প্রভৃতি নানা গুণ তাঁহাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।"

নিঃসন্দেহে উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্র মধুসূদন তাঁর মায়ের এইসব গুণ সম্পূর্ণ ভাবে পেয়েছিলেন। রাজনারায়ণ কর্মোপলক্ষে কলকাতায় থাকতেন, জাহ্নবী ছেলেকে নিয়ে থাকতেন দেশের বাড়িতে। কাজেই মধুসূদনের শৈশবের প্রথম শিক্ষার ভার তাঁর মায়ের ওপরই পড়েছিল। পাঠশালায় গুরুমশাইয়ের কাছে পড়লেও, "জননী জাহ্নবী পুত্রকে রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কন চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল ও অন্যান্য প্রাচীন কাব্য পাঠ করাইয়াছিলেন।" আমরা কল্পনা করতে পারি যে, সাগরদাঁড়ির দত্তবাড়ির বিশাল অট্টালিকার অন্তঃপুরে সন্ধ্যায় ঘৃতপ্রদীপের শেজ জ্বেলে জাহ্নবীদেবী সুললিত কণ্ঠে রামায়ণ পাঠ করছেন:

মেঘনাদ পড়ে রণে প্রভাত সময়।
ভয়ে রাবণের আগে কেহ নাহি কয়॥
দূতমুখে শুনি মেঘনাদের মরণ।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন॥
অনেক কষ্টেতে রাজা পাইল চেতন।
চেতন পাইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন॥
হা হা পুত্র ইন্দ্রজিৎ গেলি কোথাকারে।
সম্মুখ সংগ্রামে আমি পাঠাইব কারে॥
পুত্রশোকে কান্দি রাজা গড়াগড়ি যায়।
দশমুণ্ড কলেবর ধূলাতে লোটায়॥

সাগরদাঁড়িতে মুন্সী রাজনারায়ণ দত্তের বসতবাড়ি

"সতত, হে নদ! তুমি পড় মোর মনে"

সম্মুখে বালক মধুসূদন শান্তভাবে বসে আছেন। কল্পনা করতে পারি যে বাড়ির দেবীমণ্ডপে দেবীপূজার সময়ে বহুমূল্য বেশভূষায় সুসজ্জিত বালক মধুসূদন বিজয়ার গান শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে গিয়েছেন। এইভাবে মায়ের মুখ থেকে মহাকাব্যের অমৃতধারা আকণ্ঠ পান করে তাঁর শৈশবের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছিল। কোথায় শান্ত সাগরদাঁড়ি তার পল্লীজীবনের ভালোমন্দ সব কিছু নিয়ে কপোতাক্ষের তীরে দাঁড়িয়ে, আর কোথায় কলকাতায় তখন নবজাগরণের জয়শঙ্খ বেজে উঠেছে। কলকাতা থেকে সাগরদাঁড়ি বেশি দূরে নয়, কিন্তু কপোতাক্ষ-তটের দূর-প্রসারিত প্রান্তর তার সকল অপরূপত্ব নিয়ে বালক মধুসূদনের কল্পলোককে ঘিরে থাকতো—সেখানে, কপোতাক্ষের দুগ্ধধবল স্রোতে তখনো পর্যন্ত নবজাগরণের ছায়াপাত হয় নি। মধুর জ্যোৎস্নালোক, মধুময় পল্লী-প্রকৃতি, নিদাঘ সন্ধ্যায় তার সুস্নিগ্ধ সমীরণ—বালক মধুসূদনকে বিস্মিত করতো, আনন্দ দিতো। নবজাগরণের গর্জন-মুখর স্রোত অন্নদামঙ্গল বা রামায়ণের সুললিত কবিতার মধ্যে তলিয়ে যেতো। এইভাবে আবাল্য-কৈশোর জননী জাহ্নবীর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হওয়া মধুসূদনের কবিসত্তার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। একটা প্রচণ্ড মাতৃস্নেহ তাঁকে এই সময়ে সর্বদা ঘিরে থাকতো। মাতৃ-স্নেহাকুল মধুসূদনের এই বাল্যজীবন রূপকথার মতোই অবিশ্বাস্য পরিমাণ যত্ন-বিলাসিতার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। খ্রীষ্টান হয়েও, ইংরেজি-তন্ত্রে দীক্ষিত হয়েও মধুসূদন এই মাতৃস্নেহ জীবনে বিস্মৃত হতে পারেন নি, যেমন তিনি বিস্মৃত হতে পারেন নি তাঁর প্রিয় জন্মভূমিকে—দুগ্ধধবলস্রোত কপোতাক্ষকে। দূর ফরাসী দেশ থেকেও তিনি কপোতাক্ষের জল কল্লোল শুনে লিখেছিলেন :

সতত, হে নদ! তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;

এই পল্লী-প্রকৃতি, এই অনাবিল মাতৃস্নেহই ছিল মাইকেলের কবিপ্রেরণার মূল উৎস।

সেই মধুসূদন, সরল মধুসূদন কলকাতায় এলেন।

হিন্দু কলেজের উত্তপ্ত আবহাওয়া সাগরদাঁড়ির রামায়ণ-মহাভারত-শোনা মধুসূদনকে এমন একটা জগতের মধ্যে নিক্ষেপ করল যেখানে সবই বিদেশী চিন্তা, বিদেশী ভাব, বিদেশী পাঠ্যপুস্তক। পাশ্চাত্ত্য রীতিনীতির প্রবল স্রোত গ্রাম্য বালককে ভাসিয়ে নিয়ে গেল—তাঁর জীবনের তটভূমি সেই নূতন ভাব-বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেল। হিন্দু কলেজে এসে মধুসূদনের প্রতিভা সকল দিক দিয়েই আত্মপ্রকাশ করল প্রচণ্ডভাবে—দেখা গেল পাঠে যেমন তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ, তেমনি অনুরাগ অপরিমিত মদ্যপানে ও সিগারেটে এবং ব্যয়বহুল পরিচ্ছদে। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে মধুসূদনই প্রথম সিগারেট ধরেন। চৌদ্দ বছর বয়সেই মধুসূদনের হাতে উঠলো মদের গ্লাস আর মুখে সিগারেট। কাব্যানুরাগের সঙ্গে পানাসক্তি। এই পানাসক্তি দিন-দিন বৃদ্ধি পেয়ে তাঁর জীবন, প্রতিভা ও স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মদ খাওয়া সম্বন্ধে মধুসূদনের সহপাঠী রাজনারায়ণ তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন :—

> "হিন্দু কলেজের কোনও কোনও ছাত্র মদ্যপান করিত। একটি উৎকট পীড়া জন্মাইতে আমি ১৮৪৪ সালের প্রথমে কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। উক্ত উৎকট পীড়ার কারণ অপরিমিত মদ্যপান। তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্য-পান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। তখনকার কলেজের ছোকরারা মদ্যপায়ী ছিলেন বটে, কিন্তু বেশ্যাসক্ত ছিলেন না।··· আমি, মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, প্রসন্নকুমার সেন এবং নন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সহিত কলেজের গোলদীঘিতে মদ খাইতাম এবং এখন যেখানে সেনেট হাউস আছে, সেখানে কতকগুলি সিককাবাবের দোকান ছিল, তথা হইতে গোলদীঘির রেল টপকাইয়া উক্ত কাবাব কিনিয়া আনিয়া আমরা আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক কার্য বলিয়া মনে করিতাম।"

মধুসূদন যখন এখানে এসে ভর্তি হলেন তখন কৃষ্ণমোহন, রসিককৃষ্ণ,

রামগোপাল, দক্ষিণারঞ্জন, তাঁরাচাঁদ, শিবচন্দ্র, রামতনু প্রভৃতি প্রাক্তন ছাত্ররা সর্বান্তঃকরণে মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন—ইনি সেই লর্ড মেকলে যাঁর সুপারিশের ফলে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল এবং যিনি একদা বলেছিলেন : "A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia—দম্ভের কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু সেদিন মেকলের এই উক্তিটি পরোক্ষভাবে তরুণদের মনে ইংরেজি-চর্চার প্রবল উৎসাহ জুগিয়েছিল। প্রাচ্য-শিক্ষার পক্ষে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের গায়ে মেকলের এই উক্তি যেন "তপ্ত জলের ছড়ার মতো" গিয়ে পড়ল। তাঁরা ক্ষেপে আগুন, কিন্তু সেই সময় থেকেই শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ফার্সী ও বাংলার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং মেকলের যুগ আরম্ভ হয়। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন :

> "হিন্দু কলেজের নবোত্তীর্ণ ছাত্ররা মেকলের ধুয়া ধরিলেন। বলিতে লাগিলেন যে, এক শেলফ ইংরেজি গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই। তদবধি ইহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, শেক্সপিয়ার সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, মহাভারত, রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া Miss Edgeworth সেই স্থানে আসিলেন; বাইবেলের সমক্ষে বেদবেদান্ত গীতা প্রভৃতি আর দাঁড়াইতে পারিল না।"

সেইদিন থেকে ইংরেজির হাওয়া প্রচণ্ড বেগে বইতে শুরু করলো।

বাংলা ভাষা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চৌহদ্দির মধ্যে রইলো, আর সংস্কৃত সরকারী ব্যয়বরাদ্দের আনুকূল্যে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখলো। এই আবহাওয়ার মধ্যেই এসে পড়েছিলেন মধুসূদন। তখন আকাশে বাতাসে ইংরেজি। এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন :

> "ইংরাজি ভাষায় গদ্য-পদ্য রচনা করিয়া ইংরাজ লেখকদের ন্যায় প্রতিপত্তি লাভ করিব, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই এই বাসনা জন্মিয়াছিল। আমাদিগের মাতৃভাষাকে ইংরাজি ভাষার সমকক্ষ

করিতে হইবে, এ চিন্তা তখন তাঁহাদিগের মনে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। সমাজ সম্বন্ধে তাঁহারা যেমন মনে করিতেন, যে ভারতসমাজ য়ুরোপীয় সমাজে পরিণত হইবে। ভাষা সম্বন্ধেও তেমনিই তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, ইংরাজি ভাষাই একদিন সমস্ত ভারতবাসীর, অন্ততঃ সমগ্র বাঙালি জাতির, ভাষা হইবে।"

কলকাতা শহরের এই আবহাওয়া সাগরদাঁড়ির মধুসূদনকে বিভ্রান্ত করলো —সরল গ্রাম্য বালক হিন্দু কলেজে এসেই ইংরেজি আদব কায়দা, রীতিনীতির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। মনেপ্রাণে চিন্তায় বাঙালির ছেলে ইংরেজ হয়ে উঠতে চাইলেন। ডিরোজিওর স্মৃতি কলেজে তখনো জাগ্রত এবং কলেজের অনেক ছাত্র তখনো ডিরোজিওর ছাত্রদের ব্যবহারের অনুকরণ করতেন। কাজেই ডিরোজিওর ছাত্র না হয়েও মধুসূদন তাঁর প্রভাব অতিক্রম করতে পারলেন না। মধুসূদনের জীবনচরিতকার লিখেছেন :

"স্বদেশীয় সাহিত্যে অনাস্থা, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে অন্ধ অনুরাগ, স্বদেশীয় আচারব্যবহারে পক্ষপাতিত্ব, এইগুলি তখনকার ছাত্রমণ্ডলীর লক্ষণ ছিল। মধুসূদনের চরিত্রে ইহার কোনটিরই অসদ্ভাব ঘটে নাই। তাঁহার সমকালবর্তী ছাত্রগণের ন্যায় তিনিও বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন, এবং ইংরেজি ভাষায় কবিতা রচনা দ্বারা প্রতিপত্তি লাভের আশা করিতেন। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পূর্বেই তিনি স্বদেশীয় আচারব্যবহারে ঘৃণা প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেই সময়েই সুরাপানে ও নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।"

কিন্তু মধুসূদনের জীবনচরিতকার যদি ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি ঠিকমতো বুঝতে পারতেন, যদি বাংলার নবজাগরণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সচেতন হতেন, তা' হলে মধুসূদনের বা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এই ইংরেজিয়ানা সম্বন্ধে এমন মন্তব্য করতেন না। আগেই বলা হয়েছে, নবযুগের চিন্তাবিপ্লবই তখন ইতিহাসের অভিপ্রেত ছিল এবং এই বিপ্লবকে যাঁরা অভিনন্দিত করেছিলেন, তাঁদের ইংরেজি-প্রীতি অথবা ব্র্যাণ্ডি-প্রীতি গৌণ ব্যাপার, আসলে তাঁদের উপলক্ষ করে রেনেসাঁ নিঃশব্দে তার কাজ করে চলছিল। এমন কি, এ কথাও

বলা চলে যে, সেদিন হিন্দু কলেজের যে দু'একজন ছাত্র খ্রীষ্টান হয়েছিলেন, সেটাও ছিল এই চিন্তাবিপ্লবেরই প্রকাশ এবং খ্রীষ্টান কৃষ্ণমোহন বা খ্রীষ্টান মধুসূদন নবজাগরণকে সেদিন তাঁদের প্রতিভার দ্বারা কিভাবে সার্থক করেছিলেন, সে-ইতিহাস তো প্রত্যক্ষ। কাজেই ইংরেজি শিখে বা খ্রীষ্টান হয়ে এঁরা যে জাতীয়তা বিসর্জন দিয়েছিলেন—এমন সিদ্ধান্ত অনৈতিহাসিক এবং সম্পূর্ণভাবেই ভ্রান্ত। মদই খান, আর ইংরেজের অনুকরণই করুন, তবু এ-কথা সত্য যে সাগরদাঁড়ির মধুসূদন একজন প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন এবং হিন্দুকলেজের দ্বিতীয় পর্বের ছাত্রদের মধ্যে তিনি সত্যই জুপিটার ছিলেন। গ্রামের পাঠশালায় পড়বার সময়ে তাঁর চরিত্রে যেসব গুণ দেখা দিয়েছিল, হিন্দু কলেজে এসে তা হ্রাস পায় নি—লেখাপড়ায় সেই অনুরাগ, বড়ো হবার সেই উচ্চাভিলাষ হিন্দু কলেজের ছাত্র মধুসূদনের সমগ্র সত্তাকে শুধু আচ্ছন্ন করে রাখে নি, বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। লেখাপড়ায় কেউ তাঁকে অতিক্রম করে যাবে, মধুসূদন কোনো দিন তা সহ্য করতে পারেন নি। সেদিন বহুগ্রন্থপাঠী মধুসূদনের মতো ছাত্র হিন্দুকলেজে আর দ্বিতীয় কেউ ছিল না। 'এজুরাজ' (এডুকেটেড-দিগের রাজা) রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ প্রসিদ্ধ প্রাক্তন ছাত্ররা পর্যন্ত সাগরদাঁড়ির এই গ্রাম্যবালকের ইংরেজি-জ্ঞান দেখে সেদিন বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়েছিলেন, যেমন হয়েছিলেন রিচার্ডসন।

মধুসূদনের প্রতিভা সম্বন্ধে তাঁর সহপাঠী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের একটি উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য :

> "কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া, ক্রমে ক্রমে আমাকে অন্যূন কুড়ি লক্ষ ছাত্রের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল ; কিন্তু মধুর ন্যায় প্রতিভা আর কাহাকেও কখন দেখি নাই। মধুর বুদ্ধি বিদ্যুতের ন্যায় যেন চারিদিকেই খেলিত।...ভবভূতি লিখিয়াছেন, 'প্রভবতি শুচিবিম্বোদগ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ।' মধুর বুদ্ধি বিশদ মণির ন্যায় ছিল, প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হইত।"

শুধু কি বুদ্ধি আর প্রতিভা ? মধুসূদনের কণ্ঠস্বর ছিল অতি মধুর। হিন্দু

কলেজে তাঁর মুখে গজল শুনে তাঁর সহপাঠীরা তৃপ্ত হতেন। গ্রামে ছেলেবেলায় মৌলভীর কাছে শেখা ফার্সী গজল গান বালক মধুসূদনের চিত্তে এনে দিয়েছিল এক আশ্চর্য প্রসারতা এবং এরই পরিণতি লক্ষ্য করা যায় তাঁর বন্ধুপ্রীতিতে। মধুসূদনের বন্ধু-বাৎসল্য সেদিন কলকাতার শিক্ষিত সমাজে প্রবাদবাক্যের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খিদিরপুরের বাড়িতে তিনি প্রায়ই বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। দত্ত-বাড়ির নিমন্ত্রণ মানেই রীতিমতো রাজসিক ব্যাপার। ছেলের বন্ধুদের রাজনারায়ণ ও জাহ্নবী দেবী ছেলের মতই স্নেহ-যত্ন করতেন। স্কুলের পর বন্ধুরা বাড়ি এলে, তাদের নিয়ে ছাদের ওপরে তিনি কাব্যপাঠ করতেন—বায়রণ তখন মধুর প্রিয় কবি। মধুসূদনের বন্ধুপ্রীতি প্যাসনের নামান্তর ছিল। এখানে তিনি সত্যই বায়রণের সমগোত্র ছিলেন। বন্ধুরাই ছিলেন মধুসূদনের Beloved, আর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের জন্য মধুসূদন না করতে পারতেন এমন কাজ ছিল না। ছাত্রজীবনে এঁরাই ছিলেন তাঁর জীবনসর্বস্ব। বন্ধুদের নিয়ে আনন্দ করতেন, মদ খেতেন, কিন্তু সাহিত্য-প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে মধুসূদন আলোচনা করতেন না তাদের সঙ্গে। এই ছিল তাঁর চরিত্রের আভিজাত্য। ঘোরতর ইংরেজি-শিক্ষা তাঁর এই আভিজাত্যকে এতটুকু ক্ষুণ্ন করতে পারেনি। বন্ধু ছাড়া কারো সঙ্গেই তিনি মিশতেন না। মধুসূদনের অসাধারণ বন্ধুপ্রীতির স্বাক্ষর আছে গৌরদাস প্রমুখ সহপাঠীদের কাছে লেখা বহু পত্রে। মায়ের স্নেহ যেমন, তেমনি এই বন্ধুবাৎসল্যও মধুসূদনের কাব্যপ্রতিভার আর একটি উৎস। শুধু কি বন্ধুপ্রীতি? ধনীর সন্তান মধুসূদন, বিলাসী মধুসূদন, মদ্যপ মধুসূদন, রাজপথে ভিখিরি দেখলে স্থির থাকতে পারতেন না, পকেটে যা থাকতো সব দিয়ে দিতেন। বিপন্নের সেবায় তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত।

গৌর বসাক মিথ্যা লেখেন নি—Modhu was a genius!—বাংলার নবজাগরণকে সার্থক করতে সেদিন এইরকম একটি প্রতিভারই প্রয়োজন ছিল।

॥ সাত ॥

মদের নেশার চেয়েও তীব্র কবিতার নেশা মধুসূদনকে পেয়ে বসেছিল।

জীবনে একটিমাত্র স্বপ্নোৎকণ্ঠা—তিনি কবি হবেন—মহাকবি হবেন।

বাংলা ভাষার নয়, ইংরেজি ভাষার।

ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখে তিনি যশ ও প্রতিপত্তি অর্জন করবেন—শেক্সপিয়ার, মিলটনের সমকক্ষ হবেন। তাই বোধ হয় হিন্দু কলেজের ছাত্র মধুসূদন সহপাঠীদের বলতেন—বাংলা ভাষা ভুলে যাওয়াই ভালো। যাঁর ক'ব-খ্যাতি বাংলা ভাষার সঙ্গে গ্রথিত, এ তাঁরই উক্তি! আঠারো বছর বয়সের সময়ে মধুসূদন ইংরেজিতে যেসব কবিতা লিখেছিলেন, ইংরেজিতে বন্ধুদের কাছে যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন তার ভেতর দিয়েই প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর কবিত্ব-শক্তি। কবিত্ব-শক্তি মানুষের অতি দুর্লভ গুণ। বিধাতা তাঁকে এই দুর্লভ শক্তি মুক্তহস্তে দান করেছিলেন। কাজেই ভাষার প্রশ্ন এখানে গৌণ, মুখ্য বিষয় কবিত্ব-শক্তি, কবি-মন, কবি-প্রকৃতি। মধুসূদনের জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি যখন যে ভাষা শিক্ষা করতেন, অতি অল্প আয়াসেই তাতে সুন্দর কবিতা রচনা করতে পারতেন। যে বাংলা ভাষা তাঁর কাছে অবজ্ঞার বিষয় ছিল, পরবর্তী জীবনে মধুসূদন সুদে-আসলে তার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। যিনি একদিন বলেছিলেন, বাংলা ভাষা ভুলে যাওয়াই ভালো, তিনিই সেই ভুল সংশোধন করে লিখলেন—হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।

ইংরেজি ভাষার কবি হতে হলে ইংলণ্ডে যেতে হয়—শেক্সপিয়ার-মিলটনের জন্মভূমিতে যেতে হয়, এই ধারণাও মধুসূদনকে এই সময়ে প্রবলভাবে পেয়ে বসলো। জীবনের সাধ কবি হওয়া, ইংরেজি কবি হওয়া এবং ইংলণ্ডে না যেতে পারলে এই সাধ পূর্ণ হবে না—এই চিন্তায় অস্থির হলেন মধুসূদন। তখন তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। তাঁর আত্মার অশান্ত ক্রন্দনে তখন দিবারাত্র একটি মাত্র কথাই ধ্বনিত হচ্ছে:

I sigh for Albion's distant shore.

কোথায় ইংলণ্ড আর কোথায় কলকাতা! ইংলণ্ড স্বাধীনতার বিলাস-ভূমি, সেখানে প্রতিভার আদর আছে—সেই দেশ দেখবার জন্য মধুসূদন

ব্যাকুল হলেন। এটাও ইংরেজি শিক্ষার ফল। হিন্দু কলেজে পড়বার সময়েই মধুসূদনের ইংরেজি কবিতা কলকাতার বহু সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হতো। উদ্দাম প্রতিভা তাতে পরিতৃপ্ত হলো না। মধুসূদন চিরকালই উচ্চাভিলাষী। এই উচ্চাভিলাষই তাঁকে সমাজ ও পরিবার থেকে কেন্দ্রচ্যুত করে দিয়েছিল। ইংলণ্ডের কাগজে কবিতা ছাপতে হবে। মধুসূদন লণ্ডনের বেণ্টলিস্ মিসলেনি পত্রিকায় কবিতা পাঠিয়ে ছাপাবার জন্যে সম্পাদককে অনুরোধ করে চিঠি লিখছেন: "I am a Hindu—a native of Bengal and study English at the Hindu College of Calcutta. I am now in my eighteenth year,—'a child'—to use the language of a poet of your land, Cowley, 'in learning but not in age' "—এই চিঠির তারিখ অক্টোবর, ১৮৪২।

এই বছরের আর একদিনের একটি ঘটনা।

হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তখন রেভারেণ্ড ব্যানার্জি।

কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে অবস্থিত খ্রাইষ্ট চার্চ-এর তিনি তখন প্রধান ধর্ম-যাজক।

একদিন অপরাহ্নে রেভারেণ্ড ব্যানার্জি যখন তাঁর সুন্দরী কন্যা দেবকীকে বাইবেলের একটা অংশ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, সেই সময়ে মধুসূদন তাঁর কাছে এলেন। মুন্সী রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে, হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান ছাত্র মধুসূদনের নাম তিনি শুনেছেন। কিন্তু সেই মধুসূদন যে তাঁর কাছে আসবেন, রেভারেণ্ড তা জানতেন না। মধুসূদন রেভারেণ্ড ব্যানার্জির নাম শুনেছিলেন, শুনেছিলেন তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা। নিতান্ত একজন ধর্মার্থীর মতো মধুসূদন তাঁকে বললেন—আমি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে চাই।

তখনকার দিনে শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত কোনো হিন্দু ছেলের মুখে এমন কথা শুনলে পরে ইংরেজ পাদ্রিরাই অবাক হতেন, রেভারেণ্ড ব্যানার্জির তো কথাই

নেই। পরবর্তী কাহিনী রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি নিজে এইভাবে বর্ণনা করেছেন:

"দুই-তিনবার সাক্ষাৎকার এবং বহু কথাবার্তার পর আমার প্রত্যয় হইল যে, এই যুবকের খ্রীষ্টান হইবার ইচ্ছা আন্তরিক—এমন কি ইংলণ্ডে যাইবার অপেক্ষা এই ইচ্ছা প্রবলতর। খ্রীষ্টান হওয়া ও বিলাত যাওয়া এই দুইটি প্রশ্নকে আমি একত্র মিশাইতে চাহিলাম না এবং যখন আমি তাহার সহিত প্রথমটি সম্পর্কে আলোচনা করিলাম, আমি তাহাকে সোজাসুজি বলিয়া দিলাম যে দ্বিতীয়টির সম্পর্কে আমি তাহাকে কোনো সাহায্যই করিতে পারিব না। ইহাতে যুবকটি নিরুৎসাহ বোধ করিল এবং ইহার পর সে আমার নিকট আর বেশি আসিত না। একদিন কথাচ্ছলে আমার এক উচ্চ-পদস্থ বন্ধুর নিকট আমি যখন হিন্দুকলেজের এই ছাত্রটির বিষয় উল্লেখ করিলাম—সে খ্রীষ্টান হইতে চায় এবং ইংলণ্ড যাইতে চায়—তখন আমার সেই বন্ধুটি ব্যাপারটিতে খুব আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং এই উৎসাহী ছেলেটিকে একবার দেখিতে চাহিলেন। ইহার পর দত্ত যখন আমার নিকট আসিল তাহাকে আমি আমার বন্ধুর কথা বলিলাম। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য দত্তও আগ্রহ প্রকাশ করিল। আমি তাহাকে একখানি পরিচয়-পত্র লিখিয়া দিলাম। সেই ভদ্রলোক মধুসূদনকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত অভ্যর্থনা কয়িয়াছিলেন এবং তাহাকে খুব উৎসাহও দিয়াছিলেন, এমন কি বাংলার ডেপুটি গভর্ণর মিঃ বার্ডের সহিত তাহার পরিচয় পর্যন্ত করাইয়া দিয়াছিলেন।"

সমুদ্রপারের শ্বেতদ্বীপ সাগরদাঁড়ির মধুসূদনকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। সেখানে যেতে পারলে মনোসাধ পূর্ণ হবে—কবিখ্যাতি লাভ করবেন। কিন্তু খ্রীষ্টান হলে ইংলণ্ড যাবার সুবিধা হবে, এ ধারণা মধুসূদনের মনে কেমন করে জন্মেছিল, তার ইতিহাস তাঁর কোনো জীবনীকার লিখে যান নি।

হিন্দু কলেজ খ্রীষ্টানদের কলেজ ছিল না। ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার বা রিচার্ডসনের শিক্ষাও ধর্মের অনুকূলে ছিল না। হিউমের নাস্তিকতাবাদ আর টম পেইনের যুক্তিবাদ হিন্দু কলেজের তটপ্রান্ত দিয়ে প্রবল স্রোতে বয়ে চলেছিল। মধুর প্রিয় শিক্ষক রিচার্ডসন তো খ্রীষ্টধর্মে প্রগাঢ় অনাস্থাবান ছিলেন। ডেভিড হেয়ার—যাঁর মহানুভবতায় মধুসূদন সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট ছিলেন—পুরো নাস্তিক। ধর্মের প্রতি অনুরাগ তখনকার যুগধর্মে এমনিতেই শিক্ষিতদের মনে শিথিল হয়ে এসেছে। সবচেয়ে বড়ো কথা হিন্দু কলেজে বাইবেল পড়ান হতো না এবং সেখানকার কোনো ছাত্র—সে ধর্মে যতই কেন অনাস্থাবান হোক—যাতে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ বা প্ররোচিত না হয়, সেদিকে কলেজের কর্তৃপক্ষেরই সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তাঁদের কাছে ধর্মের স্থান নিয়ে ছিল শিক্ষা—ইংরেজি শিক্ষা এবং কোনো ছাত্র খ্রীষ্টান হলে বিদ্যায়তনের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনের পথে সমূহ বাধার সৃষ্টি হবে। এই ভয়ে হেয়ার সাহেব ছাত্রদের ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন এবং ছাত্রেরা যাতে পাদ্রিদের সংস্রবে না আসতে পারে সে বিষয়ে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বেশি সতর্ক। সম্ভবতঃ এই কারণেই কলকাতার গোঁড়া পাদ্রিসমাজে হেয়ার সাহেব ছিলেন অপাঙক্তেয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর খ্রীষ্টানদের গোরস্থানে তাঁর অস্থি সমাহিত হয় নি। সংশয়বাদী রিচার্ডসন ক্লাসে পড়াবার সময়ে প্রকারন্তরে ছাত্রদের মনে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনাস্থা জন্মাবার চেষ্টাই করতেন। সুতরাং এই দুইজনের একজনের কাছ থেকেও মধুসূদন খ্রীষ্টান হবার প্ররোচনা লাভ করেন নি। "এরূপ অবস্থায় হিন্দু কলেজের শিক্ষা যে মধুসূদনের ধর্মমত পরিবর্তনের পক্ষে অনুকূল ছিল না, তাহা একরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।"

মধুসূদনের জীবনেতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ঠিক এই সময়ে রাজনারায়ণ ও জাহ্নবী দেবী তাঁদের একমাত্র পুত্রের বিয়ে দেবার জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন। মেয়ে-দেখা পর্যন্ত পাকা হয়ে গেছে। এক সম্ভ্রান্ত জমিদারের সুন্দরী মেয়ে। বিয়েতে মধুসূদনের ঘোরতর অনিচ্ছা। এ-কথা জাহ্নবী দেবী যখন জানতে পারলেন তখন তিনি ভাবী পুত্রবধূর রূপ ও গুণের কথা তুলে পুত্রকে রাজী করাবার চেষ্টা করলেন। কথিত আছে, "মধুসূদন সকল কথা নীরবে শুনিয়া

অবশেষে বলিলেন, 'মা তুমি যতই বলো, বাঙালির মেয়ে রূপে-গুণে কখনই ইংরেজের মেয়ের শতাংশের একাংশ হতে পারে না।' পুত্রের কথা শুনিয়া মাতা চমকিয়া উঠিলেন, যাহাতে পুত্রের বিবাহ হইয়া যায় সেই চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।"

বাড়িতে বিয়ের খবর শুনে বন্ধু গৌরদাসকে মধুসূদন তাঁর মনের অবস্থা বর্ণনা করে চিঠি লিখছেন:

> "গৌর! আজ হইতে তিন মাস পরে আমার বিবাহ—কি সর্বনাশ! আমার ভাবী পত্নী এক জমিদার-কন্যা—বেচারা! তাহার অদৃষ্টে কত না দুঃখ আছে! তুমি তো জানো, বিদেশে যাইবার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে কত প্রবল! সূর্য উদিত নাও হইতে পারে, কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা আমি মন হইতে দূর করিতে পারি না। নিশ্চিত জানিও, আর দু'এক বৎসরের মধ্যে আমি হয় ইংলণ্ড যাইব, নতুবা জীবিত থাকিব না—এ দুইয়ের একটা নিশ্চয় ঘটিবে।"

এই চিঠির তারিখ ১৮৪২-এর নভেম্বর।

মধুসূদন তাঁর প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন—তিনি বাঙালি মেয়ে বিয়ে করেন নি এবং তিনি ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। ইংলণ্ডে যাওয়া অবশ্য দু-এক বৎসরের মধ্যে হয় নি—হয়েছিল তাঁর জীবন-সায়াহ্নে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ধর্মান্তর গ্রহণের পেছনে সর্বতোভাবে সক্রিয় ছিল তাঁর আবাল্যের অভিলাষ—কবি হবার স্বপ্ন। জম্বুদ্বীপে থেকে এ-স্বপ্নকে চরিতার্থ করা যাবে না—এর জন্য দরকার শ্বেতদ্বীপের পরিবেশ—কবিতার ট্র্যাডিসনে যে পরিবেশ মনোরম। কিন্তু মধুসূদন জানতেন, পিতামাতার তিনি একমাত্র সন্তান, বিয়েতে তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই। পিতামাতার ইচ্ছাই সেখানে সব। কিছুদিন পরে তিনি দেখতেও পেলেন যে মহাসমারোহে তাঁর বিয়ে দেবার জন্য রাজনারায়ণ দত্ত উদ্যোগ-আয়োজন করতে আরম্ভ করেছেন। এই অবস্থার পরিত্রাণের একটি মাত্র পথই ছিল—খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করা। "খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার য়ুরোপ গমনের সুবিধা হইবে, এবং তিনিও উপস্থিত বিবাহের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিবেন।'

রেভারেণ্ড ব্যানার্জিকে তিনি তাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—খ্রীষ্টান হলে তাঁর ইংলণ্ডে যাবার সুবিধা হবে কি না।

খ্রীষ্টান হবার আগে, মধুসূদনের ছাত্রজীবনের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ-যোগ্য। ঘটনাটি ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু। ১লা জুন, ১৮৪২। ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু হলো। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন :

> "হেয়ার চলিয়া গিয়াছেন এই সংবাদ কলিকাতা শহরে রাষ্ট্র হইলে ঘরে ঘরে হায় হায় ধ্বনি উপস্থিত হইল। তিনি যে সকল দরিদ্র পরিবারের পিতামাতা ছিলেন, সেই সকল পরিবারে হিন্দু রমণীগণ আর্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তিনি যে সকল দরিদ্র বালককে পালন করিতেন তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে গ্রে সাহেবের ভবনের (ইনি হেয়ার সাহেবের ঘড়ির কারবার কিনে নেন ও এঁরই বাড়িতে হেয়ার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন) অভিমুখে ছুটিল। গ্রে সাহেবের ভবনে ছোটবড় বাঙালি ভদ্রলোকে লোকারণ্য! হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয় রাধাকান্ত দেব হইতে স্কুলের ছোট ছোট বালক পর্যন্ত কেহ আর আসিতে বাকি থাকিল না। তাঁহার শব যখন গ্রে সাহেবের ভবন ত্যাগ করিল, তখন গাড়িতে ও পদব্রজে হাজার হাজার লোক সেই শবের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কলিকাতা সেদিন যে দৃশ্য দেখিয়াছিল তাহা আর দেখিবে না।"

ইয়ং বেঙ্গল যেন মহাগুরু নিপাতের শোক অনুভব করলো। কিন্তু তাঁরা শোক প্রকাশ করে তাঁদের কর্তব্য শেষ করেন নি। রামগোপাল, প্যারীচাঁদ, তারাচাঁদ প্রমুখ হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররা অগ্রণী হয়ে হেয়ারের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের উদ্যোগ করলেন। অল্পকালের মধ্যেই প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হলো। সেই টাকা দিয়ে তৈরি হলো হেয়ারের মর্মর মূর্তি। প্যারীচাঁদ লিখলেন হেয়ারের জীবন-চরিত। ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিরক্ষা তহবিলে হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ও নবীন ছাত্রদের চাঁদার পরিমাণই ছিল বেশি। মধুসূদন দিয়েছিলেন পাঁচশো টাকা। দেখা যাচ্ছে বাংলায় রেনেসাঁ এরই মধ্যে সার্থক হয়ে

উঠেছে। ইয়ং বেঙ্গল নানা কর্ম-প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করছে। তারা সভা-সমিতি করছে, সার্কুলেটিং লাইব্রেরি চালাচ্ছে, কাগজ বের করছে, সামাজিক কার্যে পর্যন্ত অগ্রণী হচ্ছে। হেয়ারের প্রতি ইয়ং বেঙ্গলের অনুরাগের একটি প্রধান কারণ ছিল যে ডিরোজিওর মৃত্যুর পরে এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েসন তাঁরই স্কুলে কিছুদিনের জন্য স্থান পেয়েছিল। জ্ঞানের চর্চায় তাদের যেমন প্রবল উৎসাহ ছিল, বিবিধ কর্মের উদ্যমেও ইয়ং বেঙ্গল সেদিন তাদের প্রতিভার পরিচয় দিতে শুরু করেছে। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র প্যারীচাঁদ মিত্র কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির প্রথম লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হয়েছেন। হিন্দু কলেজের শিশু-শিক্ষা শ্রেণী যখন স্বতন্ত্র করে বংলা পাঠশালায় রূপান্তরিত হয়, তখন সেখানে শিক্ষকতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন রামগোপাল ঘোষ। মধুসূদন হিন্দু কলেজে আসবার দু'বছর আগে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করে আইন পাশ হয়েছিল। এই আইনের জন্য কলকাতায় যে সভা হয়েছিল তাতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক। এই আইনের সুযোগ নিয়ে ডিরোজিওর শিষ্যদল—হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র—নানা বিভাগে নানা কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। টাউন হলে রামমোহন রায়ের প্রথম শোক-সভায় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক। দেখা যাচ্ছে, তখন থেকেই প্রাচীনপন্থীদের বহু নিন্দিত ইয়ং বেঙ্গল শহরের বড়ো বড়ো কাজে হাত দিতে আরম্ভ করেছেন। মধুসূদন তাঁর হিন্দু কলেজের ছাত্রজীবনেই এসব ঘটনা কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করে থাকবেন এবং চারদিকে নবজাগরণের এই যে প্রবল উৎসাহ আর উদ্দীপনা—এই যে নবচেতনার বর্ণচ্ছটা—এর দ্বারা তাঁর মনের দিগন্ত নিশ্চয়ই রাঙিয়ে উঠেছিল। তাঁর কবিধর্ম ও কবিকর্মের মূলে রেনেসাঁ নিশ্চয়ই কাজ করেছিল এবং শ্বেতদ্বীপের প্রতি তাঁর অদম্য আকর্ষণের মূলেও ছিল জীবন-ধর্মী এই নবজাগরণের প্রভাব।

অবশেষে মধুসূদন খ্রীষ্টান হলেন।

সাগরদাঁড়ির রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র পুত্র মধুসূদন দত্ত হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় যুগের ছাত্রদের মধ্যে তিনজন খ্রীষ্টধর্ম

গ্রহণ করেছিলেন—মধুসূদন, জ্ঞানেন্দ্রমোহন মোহন ঠাকুর আর গোবিন্দ দত্ত। গোবিন্দ দত্ত ছোট আদালতের জজ বিখ্যাত রসময় দত্তের পুত্র। (এই রসময় দত্তই বিদ্যাসাগরের সময়ে সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ছিলেন। বিখ্যাত মহিলা-কবি তরু দত্ত গোবিন্দ দত্তেরই মেয়ে।) মধুসূদনের সহপাঠীদের মধ্যে গোবিন্দ দত্তও ইংরেজিতে সুন্দর কবিতা লিখতে পারতেন। মধুসূদনের সঙ্গে এঁর বিশেষ সখ্যতা ছিল এবং কত সময়ে কলেজে মধুসূদন গোবিন্দ দত্তের হাত ধরে বলতেন, "We twin Duttas are bright stars of the Hindu College—আমরা দত্ত-যুগল হিন্দু কলেজের উজ্জ্বল নক্ষত্র।"

মধুসূদনের খ্রীষ্টান হওয়ার ব্যাপার নিয়ে তখনকার কলকাতায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। সম্ভ্রান্ত বাঙালির ছেলের খ্রীষ্টান হওয়া এ দেশে নূতন নয়, কিন্তু মধুসূদনের খ্রীষ্টান হওয়াটা নানা কারণেই বিস্ময়কর ছিল। তিনি তো ধর্মের জন্যে ধর্মান্তর গ্রহণ করেন নি, ইংলণ্ড যাবার সুবিধা হবে বলেই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিন। কোনো পাদ্রি তাঁকে প্রলোভন দেখিয়ে খ্রীষ্টান করেন নি—কেন না রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে এমনিতেই বিত্তবান, প্রলুব্ধ হবার কোনো হেতুই ছিল না তাঁর। রেভারেণ্ড ব্যানার্জির জবানবন্দী এ-বিষয়ে খুব পরিষ্কার। মধুসূদনের সহাধ্যায়ী গিরিশচন্দ্র ঘোষের মাতুলকে (ইনি রাজনারায়ণ দত্তের বন্ধু ছিলেন) তিনি বলেছিলেন :

> "আপনারা অনর্থক মধুর জন্য চেষ্টা করিতেছেন। খ্রীষ্টান হওয়ার নিমিত্ত তাহার দৃঢ়সংকল্প হইয়াছে। সে বোকা নয়, দুগ্ধ-পোষ্য বালক নয়, যে পাদ্রিরা তাহাকে ভুলাইয়া খ্রীষ্টান করিবে। ধর্মের দোষগুণ নির্বাচন করিতে তাহার উপযুক্ত বুদ্ধি ও বয়স হইয়াছে এবং হিন্দুধর্মের অসারতা জানিয়া মধু খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই দেখুন তাহার কেমন বুদ্ধি। আপনাদের তাহার প্রতি বল-প্রয়োগ করার আশঙ্কায় সে লর্ড বিশপের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহার অনুরোধ মতে কেল্লায় যাইয়া আশ্রয় লইয়াছে এবং কেল্লার কর্তা ব্রিগেডিয়ার পাউনি সাহেব সাদরে মধুকে আপন কুঠিতে স্থান দিয়াছেন যে, আপনারা তাহার অঙ্গস্পর্শ করিতে না পারেন।"

রেভারেণ্ডের এই উক্তির মধ্যে 'হিন্দুধর্মের অসারতা' কথাটি অসার। ধর্মের প্রেরণা মধুসূদনের খ্রীষ্টান হওয়ার মূলে আদৌ ছিল কি না সন্দেহ, সে কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। মধুসূদন নিখোঁজ হবার কদিন বাদে তিনি যথারীতি খ্রীষ্টান হন। খিদিরপুরের জয়নারায়ণ ঘোষাল ছিলেন রাজনারায়ণ দত্তের বিশেষ বন্ধু। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকে মধুসূদনকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন।

১৮৪৩, ৯ই ফেব্রুয়ারী।

মিশন রো'র ওল্ড মিশন চার্চে মধুসূদন যথারীতি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন।

এই ওল্ডমিশন চার্চ চার্চ অব ইংলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রধান ধর্মযাজক আর্চডেকন ডিলট্রি মধুসূদনকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন এবং তিনিই তাঁর নূতন নামকরণ করেন 'মাইকেল'। এই অনুষ্ঠানে রেভারেণ্ড ব্যানার্জি উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে, মধুসূদনের ধর্মান্তর গ্রহণ ব্যাপারটি বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে এতখানি গুরুত্ব পেয়েছে কেন? তার আগে এবং পরেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত বাঙালি সন্তান তো খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের অনেকেই খ্রীষ্টান হয়ে নবজাগ্রত বাংলার সমাজ, সাহিত্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে, এমন কি রাজনীতির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে একা রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জির দান কি কম? এর উত্তর এই যে, মধুসূদন বিত্তশালী এবং প্রতিপত্তিশালী পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন, এবং তিনি হিন্দু কলেজের একজন প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। তৃতীয় প্রধান কারণ, এই খ্রীষ্টান মাইকেল বাংলা ভাষায় নূতন ছন্দে প্রথম মহাকাব্য, এবং চলিত গদ্যভাষায় প্রথম বাংলা নাটক রচনা করেছিলেন।

মধুসূদন 'মাইকেল' হলেন।

তারপর? তার এক জীবনচরিতকার লিখেছেন:

> "মাইকেল মধুসূদন অতঃপর সমাজচ্যুত হইয়া পর-সমাজে বাস করিতে বাধ্য হইলেন। জননী জাহ্নবী তাঁহার হৃদয়ের নিধিকে

প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া আবার বক্ষে তুলিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু মধুসূদন প্রায়শ্চিত্ত করিতে সম্মত হন নাই।"

একদিকে পিতার অগাধ ঐশ্বর্য, অন্যদিকে মায়ের স্নেহ, মাইকেল এসব উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন কিসের আকর্ষণে ? এর একমাত্র উত্তর—সত্যের তাড়না। কী সেই সত্য ? মাইকেলের পক্ষে এই সত্যের তাড়না তাঁর কবি-প্রতিভার নামান্তর ছিল। তাই না মাইকেল রাজনারায়ণ দত্তকে স্পষ্ট বলতে পেরেছিলেন : "যদি সূর্য পশ্চিম দিকে উদয় হয়, তাহা হইলেও আমি খ্রীষ্টধর্ম পরিত্যাগ করিব না।" কাজেই প্ররোচনা নয়, প্রলোভন নয়—সত্যের প্রেরণাই মধুসূদনকে মাইকেলে রূপান্তরিত করেছিল। বন্ধু গৌরকে খ্রীষ্টান হবার অব্যবহিত পরে মাইকেল লিখছেন : "Do you think Mr. Dealtry persuaded me to embrace Christianity ? You are misersbly, pitifully mistaken ?" গৌর বসাকের মতো মাইকেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণের মনেও তাঁর খ্রীষ্টান হওয়া সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা জন্মেছিল।

মধুসূদন খ্রীষ্টান হলেন।

কিন্তু মাইকেলের হাতে বাইবেল উঠল না। সাহিত্যবিদ্ স্মিথ সাহেবের বাড়িতে তিনি প্রথমে কিছুদিন মন দিয়ে শেক্সপিয়ার পড়লেন। মাইকেলের জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে বিশপস্ কলেজ। হিন্দু কলেজের মতো বিশপস্ কলেজের শিক্ষাও মাইকেলের জীবনগঠনে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। হিন্দুকলেজ ছিল তাঁর কবিতা শিক্ষার ক্ষেত্র, বিশপস্ কলেজ ভাষা শিক্ষার। গঙ্গার তীরে শিবপুরে খ্রীষ্টান ছেলেদের লেখাপড়ার জন্য এই স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল। মধুসূদন এই কলেজে ভর্তি হলেন। পুত্রের আচরণে বিরক্ত, ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ হলেও রাজনারায়ণ দত্ত বিধর্মী পুত্রের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে কুণ্ঠিত হলেন না। রেভারেণ্ড ব্যানার্জি এই কলেজেরই একজন অধ্যাপক ছিলেন। প্রথমেই গোলমাল বেধেছিল ইংরেজ ও দেশীয় ছাত্রদের পরিচ্ছদের পার্থক্য নিয়ে। স্বাধীন প্রকৃতির মাইকেল খ্রীষ্টান হয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেন নি। তাঁর জীবনী লেখক বলেন—"সাহেব ও দেশীয়দিগের মধ্যে এরূপ অসঙ্গত পার্থক্য মধুসূদন বিনা প্রতিবাদে কখনই সহ্য করিতে পারিতেন না।" অধ্যক্ষ ডাঃ হুইদার্সের মুখের ওপর তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন,

either the collegiate costume or my own national dress"—এই জাতীয়তাবোধ হিন্দু মধুস্থদন ও খ্রীষ্টান মাইকেলের মধ্যে আজীবন সমানভাবে তীব্র ছিল। মাইকেলের এই দৃপ্ত কথার মধ্যেই রেনেসাঁ যেন তার সকল বর্ণচ্ছটা নিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে।

বিশপস্ কলেজে মাইকেল যেমন অমিতব্যয়িতার চূড়ান্ত প্রদর্শন করেন, তেমনি তিনি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রীক, লাটিন ও সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেন এবং সেই সঙ্গে কলেজ-লাইব্রেরির রাশি রাশি দুর্লভ গ্রন্থ পড়ে শেষ করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বহু ভাষাবিদ্ রামমোহনের পর মাইকেলই আধুনিক বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রথম ও শেষ বহুভাষাবিদ্ কবি। ইংরেজি তো ছিল তাঁর মাতৃভাষার মতো। পরবর্তী জীবনে দেশীয় ভাষার মধ্যে হিন্দুস্থানী, তামিল, তেলেগু এবং য়ুরোপীয় ভাষার মধ্যে ফ্রেঞ্চ, জর্মন, হিব্রু ও ইতালীয় ভাষা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় তিনি কবিতা পর্যন্ত লিখতে পারতেন। মাইকেল সর্বসমেত তেরোটি ভাষা জানতেন। বাংলা দেশে পরবর্তীকালে অরবিন্দ ঘোষ ও হরিনাথ দে ভিন্ন এই গৌরব আর কারো নেই। স্বপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেনঃ "As a linguist and scholar, Michael Madhusudan Dutt has scarcely any equal among his contemporaries",—সত্যই মাইকেলের সমকালীন ব্যক্তিদের মধ্যে রঙ্গলাল ভিন্ন তাঁর মতো বহুভাষাবিদ্ আর কেউ ছিলেন না। নবজাগরণের প্রধান লক্ষণটি মাইকেলের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছিল সেদিন।

বিশপস্ কলেজে তখন কয়েকজন মাদ্রাজী খ্রীষ্টান ছেলেও পড়তো। তাদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। চার বছর পরে রাজনারায়ণ দত্ত টাকা দেওয়া বন্ধ করলেন। মাইকেল দমবার ছেলে ছিলেন না। ভাগ্য পরীক্ষা করতে তিনি দূর দেশে যাবার সংকল্প করলেন। যাবার আগে হ্যালিডে সাহেবের সঙ্গে দেখা করে চাকরির চেষ্টা করেছিলেন। তারপর একদিন দুরন্ত অভিমানী মাইকেল, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব কাউকে না জানিয়ে, মাদ্রাজী বন্ধুদের সঙ্গে বাংলাদেশ ত্যাগ করে মাদ্রাজ চলে গেলেন। কথিত আছে, নিজের পাঠ্যপুস্তক বিক্রি করে তিনি মাদ্রাজ যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন।

॥ আট ॥

মাইকেল স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হলেন।

তাঁর জীবনেতিহাসে এই ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে তখনই মাইকেলের বিলেত যাওয়ার সুবিধা হলো না। এমন কি, বিশপস্ কলেজে থেকেও বেশি দিন পড়াশুনা করা সম্ভব হলো না। পিতা অর্থ-সাহায্য বন্ধ করে দিলেন। মাদ্রাজে মাইকেলের প্রবাস-জীবন দারুণ দারিদ্র্য আর নৈরাশ্যে পূর্ণ। আশাভঙ্গের বেদনা মাইকেলের জীবনকে এই সময়ে কিছুটা অশান্তিময় করে তুলেছিল। চপল, অসংযমী, অস্থিরচিত্ত এবং অমিতব্যয়ী মাইকেলের জীবনে সবচেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, কি নিন্দা, কি উপহাস, কি দারিদ্র্য, কি পারিবারিক অশান্তি কোনো অবস্থাতেই তিনি তাঁর জীবনের ধর্ম থেকে কখনো ভ্রষ্ট হন নি। কবি হয়ে অক্ষয় কীর্তি লাভ করবেন—এই লক্ষ্য, ধ্রুবতারার মতো, চিরদিন নির্দিষ্ট ছিল। আঠারো বছর বয়সে এই যে কবি-সত্তার উন্মেষ, জীবনের স্তরে স্তরে পর্বে পর্বে তাই ইন্দ্রধনুর বর্ণ সমারোহ নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। মাইকেল তাই আগে কবি, পরে অন্য কিছু। কবিত্বের গৌরবে জগতকে বিস্মিত করবেন, কাব্যজগতে যাঁরা সকলের শীর্ষস্থানীয়, তিনি তাঁদের সমকক্ষ হবেন—এই উচ্চাভিলাষ নিয়েই মাইকেলের জন্ম এবং তাঁর এই উচ্চাভিলাষের মধ্যেই বাংলার নবজাগরণ অনেকখানি সার্থক হয়েছে—মাইকেলের জীবনেতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে এই তথ্যটি আমাদের বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার। এই উচ্চাভিলাষ ভিন্ন মাইকেলের জীবনের আর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্বই ছিল না। "I shall astound the world with my fame"—মাইকেলের এই উক্তি দম্ভের নয়, আত্মপ্রত্যয়ের। জগতকে না হলেও, তিনি বাংলাদেশকে সত্যই বিস্মিত করে গিয়েছেন চিরকালের মতো।

এক রকম নির্বাসিতের মতোই মাইকেল এলেন মাদ্রাজে।

এলেন রিক্ত হস্তে। নিঃসম্বল, নিরাশ্রয়।

নিয়তি তাঁকে নিয়ে এলে এক সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশের মধ্যে। সে দেশের ভাষা নূতন, আচার-ব্যবহার নূতন। নিরুপায় মাইকেল মাদ্রাজের দেশীয়

খ্রীষ্টান ও ফিরিঙ্গিদের কাছে হলেন আশ্রয়প্রার্থী। তাঁদেরই চেষ্টায় তিনি স্থানীয় একটি অনাথ বিদ্যালয়ে একটা মাষ্টারি পেলেন। ইংরাজি পড়ান। কিন্তু মাইনে যা পেতেন, তাতে তাঁর মতন লোকের পক্ষে ব্যয়সঙ্কুলান হওয়া কঠিন। উপার্জনের অন্য উপায় অন্বেষণ করতে হলো। সে উপায় সাহিত্য। এতদিন যা ছিল বিলাসের জিনিস, অনুশীলনের জিনিস, তাই এখন হয়ে দাঁড়াল উপজীবিকার আশ্রয়। তাঁর জীবনচরিতকার লিখেছেন ঃ

> "তিনি মাদ্রাজের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সমূহে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তখন এদেশীয়দিগের মধ্যে অতি অল্পলোকই তাঁহার ন্যায় সুন্দর ইংরেজি লিখিতে পারিতেন, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পরিব্যাপ্ত হইল এবং মাদ্রাজের কৃতবিদ্য সমাজে তিনি একজন সুলেখক ও সুপণ্ডিত বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।"

যুগপৎ শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা—এই দুই ক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ করে মাইকেল নিজেকে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে অগ্রচারিতা মাইকেল-চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাঁর জীবনের রথ ছিল কর্ণের জয়রথ। তার গতি অবাধ—সকলের পুরোভাগে। মাদ্রাজে এসেও নিঃসম্বল মাইকেলের স্বাধীনচিত্ততা যেমন হ্রাস পায় নি, তেমনি কর্মক্ষেত্রে নিজের প্রতিভার বলে তিনি নিজেকে সকলের পুরোভাগে স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। একেই বলে মূর্তিমান পৌরুষ। মাদ্রাজ সার্কুলেটর য়্যাণ্ড জেনারেল ক্রনিকেল, স্পেক্টেটর, এথেনিয়ম প্রভৃতি সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদক হয়ে মাইকেল যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। নিজেও কিছুদিনের জন্য একখানা ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদনা করেছিলেন। সেই পত্রিকাটির নাম 'হিন্দু ক্রনিকেল'। খ্রীষ্টান মাইকেলের কাগজের নাম থেকেই তাঁর স্বাজাত্যপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানেও তখন শাদা ও কালোর মধ্যে ঘোরতর বৈষম্য ছিল—কলকাতার মতো মাদ্রাজেও 'নেটিভ' ও 'য়ুরোপীয়ান', এই দুই লেবেল এঁটে দেওয়া হয়েছিল দেশীয় খ্রীষ্টান ও ইংরেজদের ললাটে। নেটিভ মাইকেল নির্ভীকভাবে এই বৈষম্যের প্রতিবাদ করলেন, কাগজে লিখলেন। ইংরেজরা আর নেটিভ কথা ব্যবহার করত না। অপরিণত কাব্যস্রোত মাদ্রাজ-জীবনেও

সমানভাবে মাইকেলের জীবনের তট প্রান্ত দিয়ে বয়ে যেত। মাদ্রাজ ক্রনিকেল কাগজেই তাঁর বেশির ভাগ কবিতা বেরুতো ছদ্মনামে। তাঁর সুবিখ্যাত ইংরেজি কাব্য 'ক্যাপটিভ লেডি'র জন্ম এইখানেই। সাহিত্যানুরাগী জর্জ নর্টনকে এই কাব্যখানি মাইকেল উৎসর্গ করেছিলেন। নর্টন ছিলেন মাদ্রাজের এ্যাডভোকেট জেনারেল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি। প্রবাসে এই নর্টনের বন্ধুত্ব মাইকেলের জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। এইভাবে অল্পদিনের মধ্যেই মাইকেল মাদ্রাজে দুর্লভ কবিযশ ও প্রভূত সুখ্যাতি লাভ করলেন। আর লাভ করেছিলেন বাস্তবজীবনের ক্যাপটিভ লেডি—রেবেকা।

এখানেও মাইকেল প্রথম।

বাঙালির মধ্যে তিনিই প্রথম খাঁটি য়ুরোপীয় রমণীর পাণিগ্রহণ করেন।

খ্রীষ্টান হয়ে তাঁর জীবনের একটি আকাঙ্ক্ষা অন্ততঃ পূর্ণ হলো। মাইকেল যে-স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, সেই স্কুলের বালিকা-বিভাগে একটি ছাত্রী পড়তো। নাম—রেবেকা ম্যাকটাভিস্। সুন্দরী কিশোরী। মাইকেলের জীবনচরিতকার লিখেছেন: "মধুসূদনের সহিত ইহার পরিচয় হয় এবং তিনি রেবেকার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হন। রেবেকার সম্মতি সত্ত্বেও তাঁহার আত্মীয়গণ এই বিবাহে আপত্তি করেন। কিন্তু মধুসূদনের আগ্রহে এবং তাঁহার নব-পরিচিত মান্যবন্ধু মাদ্রাজের এডভোকেট-জেনারেল জর্জ নর্টনের সাহায্যে রেবেকার সহিত মধুসূদনের বিবাহ হয়।"

এই নর্টন সাহেবের চেষ্টাতেই মাইকেল পরে কিছুদিনের জন্য মাদ্রাজের মহাবিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ বিদ্যালয় বিভাগে দ্বিতীয় শিক্ষকের একটি চাকরি পেয়েছিলেন। মাইকেলের মাদ্রাজ-জীবনে কলকাতার গৌর বসাকের স্থান নিয়েছিলেন এই নর্টন; ইনি প্রবাসী মাইকেলের আর্থিক উন্নতির জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিলেন। মাইকেলের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে ইনিও নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন। বন্ধুভাগ্যে মাইকেল চিরকালই ভাগ্যবান।

'ক্যাপটিভ লেডি' মেঘনাদবধ কাব্যের অঙ্কুর।

সেই তেজঃপ্রদীপ্ত ভাষা, সেই অলঙ্কারবিন্যাস-প্রিয়তা।

পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা-জয়চন্দ্রের সুপরিচিত কাহিনী এই কাব্যের বর্ণিত বিষয়। তখন মাইকেলের বয়স পঁচিশ বৎসর। নিদারুণ দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে

কবি তাঁর এই কাব্যখানি রচনা করেছিলেন। কবি নিজেই এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে, 'want and poverty' এবং 'battalions of sorrows'—এই পরিবেশেই অর্থাৎ জীবনের এই কুৎসিত বাস্তবতার মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থেকেই তিনি এই ইংরেজি কাব্যখানি রচনা করেন। কতখানি মানসিক বলের অধিকারী হলে এইরকম অসাধ্যসাধন সম্ভব, তা একমাত্র মাইকেলই প্রমাণ করেছেন। বলা বাহুল্য, এই কাব্যে মাইকেল ইতিহাসের যথাযথ অনুসরণ করেন নি (যেমন তিনি করেন নি পরবর্তী কালে মেঘনাদ-বধ রচনার সময়ে রামায়ণের যথাযথ অনুসরণ)। প্রকৃত স্রষ্টার পক্ষে তা অসম্ভব। ঘটনা-বৈচিত্র্য বা ভাবের লালিত্য বিচারে মাইকেলের এই প্রথম কাব্যপ্রয়াস হয়ত উল্লেখযোগ্য নয়—কিন্তু সেই বয়সে ইংরেজি ভাষার ওপর তাঁর আশ্চর্য দখলের দলিল এই 'ক্যাপটিভ লেডি'। বায়রণ, মূর বা স্কটের রচনার সঙ্গে ক্যাপটিভ লেডির কোনো কোনো অংশের তুলনা দেওয়া যেতে পারে। কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে পরাজিত পৃথ্বীরাজের প্রতি সংযুক্তার একটি দৃপ্ত বাক্য :—

> But tell me, must thou bow thee low,
> And yield thee to thy godless foe,
> And humbly kneel before the throne
> Which once, alas! was all thine own?

মাদ্রাজের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান কাগজে 'ক্যাপটিভ লেডি'-র সুখ্যাতি বেরুলো।

কেউ মাইকেলকে বায়রণের সঙ্গে তুলনা করলেন, কেউ বা স্কটের সঙ্গে।

কিন্তু ঋণভারগ্রস্ত মাইকেলের কাছে এইসব শূন্যগর্ভ প্রশংসার কোনো মূল্য ছিল না। গৃহে অন্নাভাব, লোকের প্রশংসা নিয়ে তিনি কি করবেন? বই ছাপতে গিয়ে অনেক টাকা প্রেসের দেনা হয়ে গিয়েছিল। পাওনাদার তো আর কবির সুখ্যাতিতে উল্লসিত হয়ে তার পাওনা থেকে তাঁকে রেহাই দেবে না। একে তো তিনি অমিতব্যয়ী মানুষ, উৎসাহের ঝোঁকে নূতন কাব্য ছাপিয়ে প্রকাশ করেছেন; প্রশংসা যত লাভ করলেন, তার তুলনায় বই বিশেষ কিছু বিক্রি হলো না। ঋণভারগ্রস্ত কবিকে সাহায্য করতে কোনো রাজা-মহারাজা এগিয়ে

এলেন না। প্রবাসে অর্থভাগ্য তেমন হলো না বটে, কিন্তু যশোভাগ্য হলো প্রচুর। সেটাই ছিল কবির সান্ত্বনা। এইবার মাইকেল তাকালেন তাঁর প্রিয় জন্মভূমি বাংলার দিকে—কলকাতার কৃতবিদ্য সমাজের দিকে।

কলকাতার বিদ্বৎ-সমাজে মাইকেলের 'ক্যাপটিভ লেডি' উপেক্ষিত হলো।

"যে সকল সংবাদপত্র-সম্পাদকের নিকট 'ক্যাপটিভ লেডি' সমালোচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাঁহারা কেহই ইহার সম্বন্ধে কোন বিশেষ আশ্বাসজনক কথা বলিয়া, কবিকে উৎসাহিত করিলেন না।" 'হরকরা' ও 'হিন্দু ইনটেলিজেন্স'-এর বিরূপ সমালোচনা মাইকেলকে অত্যন্ত মর্মাহত করলো। কলকাতায় তাঁর বন্ধুরা অনেক চেষ্টা করেও পঞ্চাশখানার বেশি 'ক্যাপটিভ লেডি' বিক্রি করতে সমর্থ হলেন না। জীবনের প্রথম উদ্যম—প্রথম কাব্যপ্রচেষ্টায় অকৃতকার্য মাইকেলের মনের বল ছিল অপরিসীম। কঠিন সমালোচনার আঘাতে বা কলকাতার কৃতবিদ্য সমাজের উপেক্ষায় তিনি বেদনাবোধ করলেও ভগ্নোদ্যম হলেন না। কিন্তু একটি অপ্রত্যাশিত কেন্দ্র থেকে দৈববাণীর মতো মাইকেল সেই সময়ে পেলেন একটি সুন্দর ইঙ্গিত—এই ইঙ্গিতই তাঁর কবিজীবনের দিক্‌-পরিবর্তনের সূচনা করে দিয়েছিল সেদিন। দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে মাইকেল এই সময়েই দুটি ইংরেজি সনেটে তাঁর মনের অবস্থা প্রকাশ করে লিখেছিলেন :

> There is a grief which few can feel !
> It cuts into the bosom's deepest core,
> And such dark grief is his, whose sleepless soul
> Strives but in vain, to burst the galling thrall
> Of cricumstance, to spurn its vile control.

অবস্থার শৃঙ্খলমুক্ত হবার জন্য এই ছিল সেদিন বাংলার বিদ্রোহী প্রমিথিউসের হৃদয়ের আর্তনাদ।

মধুসূদনের কবিজীবনের দিক্‌-পরিবর্তনের সেই অপ্রত্যাশিত ইঙ্গিতের কথা এইবার বলব। তাঁর এক জীবনচরিতকার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> "গৌরদাস বসাকের অনুরোধে মধুসূদন একখণ্ড 'ক্যাপটিভ লেডি' কাব্য তাৎকালিক গভর্ণর-জেনারেলের ব্যবস্থা-সচিব এবং শিক্ষা-

সমাজের সভাপতি জে. ই. ডি. বেথুনকে তাঁহারই দ্বারা উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন। বেথুন সাহেব তাহা পাইয়া, উত্তরে গৌরদাস বসাককে যাহা লেখেন তাহার সারাংশ এই: 'আপনার বন্ধু ইংরাজি সাহিত্যের চর্চা ও অধ্যয়নের দ্বারা যে মার্জিত রুচি ও পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, তাহা যদি নিজের মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি কল্পে নিয়োজিত করেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বদেশের মহদুপকার সাধিত হইবে এবং তিনি স্বয়ং যশোলাভে সমর্থ হইবেন।'

এই কথাই তো গৌরদাস তাঁর বন্ধুকে বারবার চিঠিতে লিখে আসছেন।

"মধু, একবার বাংলা ভাষার দিকে ফিরে তাকাও, বাংলায় লিখবার চেষ্টা করো।"

কিন্তু এ ছিল গৌরের অরণ্যে রোদন।

বাঙালি মেয়ে যেমন বিয়ের যোগ্য নয়, বাংলা ভাষাও তেমনি কাব্য রচনার উপযুক্ত নয়—এই মনোভাব মাইকেলকে তখনো পর্যন্ত তাঁর মাতৃভাষার প্রতি বিরূপ করে রেখেছিল। ইংরেজি সাহিত্যের অনুশীলন করেই তিনি অক্ষয় কীর্তিলাভ করতে পারবেন—এ দুরাশা সেদিন পর্যন্ত মাইকেলের মনে বলবৎ ছিল। তারপর বিরূপ সমালোচনার কঠিন আঘাতে তিনি একটু আত্মস্থ হলেন। এমন সময়ে কলকাতা থেকে তাঁর প্রিয়বন্ধু গৌরদাস বসাক প্রবাসী মাইকেলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন বেথুন সাহেবের এই মন্তব্য। মন্তব্য তো নয় যেন মন্ত্রৌষধি। আলো দেখতে পেলেন মাইকেল। তাঁর মনের গতি পরিবর্তিত হলো। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী মাইকেল মাতৃভাষার দিকে মুখ ফেরালেন।

এইখানে আবার নবজাগরণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হয়।

মাইকেল যখন মাদ্রাজে, বাংলাদেশে তখন বিদ্যাসাগরের যুগ শুরু হয়ে গিয়েছে।

যে আট বছর মাইকেল মাদ্রাজে ছিলেন সেই আট বছরে বাংলা দেশে রেনেসাঁ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়া এই সময়কার একটি বিশেষ ঘটনা। বাংলা দেশে তখন তিনি বাংলা শিক্ষা-বিস্তারের এক বিরাট যজ্ঞ শুরু করে দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর একাই তার

হোতা এবং পুরোধা। বাংলা দেশে বাংলাশিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব একরকম তাঁরই ওপর ন্যস্ত হয়েছে। এজন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁকে শিক্ষাবিভাগের অতিরিক্ত ইনসপেক্টর হিসেবেও নিযুক্ত করেছিলেন। তখনো পর্যন্ত দেশে বাংলা শিক্ষা প্রচারের জন্য সুপরিকল্পিত কোনো সরকারী ব্যবস্থা বা উদ্যম দেখা দেয় নি, অর্থব্যয় তো দূরের কথা। বাংলার ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং শিক্ষাব্যাপারে তিনি সবসময়েই তাঁর সুবিবেচনা ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। বাংলার জেলায়, মফঃস্বলে মডেল স্কুল স্থাপন থেকে সেইসব স্কুলের জন্য শিক্ষক নির্বাচন ইত্যাদি সমস্ত কাজ সেদিন বিদ্যাসাগর একাই করেছিলেন। এইসব মডেল স্কুলের শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার জন্য তিনি সংস্কৃত কলেজে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপন করলেন এবং অক্ষয়কুমার দত্তকে সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক করে নিয়ে এলেন। এইভাবে বিদ্যাসাগরের ধ্যান আদর্শ ও পরিকল্পনার সঙ্গে সরকারী উদ্যম, অর্থ ও পৃষ্ঠপোষকতা সংযুক্ত হয়ে বাংলা দেশে বাংলা শিক্ষার বিস্তার প্রবল উৎসাহের সঙ্গে চলতে লাগল। বিদ্যাসাগর এই সময়ে পালকি করে জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রত্যেকটি স্কুলের কাজকর্মের তদারক করতেন। শুধু কি তাই? স্কুলের জন্য পাঠ্যপুস্তক পর্য্যন্ত রচনা করতে হলো তাঁকে। এই প্রসঙ্গে তাঁর সহপাঠী মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নামও উল্লেখযোগ্য। এইভাবে তিন বছরের মধ্যেই দক্ষিণ বাংলার চারটি জেলায় বিদ্যাসাগর প্রায় একশো মডেল স্কুল স্থাপন করে বাংলা শিক্ষার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। বাংলায় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির ইতিহাসে বিদ্যাসাগর ভিন্ন আর কারো নাম নেই। সেদিন তিনি দেশের মধ্যে বাংলাশিক্ষা প্রচারের জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি, চিন্তা ও শ্রমনিয়োগ করেছিলেন বললেই হয়। হ্যালিডে যখন তাঁর কাছ থেকে এই বিষয়ে মন্তব্য চেয়ে পাঠালেন তখন বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন:

> 'সুবিস্তৃত এবং সুব্যবস্থিত বাংলা-শিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়, কেন না মাত্র ইহারই সাহায্যে জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব। লেখা, পড়া এবং অঙ্ক শেখাতেই এই শিক্ষা পর্যবসিত হইলে চলিবে না; শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, পাটিগণিত, জ্যামিতি, পদার্থ-বিদ্যা, নীতি-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান এবং শরীরতত্ত্ব

শেখানো প্রয়োজন। প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক কিছু রচিত হইয়াছে; পাটিগণিত, জ্যামিতি সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি রচিত হইতেছে। …প্রকৃতপক্ষে পাঠশালাগুলি যাহাতে প্রয়োজনসাধক বিদ্যালয়রূপে গড়িয়া উঠে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।"

দেশে ইংরেজিশিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে মাইকেলের জন্মের ঠিক এক বছর আগে রাজা রামমোহন রায় লর্ড আমহার্ষ্টকে যে ঐতিহাসিক চিঠিখানি লিখেছিলেন, দেশে বাংলাশিক্ষা প্রচলনের জন্য বিদ্যাসাগরের এই সুচিন্তিত মন্তব্য যেন রামমোহনের চিন্তারই প্রতিধ্বনি।

বাংলা শিক্ষার সঙ্গে সেই সময়ে স্ত্রী-শিক্ষার আয়োজনও আরম্ভ হয়েছে। এখানে-ওখানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও হ্যালিডে-বিদ্যাসাগরের যুক্ত উদ্যম। এই প্রসঙ্গে আর একজন মহৎ প্রাণ ইংরেজের নাম স্মরণীয়। তিনি বেথুন সাহেব। বাংলা দেশে স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ও আগ্রহের সীমা ছিল না। বড়লাটের ব্যবস্থা-সচিব বেথুন সাহেবের অর্থসাহায্যেই কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ডেভিড হেয়ারের মতো বেথুনের কাছেও বাঙালি চির-কৃতজ্ঞ। হেয়ারের মতো বেথুনেরও শেষ নিশ্বাস এই দেশের মাটিতে মিশে আছে। এইভাবে নবজাগরণের প্রবাহপথে বাংলা ভাষা ধীরে ধীরে তার মাথা তুলে দাঁড়াতে আরম্ভ করলো। এই বেথুন সাহেবই গৌরদাস বসাককে মাইকেলের 'ক্যাপটিভ লেডি' পড়ে ঐ চিঠি লিখেছিলেন। মাইকেলের যে মানসিক অবস্থায় বেথুনের ঐ মন্তব্যটি তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল, তার ফল হলো অমোঘ। এইবার মাইকেল তাঁর বহু-ঘৃণিত বাংলা ভাষার দিকে মুখ ফেরালেন। যুগ-পরিবর্তনের মুখে বাংলা কাব্যেও তখন চিরাচরিত ধারার পরিবর্তন আসন্ন হয়ে উঠেছে। সুতরাং মাদ্রাজে মাইকেলের কবি-জীবনে দিক্-পরিবর্তন ছিল রেনেসাঁরই পরোক্ষ ফল।

মাদ্রাজে গিয়ে মাইকেল বাংলা ভাষা একরকম বিস্মৃতই হয়েছিলেন। তাই প্রিয়বন্ধু গৌরের চিঠির সঙ্গে বেথুন সাহেবের মন্তব্য তাঁর কাছে পৌঁছবার পরই তিনি আত্মস্থ হলেন। ইংরেজিতে আর নয়, বাঙালির ছেলে, বাংলাতেই তিনি লিখবেন। বেথুন সাহেবকে মনে মনে সহস্র ধন্যবাদ দিলেন মাইকেল

আর দিলেন গৌর বসাককে। কিন্তু বাঙালি-বর্জিত এই দূর দেশে বাংলা শিখবেন কি করে? মনে পড়লো শৈশবে সাগরদাঁড়িতে মায়ের কাছে তিনি কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারত পড়েছিলেন। মাতৃকণ্ঠের সেই সুললিত আবৃত্তি যেন নূতন করে মাইকেলের কানে আজ ধ্বনিত হলো। লিখলেন গৌরকে—অবিলম্বে একপ্রস্থ রামায়ণ-মহাভারত পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো। সেইদিন থেকে ছাত্রের অধ্যয়ন-নিষ্ঠা নিয়ে মাইকেল দৈনিক বারো ঘণ্টা করে বিভিন্ন ভাষা-চর্চায় নবোদ্যমে প্রবৃত্ত হলেন—তার মধ্যে সংস্কৃত আর বাংলা ভাষার অনুশীলন করতেন তিন ঘণ্টা করে। সব সময়ে তিনি বন্ধুর উপদেশ স্মরণ করতেন: 'মধু, তুমি যদি তোমার শক্তি এবং সামর্থ্য মাতৃভাষার সেবায় নিয়োজিত করিতে, তাহা হইলে তাহা কতই ফলপ্রদ হইত।" স্বাস্থ্য ছিল অটুট, প্রতিভা ছিল বিশাল, তাই বিদ্যা অর্জনে মাইকেল পরিশ্রম করতে পরাঙ্মুখ হতেন না। বাংলার কবিদের মধ্যে মাইকেলের স্বাতন্ত্র্য এইখানে।

এক-এক করে দীর্ঘ আট বছর অতিক্রান্ত হলো।

বাংলায় তখন নবজাগরণের বর্ণচ্ছটা শিক্ষা, সমাজ ও সাহিত্যের ভেতর দিয়ে উজ্জ্বলরূপে ফুটে উঠেছে। নানা ঘটনাস্রোত বাংলার সমাজ-জীবনের ওপর দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে চলেছে। সাহিত্যে দেখা দিয়েছে নানা প্রয়াস। কথ্যরীতির নূতন গদ্য আত্মপ্রকাশ করেছে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে। বাংলা থেকে বহু দূরে অবস্থিত প্রবাসী মাইকেলের কাছে তার সকল সংবাদ গিয়ে পৌছয় তাঁর প্রিয়বন্ধু গৌর বসাকের চিঠির মাধ্যমে। এই সময়ে গৌর বসাক মাইকেলকে বাংলা দেশে ফিরিয়ে আনবার জন্য বার বার চিঠি লিখেছেন—বন্ধুর আকুতিপূর্ণ সেইসব পত্র মাইকেলের মনে ধীরে ধীরে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে চলেছে। ইতিমধ্যে মাইকেলের ব্যক্তিগত জীবনে তিনটি প্রধান ঘটনা ঘটে গেছে। প্রথম, মর্মপীড়িতা মায়ের মৃত্যু, দ্বিতীয়, রাজনারায়ণ দত্তের মৃত্যু এবং তৃতীয় রেবেকার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ। এই বিবাহবিচ্ছেদের সময়ে মাইকেল দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যার পিতা। রেবেকার সঙ্গে মাইকেলের পরিণয় কবির পক্ষে সুখের হয় নি। নিরুদ্বেগ সংসার জীবন

মাইকেলের জন্য নয়। মাইকেলের প্রতিভা রেবেকার পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন হয়েছিল—তিনি তাঁর স্বামীর বাইরের রূপটাই দেখেছিলেন—দেখেছিলেন তাঁর চির অসংযত, চঞ্চল ও উদ্দাম প্রকৃতি, দেখেছিলেন তাঁর অমিতব্যয়িতা আর পানাসক্তি। কিন্তু এ-সবের অন্তরালে যে বিরাট কবি-প্রতিভা ছিল, রেবেকার দৃষ্টিতে তা' ধরা পড়েনি। অনুরাগ তাই বিরাগে রূপান্তরিত হয়ে অবশেষে বিচ্ছেদে পরিণত হলো। এর পর দ্বিতীয়া পত্নীরূপে যিনি মাইকেলের জীবনে প্রবেশ করলেন, সেই এমিলিয়া আঁরিয়েতা সোফিয়াই ছিলেন তাঁর প্রকৃত জীবনসঙ্গিনী। আঁরিয়েতা ছিলেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষের মেয়ে। মাইকেলের দ্বিতীয়া স্ত্রী খাঁটি ফরাসী রমণী।*

দীর্ঘকাল কলকাতায় মাইকেলের কোনো সংবাদ নেই।

বন্ধুরা সবাই উদ্বিগ্ন, বিশেষ করে গৌর বসাক। এদিকে খিদিরপুরের বাড়িতে দেখা দিয়েছে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা। রাজনারায়ণ দত্ত তাঁর সম্পত্তির কোনো উইল করে যান নি—এই সুযোগে এবং মাইকেল বেঁচে নেই—এই অনুমান করে আত্মীয়েরা তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি গ্রাস করতে উদ্যত হলেন। ঠিক এই সময়েই (ডিসেম্বর ১৮৫৫) রেভারেণ্ড ব্যানার্জি একদিন এসে উপস্থিত হলেন মাদ্রাজে। তাঁরই হাত দিয়ে গৌর বসাক দত্ত-বাড়ির পারিবারিক সকল বিষয়ের উল্লেখ করে মাইকেলকে একখানা চিঠি লিখলেন। চিঠিখানির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম। মূল চিঠি ইংরেজিতে লেখা। তখনকার দিনে হিন্দু কলেজের শিক্ষিত বাঙালি ইংরেজিতেই বেশির ভাগ চিঠি লিখতেন। গৌর বসাক লিখছেন :

> "বড়ই দুঃখিত যে, তোমার অর্থাৎ তোমার পিতার পরিবারের কোন সুসংবাদই তোমাকে দিতে পারিলাম না। তুমি বহু পূর্বেই হয়ত

* সম্প্রতি কোনো আধুনিক গবেষক আবিষ্কার করেছেন যে আঁরিয়েতা মাইকেলের পরিণীতা স্ত্রী ছিলেন না এবং তিনি নাকি এই বিষয়ে মাদ্রাজ ও কলকাতায় রেজিষ্ট্রার অব ম্যারেজ অফিসে অনুসন্ধান করে মাইকেলের এই বিয়ের কোনো প্রমাণ পান নি। তাঁর সিদ্ধান্ত আঁরিয়েতা মাইকেলের রক্ষিতা ছিলেন। আমাদের সিদ্ধান্ত কিন্তু ভিন্ন রূপ। বিষয়টি আমাদের আলোচনার বহির্ভূত বলেই আমরা এর সবিস্তার উল্লেখ করতে বিরত হলাম। মাইকেলকে অপদস্থ করা ভিন্ন, এ-জাতীয় গবেষণার আর কী মূল্য আছে?

শুনিয়াছ যে তোমার পিতা-মাতা উভয়েই মারা গিয়াছেন এবং তোমার খুল্লতাতের পুত্রগণ (রাজনারায়ণের তিনজন অগ্রজ ছিলেন) তাঁহাদের সম্পত্তি লইয়া মারামারি করিতেছে। তোমার দুই বিমাতা এখনো জীবিত কিন্তু তোমার লোভী ও স্বার্থপর আত্মীয়েরা তোমার পিতার সম্পত্তি হইতে তাঁহাদের প্রায় বঞ্চিত করিয়া ফেলিয়াছে। সময় থাকিতে ফিরিয়া আসিলে সকল বেআইনী দাবীদারদের ব্যর্থ করিয়া তুমিই তোমার জমিদারীর মালিক হইতে পার। মধু, তুমি কি আসিবে?"

যথাসময়ে রেভারেণ্ড ব্যানার্জি মাদ্রাজে এসে মাইকেলের হাতে চিঠিখানা দিলেন। দীর্ঘকাল পরে বন্ধুর চিঠি পেয়ে মাইকেল উল্লসিত হলেন। পত্রে আর একটি দুঃসংবাদ ছিল—গৌর বসাকের পত্নীবিয়োগের সংবাদ। কিন্তু চিঠির শেষ লাইনটি যেন সজীব হয়ে মাইকেলের কানে বাজতে লাগল:

"মধু, তুমি কি আসিবে?"

বন্ধুর এই আহ্বান মাইকেল আর উপেক্ষা করতে পারলেন না।

গৌর বসাকের মুখ দিয়ে যেন বাংলা দেশ—বাংলা ভাষা মাইকেলকে ডাক দিলো।

বাংলার প্রতি তিনি যেন এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করলেন।

নবজাগরণ তার প্রথম কবিকে আর দূর প্রবাসে রাখতে চাইল না।

বাংলার মাইকেল আবার বাংলায় ফিরলেন।

প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে, মাদ্রাজ-প্রবাস মাইকেলের পক্ষে শাপে বর হয়েছিল। মাদ্রাজ-প্রবাসের নিঃসঙ্গতা থেকেই মাইকেল চির-উপেক্ষিত বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি জীবনধারার ভাবৈশ্বর্য প্রথম উপলব্ধি করেন। তাঁর অন্তরের শূন্যতা-গোধূলির মধ্যেই পূর্বস্মৃতির তারকাদীপ্তি ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। সেই দীপ্তিই তাঁর মানসলোককে ক্রমে ক্রমে উদ্ভাসিত এবং উদ্‌বোধিত করে তুলেছিল। নবযুগের কবি ও কবিতার এই হলো জন্মরহস্য।

এইবার শুরু হলো মাইকেলের জীবন-নাট্যের বর্ণাঢ্য দ্বিতীয় অঙ্ক।

॥ নয় ॥

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬।

অবশেষে মাদ্রাজের তমোলীন দুর্গমতা থেকে মাইকেল ফিরলেন কলকাতার পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বলতার মধ্যে।

তেমনি নিঃসহায় এবং নিঃসম্বল।

কলকাতা শহরে সেদিন তাঁর মাথা গুঁজবার স্থান ছিল না বল্‌লেই হয়।

এই দীর্ঘ আট বছরের প্রায় অজ্ঞাতবাস তাঁর আকৃতি ও প্রকৃতিতে এনে দিয়েছে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন। বত্রিশ বছর বয়সেই ঈষৎ স্থূলকায় হয়ে পড়েছেন ; গলার সেই সুমিষ্ট স্বর হয়েছে গম্ভীর এবং ঈষৎ কর্কশ। প্রাক্-প্রৌঢ়ত্বের সকল চিহ্নই তাঁর আকৃতিতে এখন পরিস্ফুট। যৌবনের উদ্দাম চঞ্চলতা, সেই অস্থিরচিত্ততা মাইকেলের মধ্যে আর নেই—পিতৃত্বের গাম্ভীর্য, বিবাহিত জীবনের দায়িত্ববোধ তাঁর প্রকৃতিতে এনে দিয়েছে একটা নূতন রূপ। আর সেই বিশাল আয়ত চোখ দুটিতে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর চির-জীবনের অভিলাষ—মহাকবি হবার আকাঙ্ক্ষা। যেমন অজ্ঞাতসারে হয়েছিল তাঁর দেশত্যাগ, ঠিক তেমনি নিঃশব্দেই ফিরলেন মাইকেল। কাক-পক্ষীও টের পেল না যে মাইকেল কলকাতায় ফিরেছেন। বন্ধুর প্রত্যাবর্তন সংবাদ শুধু পেলেন গৌর বসাক। তিনিই সর্বপ্রথম বিশপস্ কলেজে রেভারেণ্ড ব্যানার্জির কোয়ার্টারে এসে বন্ধুকে জানালেন স্বাগতম্। বললেন, যদি ভাগ্য-পরীক্ষা করতে হয়, নিজের দেশে থেকেই তা করা ভালো, মধু।

গৌরের কাছেই মধু রাজনারায়ণ, ভূদেব প্রভৃতি তাঁর অন্তরঙ্গ সহপাঠীদের বর্তমান সংবাদ অবগত হলেন এবং জানতে পারলেন যে তাঁদের অনেকেই এখন ভালো চাকরি করছেন। গৌর বসাক নিজে তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

তারপর মাইকেল এলেন একদিন খিদিরপুরে—পৈতৃক বাসভবনে।

মধুসূদন দত্ত নয়, খ্রীষ্টান মাইকেল এম. এস. ডাট্ এলেন তাঁর নিজের বাড়িতে।

রাজনারায়ণ দত্ত আজ বেঁচে নেই পুত্রকে যিনি প্রশ্রয় দিয়ে উচ্ছৃঙ্খল আর অমিতব্যয়ী করে তুলেছিলেন। বেঁচে নেই মধু-অন্ত প্রাণ জননী জাহ্নবী যিনি

স্কুল থেকে মধুসূদন ফিরলে পরে গরম দুধের বাটি হাতে নিয়ে ছেলের সামনে এসে দাঁড়াতেন, স্নেহভরে বলতেন—নে, মধু, খা; যিনি ধর্মান্তর গ্রহণের পরও ছেলেকে লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা দিতেন, টাকা না থাকলে নিজের গহনা। যিনি ছেলের জন্য কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। পিতামাতার সহস্র স্মৃতিপূত খিদিরপুরের বাড়িতে নীরবে নতমস্তকে প্রবেশ করলেন মাইকেল। শূন্য বৈঠকখানার একধারে রাজনারায়ণ দত্তের রূপোর বিরাট গড়গড়াটি ঠিক তেমনি পড়ে আছে। রাজনারায়ণ কতদিন পুত্রের সহপাঠীদের সামনেই মধুসূদনের হাতে তুলে দিয়েছেন সেই গড়গড়ার নল। আজ মাইকেলকে অভ্যর্থনা করবার জন্য তিনি বেঁচে নেই। দু-ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু দিয়ে মাইকেল তাঁর স্বর্গত পিতামাতার তর্পণ করলেন নিঃশব্দে। মায়ের কথাই বেশি করে মনে পড়ল তাঁর। মনে পড়ল রাজনারায়ণ দত্তের সেই মর্মভেদী চীৎকার—ওরে, কে আছিস, করাত নিয়ে আয়; করাত দিয়ে মধুকে দুখানা করে চিড়ে দে। রাত্রে যখনই বিশপস্ কলেজ থেকে মাইকেল খিদিরপুরের বাড়িতে আসতেন জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে লুকিয়ে সাক্ষাৎ করতে, কথিত আছে, তখনই ছেলে এসেছে শুনে রাজনারায়ণ বৈঠকখানা ঘর থেকে এইরকম উন্মত্ত গর্জন করতেন। আজ সব নিস্তব্ধ।

খিদিরপুরে বাড়িতে থাকার মধ্যে আছেন বিমাতা হরকামিনী আর বিষয়সম্পত্তি-লোলুপ স্বার্থান্বেষী আত্মীয়-স্বজন। মাইকেল বুঝলেন এ-গৃহে তাঁর আর স্থান নেই। গেলেন আবাল্য-সুহৃৎ গৌর দাসের বাড়িতে। গৌর হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেন মাইকেলের এখনকার অবস্থা; হিন্দু সমাজে তাঁর জন্য স্থান নেই, গৃহে স্থান নেই আর সবচেয়ে বড়ো কথা—জীবিকারও কোনো সংস্থান নেই। বন্ধুকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন, এখন কলকাতায় তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলার দায়িত্ব সম্বন্ধে গৌর বসাক বিশেষভাবে সচেতন হলেন। নিরাশ্রয় মাইকেলের এখন দরকার একটি আশ্রয়, একটি চাকরি। তাঁর চারদিকের পরিবেশ একটু নিশ্চিন্ত করে তুলতে পারলে, গৌর বসাক জানতেন, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি জ্বলে উঠতে দেরী হবে না। কলকাতার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজেও মাইকেলকে পরিচিত করে তুলতে হবে।

এইখানে প্রসঙ্গতঃ একটি ঘটনার উল্লেখ করব। মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে মাইকেল একটি চাকরির চেষ্টা করেন। বন্ধুবান্ধবের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর ভরসা করে পরাশ্রয়ী জীবন যাপন করা এই জন্ম-বিদ্রোহীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। মাদ্রাজ যাবার আগে তিনি একবার চাকরির চেষ্টা করেছিলেন এবং তখন রেভারেণ্ড ব্যানার্জির সুপারিশ নিয়ে তিনি ছোটলাটের চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কিন্তু তখন বিশেষ কোনো সুবিধা হয় নি। মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পরে তিনি কোনো সূত্রে জানতে পারলেন যে হুগলি নর্মাল স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হয়েছে। মাইকেল উক্ত পদের জন্য প্রার্থী হয়ে দরখাস্ত করলেন। নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে একটি প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষা হয়েছিল। পরীক্ষা দিতে এসে মাইকেল দেখলেন তাঁর সহপাঠী ভূদেবও উক্ত পদের জন্য একজন প্রার্থী। এই চাকরিটিও তাঁর তখন হয় নি।

মাইকেলকে খুশি করবার জন্যে একদিন গৌরদাস তাঁর বাড়িতে একটা প্রীতিভোজ দিলেন।

"সেই ভোজে মধুসূদনের শুভানুধ্যায়ী বিশিষ্ট বন্ধু দিগম্বর মিত্র ও পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্র যোগদান করিয়া তাঁহার প্রীতিবর্ধন করিলেন। অতঃপর মধুসূদনকে কলিকাতায় স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এইসকল কৃতি বন্ধুবান্ধব, তাঁহাকে কিশোরীচাঁদের অধীনে, কলিকাতা পুলিশ আদালতের হেড ক্লার্কের পদ গ্রহণ করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। মধু-সূদন সে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।"

এই কিশোরীচাঁদ মিত্র ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের ছাত্র। বাঙালির মধ্যে ইনিই রামমোহনের প্রথম জীবনীকার। রামমোহনের মৃত্যুর নয় বৎসর পরেই ইনি 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রিকায় রামমোহন রায়ের জীবনী লেখেন; এই ব্যাপারে পাদ্রি আলেক-জান্দার ডাফ তাঁকে সহায়তা করেন। রামমোহনের এই জীবনচরিতই সেদিন কিশোরীচাঁদের সৌভাগ্যের সোপানস্বরূপ হয়েছিল। সরকারী মহলে তিনি এই বই লিখে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিশোরীচাঁদের সঙ্গে

মধুসূদনের বিশেষ পরিচয় ছিল। রামধন ঘোষ ছিলেন কিশোরীচাঁদের স্ত্রীর জ্যাঠামশাই এবং খিদিরপুরে দত্তবাড়ির কাছেই ছিল ঘোষেদের বাড়ি। রামধন তখন কলকাতার কালেক্টার। এই সূত্রেই মাইকেল কিশোরীচাঁদের স্ত্রীর বিশেষ পরিচিত ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও কিশোরীচাঁদ মাইকেলকে তাঁর বন্ধুর স্থান দিয়েছিলেন। তাই তাঁর অধীনে কাজ করতে মাইকেল আপত্তি করলেন না। চাকরি হলো। এখন আশ্রয়। কিশোরীচাঁদ তখন থাকতেন তাঁর দমদমের বাগান বাড়িতে। আপাততঃ মাইকেল সেইখানে অবস্থান করতে লাগলেন। এইখানে তখন শহরের অনেক বিদ্বদ্ সমাগম হতো—মাইকেলের বন্ধুরাই বেশি আসতেন। মাঝে মাঝে সাহিত্যের আসর বসতো এইখানে।

এই সময়ের একদিনের একটি ঘটনা। সেদিন প্যারীচাঁদ মিত্র উপস্থিত ছিলেন। বয়সে তিনি মাইকেলের চেয়ে দশ বছরের বড়ো। তিনি তখন মাসিক পত্র সম্পাদনা করছেন এবং সেই কাগজেই তখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল'। তখনো পর্যন্ত বাংলা গদ্য সংস্কৃতঘেঁষা ছিল। প্যারীচাঁদ এই রীতির পরিবর্তন করে সর্বজনবোধ্য কথ্য ভাষায় 'আলাল' লিখেছেন। এই ভাষা নিয়েই সেদিন মাইকেল তর্ক তুললেন। বললেন ঃ "আপনি এ আবার কি লিখিতে বসিয়াছেন? লোকে ঘরে আটপৌরে যাহা হয় পরিয়া আত্মীয়-স্বজন সকাশে বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু বাহিরে যাইতে হইলে সে বেশে যাওয়া চলে না। পোষাকি পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তাই এইখানে। আপনি দেখিতেছি, পোষাকির পাঠ তুলিয়া দিয়া, ঘরে-বাহিরে সভা-সমাজে সর্বত্রই এই আটপৌরে চালাইতে চাহেন। ইহাও কি কখন সম্ভব?"

—তুমি বাংলা ভাষার কি বুঝিবে? এ তোমার অনধিকার-চর্চা। বললেন প্যারীচাঁদ।

—কিন্তু আপনি কি মনে করেন, এই আলালী ভাষা চলিবে?

—বিলক্ষণ। আমার প্রবর্তিত এই রচনা পদ্ধতিই বাংলা-ভাষায় চিরস্থায়ী হইবে।

—It is the language of fishermen, unless you import largely from Sanskrit, বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন মাইকেল, উপস্থিত

সকলেই হেসে উঠলেন তাঁর এই কথায়। দিগম্বর মিত্র মদের গেলাসে চুমুক দিয়ে বললেন—মধু, তুমি বাংলা লিখবে! আর সেই বাংলা চিরস্থায়ী হবে! সে তো আর একালে নয়।

বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় মাইকেলর এই প্রথম যোগদান।

এই দিনের এই সাহিত্যপ্রসঙ্গ তাঁর সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করল।

সেইদিন থেকে মাইকেল একলব্যের মতো সকলের অজ্ঞাতসারে বাংলা ভাষার অনুশীলনে গভীরভাবে নিযুক্ত হলেন।

৬ নম্বর লোয়ার চিৎপুর রোড। দোতলা একখানা বাড়ি।

হেড ক্লার্ক থেকে দোভাষীর পদে প্রমোশন পেয়ে মাইকেল লালবাজারের কাছে এই বাড়ি ভাড়া করে এখন বাস করছেন। মাইনে মাসে একশো কুড়ি টাকা। কাছেই পুলিশ আদালত। দিনে আদালতে চাকরি করেন, সন্ধ্যায়ও রাত্রিতে আইন অধ্যায়ন, সংস্কৃত পড়া আর সাহিত্যচর্চা। রামকুমার বিদ্যারত্ন নামে জনৈক পণ্ডিতের কাছে মাইকেল এই সময়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সংস্কৃত পড়তেন—বিশেষ করে সংস্কৃতের উৎকৃষ্ট সাহিত্যগুলি। পণ্ডিতকে তিনি মাসে পঁচিশ টাকা করে মাইনে দিতেন। মাইকেলের এক জীবনচরিত-কার লিখেছেন ঃ

> "এই বাটীতেই তিনি মেঘনাদবধ কাব্য, তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, শর্মিষ্ঠা নাটক, পদ্মাবতী নাটক, কৃষ্ণকুমারী নাটক, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। রত্নাবলী ও শর্মিষ্ঠা নাটকদ্বয়ের ইংরাজি অনুবাদও এই বাটীতে অবস্থান কালেই সমাধা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত তাঁহার যাবতীয় গ্রন্থই পুলিশ আদালতে দ্বিভাষিকের কার্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে রচিত হয়। ন্যূনাধিক তিন বৎসরের মধ্যে অদ্ভুত প্রভিভাশালী মধুসূদন এই পবিত্র কীর্তি-মন্দিরে তাঁহার জীবনের অপূর্ব সাহিত্য-ব্রতের প্রতিষ্ঠা করেন।"

এইবার মাইকেলের জীবনের সেই অলৌকিক সারস্বত সাধনার কথা।

পুলিশ-কোর্টের চাকরির মাইনেতে খরচের সঙ্কুলান হওয়া কঠিন ছিল, বিশেষ করে মাইকেলের মতো অমিতব্যয়ী লোকের পক্ষে। আয়ের পন্থার কথা তিনি চিন্তা করলেন। মাদ্রাজে থাকবার সময়ে তিনি সাংবাদিকতা বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন এবং তাতে তিনি সুখ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। ইংরেজি ভাষার ওপর দখল তাঁর অসাধারণ। কলকাতায় তখন বহু ইংরেজি সাময়িক পত্রের আবির্ভাব ঘটেছে। মাইকেলের জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> "সংবাদপত্রে লিখিয়াও কিছু কিছু আয় হইত। কিন্তু সংবাদপত্রে লেখা মধুসূদনের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে নিরাপদ ছিল না। একবার *Citizen* নামক একখানি পত্রিকায় কলিকাতার কতকগুলি ব্যক্তির বিরুদ্ধে লেখাতে তাঁহাকে বিলক্ষণ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। পত্রিকার সম্পাদক মধুসূদনের নাম প্রকাশ না করিয়া অন্তর্ধান করাতে, মধুসূদন সে যাত্রা নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন।"

এই সময়ে মাইকেল জ্ঞাতিদের হাত থেকে পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টাও করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন দিগম্বর মিত্র। এইভাবে কলকাতা শহরের একপ্রান্তে নিতান্ত অজ্ঞাত ও অপরিচিতভাবে মাইকেল দিনাতিপাত করতে লাগলেন। তখন বাংলা সাহিত্য এবং বাংলার সমাজ-জীবনে বিদ্যাসাগরের যুগ। তিনিই তখন বাংলার সর্বপ্রধান পুরুষ। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন এই তেজস্বী পুরুষের চরিত্রপ্রভায় তখন বাংলার সমাজজীবন উদ্ভাসিত। এই বিদ্যাসাগরের নাম মাইকেল শুনলেন। এক হিসাবে তিনিও মাইকেলের সহপাঠী। "এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, যাঁহার পিতার দশ-বার টাকার অধিক আয় ছিল না, যিনি বাল্যকালে অধিকাংশ সময় অর্ধাশনে থাকিতেন"—মাইকেল এসে দেখলেন সেই মানুষ নিজের তেজে গোটা বাংলা দেশকে যেন কাঁপিয়ে তুলেছেন। মাইকেল বিস্মিত, স্তম্ভিত হলেন। চিৎপুরের বাড়িতে বসেই তিনি বন্ধুদের মুখে, খবরের কাগজে জানতে পারলেন যে এই একটি মানুষ স্বল্পকালের মধ্যেই শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে কি তুমুল আলোড়ন এনে দিয়েছেন। সকলের মুখে তখন বিদ্যাসাগরের নাম।

মাইকেলের মন যেন একটা দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করলো সেই ব্রাহ্মণের প্রতি।

বাংলার নবজাগরণ যখন বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্র করে এক নূতন আবর্তের সৃষ্টি করেছে, তখন এই সময় কলকাতার নাট্যশালার ইতিহাসে বেলগাছিয়া থিয়েটার এক নবজীবনের সূচনা করে দিয়েছিল। "তখনকার দিনের গণ্যমান্য ও শিক্ষিত লোকদের মতে এরূপ সুন্দর নাট্যশালার প্রতিষ্ঠায় পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং এই ব্যাপারে সেই যুগের ইংরাজি শিক্ষিত বহু নবীন বাঙালি তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনয়ের পর কলিকাতার অভিজাত মহলে অভাবিত রকমের সাড়া পড়িয়া যায়।"

বেলগাছিয়া থিয়েটারের প্রথম অভিনীত নাটক 'রত্নাবলী'। লেখক—'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের খ্যাতনামা এবং তখনকার দিনের একমাত্র প্রসিদ্ধ নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন। শ্রীহর্ষের সংস্কৃত 'রত্নাবলী' অবলম্বন করেই রামনারায়ণ এই নাটকখানি রচনা করেছিলেন। নাটকের জন্য গান লিখে দিয়েছিলেন গুপ্ত-কবির শিষ্য এবং তখনকার দিনের একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-রচয়িতা গুরুদয়াল চৌধুরি। বেলগাছিয়া নাট্যশালার উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গৌরদাস বসাক। এই নাট্যশালার উদ্বোধন ও 'রত্নাবলী' নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ ৩১শে জুলাই, ১৮৫৮। এ ঘটনা মাইকেল মাদ্রাজ থেকে ফিরবার দু বছর পাঁচ মাস পরের কথা। এই 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয়কে উপলক্ষ করেই সেদিন বাংলা সাহিত্যে মাইকেলের আবির্ভাব ঘটেছিল। অভিনয় দর্শনের জন্যে রাজারা শহরের বিদ্বদ্‌সমাজের প্রধানদের এবং অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ইংরেজ দর্শকদের জন্য প্রয়োজন হলো নাটকের ইংরেজি অনুবাদের। কে অনুবাদ করবে? গৌরদাস বললেন, এই নাটকের যথার্থ ইংরেজি অনুবাদ করতে পারেন এমন একজনই আছেন।

সকলেই তখন জানতে চাইলেন, কে তিনি? গৌরদাস মাইকেলের নাম

করলেন। "মধুসূদনের ইংরেজি ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির বিষয় অবগত হইয়া পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর গৌরদাস বসাক প্রমুখ বন্ধুগণের প্রস্তাবে তাঁহার উপর রত্নাবলী নাটকের ইংরেজি অনুবাদের ভার অর্পণ করেন। অতি অল্পদিনেই মধুসূদন অর্পিত কার্য সুসম্পন্ন করেন। অনুবাদ এতদূর মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল যে, তাহা পাঠ করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন।"

গৌরদাস এই কাজ করে তাঁর বন্ধুর দুটি উপকার করেছিলেন। প্রথম, মাইকেলকে এই উপলক্ষে শহরের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজে সুপরিচিত করে তোলা; দ্বিতীয়—কিছু আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা। বলা বাহুল্য, তাঁর দুটি উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়েছিল। রত্নাবলীর ইংরেজি অনুবাদের পারিশ্রমিক বাবদ মাইকেল পাঁচশো টাকা পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, রাজারা নিজেদের খরচে সেই ইংরেজি অনুবাদ ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। কলকাতা শহরে ধনী-সমাজে তখন বিদ্যানুরাগী ও সাহিত্যানুরাগী হিসাবে তিনজন প্রসিদ্ধ ছিলেন, পাইকপাড়ার সিংহ-ভ্রাতৃদ্বয় আর মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। যতীন্দ্র-মোহনও হিন্দু কলেজের ছাত্র। মাইকেলের সাহিত্যজীবনের ইতিহাসে এই তিনজনের নাম—বিশেষ করে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম স্মরণীয়। এঁদের সাহায্য, উৎসাহ ও অনুরাগ পেয়েছিলেন বলেই মাইকেল অল্পদিনের মধ্যেই অমন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসেও প্রতাপচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরোক্ষ দান কম নয়। এঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থানুকুল্যে তখনকার বাংলা সাহিত্য ও সমাজ যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিল।

বলেছি, 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখ-যোগ্য। মাইকেলের জীবনেও। 'রত্নাবলী'র অপূর্ব অভিনয়ই মাইকেলকে বাংলা সাহিত্যের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করলো। নাটক লেখার সংকল্প জাগল তাঁর মনে। প্রথম অভিনয় রজনীতে শহরের প্রধান রাজপুরুষ এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এইখানেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মাইকেলের প্রথম পরিচয় এবং এই পরিচয়ই পরবর্তীকালে মাইকেলের ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবনে বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছিল। অভিনয়ের প্রশংসার সঙ্গে

সঙ্গে রত্নাবলীর ইংরেজি অনুবাদকের নামও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ; ইংরেজরা পর্যন্ত এর খুব প্রশংসা করলেন। মূলের চেয়ে অনুবাদেরই প্রশংসা হলো বেশি। 'হরকরা' সম্পাদক এই অনুবাদের প্রশংসা করে লিখলেনঃ "এরূপ বিশুদ্ধ ইংরেজি রচনা আমরা কখনও দেখি নাই। বাঙালির লেখনী হইতে এরূপ লেখা কখন যে হয়, আমরা জানিতাম না। কেবল বাঙালি নহে, কলিকাতার মধ্যে অনেক ইংরাজও, এরূপ লিখিতে পারিয়াছি বলিয়া আপনা-আপনি শ্লাঘা প্রকাশ করিলে, অহঙ্কৃত বলিয়া দূষিত হইবেন না।"

কথিত আছে, রত্নাবলী নাটকের যখন রিহার্সাল হয়, তখন গৌরদাসের সঙ্গে মাইকেল মাঝে মাঝে সেই রিহার্সালে উপস্থিত থাকতেন। চিরদিন স্পষ্টবক্তা মাইকেল একদিন কথায় কথায় গৌরকে বলেছিলেন—এ আবার নাটক নাকি ? রাজারা মিছিমিছি এর পেছনে এত টাকা কেন খরচ করছেন বুঝতে পারছি না। বন্ধুর মুখে এই মন্তব্য শুনে গৌরদাস তাঁকে বললেন, ভালো নাটক বাংলায় থাকলে আমরা রত্নাবলীর অভিনয় করতাম না।

—ভালো নাটক ? আচ্ছা, আমি লিখব।

নবজাগরণ বাঙালির মনকে তখন নানা ভাবে উদ্দীপ্ত করে তুলেছে। জাতিচেতনা সমগ্রজাতির মর্মে অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয় দেখতে এসে মাইকেলের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তারই ভেতর আমরা লক্ষ্য করি সেই অব্যক্ত চেতনার সচেতন পরিণাম। শিক্ষিত নাগরিক সমাজে যৌথ চিত্ত-বিনোদনের আকাঙ্ক্ষার ভেতর দিয়ে এই চেতনাই সেদিন ফুটে উঠতে চেয়েছিল নাট্যশালার মাধ্যমে। রামমোহন, ডিরোজিও এবং বিদ্যাসাগরের বৈপ্লবিক চেতনার সমবেত পরিণাম সেদিন নাটক ও কাব্যের মাধ্যমে আর একজনের প্রতিভাকে আশ্রয় করে অভিব্যক্ত হয়ে উঠতে চাইলো। ভাব-রূপময় নবজীবনের আকুতিকে রূপায়িত করে তোলার জন্য একটি যুগন্ধর প্রতিভার সেদিন প্রয়োজন ছিল।

সেই প্রতিভা রেনেসাঁ-বিদ্ধ কবি মাইকেল।

কয়েকদিন পরে গৌরদাসের হাতে এলো মাইকেলের নাটকের পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ। তাঁর প্রথম বাংলা রচনা। নাটকের নাম 'শর্মিষ্ঠা'। গৌরদাস

বিস্মিত। পাণ্ডুলিপির দু'একটা পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখলেন তিনি। বিস্ময়ের যেন সীমা রইল না। ছুটলেন পাইকপাড়ায়। প্রতাপচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতিকে দিলেন এই সুসমাচার—মধু বাংলায় নাটক লিখেছে। তাঁদেরও কৌতূহল হলো। "ইংরেজিনবীস, মাদ্রাজী সাহেব মধুসূদন, বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইহা যেন সকলের পক্ষে বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় হইল, এবং পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। তাঁহাদিগের উৎসাহে মধুসূদন কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শর্মিষ্ঠার অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ করিলেন।"

মাইকেলের জীবনই একখানি নাটক। পরিপূর্ণ একখানি গ্রীক ট্র্যাজেডি। ধনীর একমাত্র পুত্র। প্রতিভাবান। অথচ ভাগ্যদোষে তাঁকে দারিদ্র্যের দুঃসহ তাপে দগ্ধ হতে হয়েছে। নানারূপ ভাগ্যবিপর্যয়ে তাঁর সমগ্র জীবন বিধ্বস্ত, তাঁর মৃত্যুও আবার তেমনি বিয়োগান্ত নাটকের একটি মর্মন্তুদ দৃশ্য। কিন্তু আমরা জানি, সেই সঙ্গে নবজাগ্রত বাঙালির মানস-চেতনা তার প্রাত্যহিক জীবনের কষ্টিপাথরে উৎকীর্ণ করে চলেছে নূতন সামাজিক-পারিবারিক জীবন-মূল্যবোধ। আবেগ ও অনুভূতির অঞ্জন-মাখা দৃষ্টি নিয়ে শিক্ষিত বাঙালি চাইল নূতন জীবনবোধকে রূপায়িত করতে। রামনারায়ণ প্রমুখ নাট্যকারদের দিয়ে এ কাজ হবার ছিল না, এর জন্য প্রয়োজন ছিল একটি যুগন্ধর প্রতিভার। বাংলা সাহিত্যের সকল বিভাগেই তখন চলেছে যৌবনসমাগমের প্রস্তুতি। ঠিক এমনি সময়ে অখণ্ড জীবনবোধের উদ্বোধনের বার্তা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আর্বিভূত হলেন সুলগ্ন-জন্মা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর প্রখর প্রাণধর্ম রেনেসাঁকে করে তুললো দেদীপ্যমান। বাজি ফেলে তিনি নাটক রচনা করেন নি; বাংলা সাহিত্যে অসম্ভবকে সম্ভব করার দুর্মদ সাধনাই মাইকেলের সারা জীবনের সাধনা। ব্যবহারিক জীবনের অতৃপ্তি, অচরিতার্থতা, অশান্তি, এমন কি অসম্মানজনক দারিদ্র্য পর্যন্ত সেই সাধনাকে ব্যর্থ করতে পারে নি। মাইকেলের সারস্বত সাধনার আজন্ম প্রেরণা তাঁর যৌবনোচ্ছ্বসিত আত্মসচেতনতা এবং সেই চেতনাই সেদিন রেনেসাঁর জারক রসে জারিত হয়ে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেছিল শর্মিষ্ঠা নাটকে।

শর্মিষ্ঠা মাইকেলের সাহিত্যসাধনার প্রথম ফল। আবার আঁরিয়েতা-মাইকেলের দাম্পত্য জীবনেরও প্রথম ফল শর্মিষ্ঠা। শর্মিষ্ঠা নাটক লিখবার পরেই ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আঁরিয়েতার গর্ভে মাইকেলের প্রথম সন্তানের জন্ম হলো। মাইকেল মেয়ের নাম রাখলেন শর্মিষ্ঠা—আঁরিয়েতা এলিজা শর্মিষ্ঠা। শর্মিষ্ঠা মাইকেলের বড়ো আদরের মেয়ে ছিলেন।

মাইকেলের শর্মিষ্ঠা নাটক রচনার মূল প্রেরণা অভিব্যক্ত হয়েছে নাটকের প্রস্তাবনা কবিতাটিতে। এই কবিতার শেষে তিনি লিখেছেন :

অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

নবজাগরণ তখন দাবী করছে নূতন নাটকের—যে নাটকে বাঙালির মানসচেতনা প্রতিফলিত হবে। মাইকেল লিখলেন সেই নাটক। প্রচলিত রীতিকে বর্জন করে সম্পূর্ণ নূতন রীতিতে তিনি রচনা করলেন শর্মিষ্ঠা। নূতন ও পুরাতনের সংঘর্ষ দেখা দিল শর্মিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন বিখ্যাত আলঙ্কারিক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ। নাটকের দোষ-গুণ বিচারের জন্য শর্মিষ্ঠার পাণ্ডুলিপি তাঁর কাছে প্রথমে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। মাইকেলের এক জীবনচরিতকার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> "রাজাদিগের উপরোধে তিনি শর্মিষ্ঠার পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু কিয়দংশ দেখিয়াই উপেক্ষার সহিত প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, সংস্কৃত রীতি অনুসারে ইহা নাটকই হয় নাই ; কাট-কুট করিলে রচনাটি সমুদয়ই নষ্ট হইবে, আমার ইহা সংশোধন করিতে ইচ্ছা নাই।"

নবীনেরা তর্কবাগীশের এই তীব্র সমালোচনায় কিন্তু নিরস্ত হলেন না। এই দলে ছিলেন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন। তাঁদের কাছে নাটকখানি খুব ভাল লাগল। ঠিক হলো বেলগাছিয়া থিয়েটারে শর্মিষ্ঠার অভিনয় হবে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন নিজে নাটকটির জন্য কয়েকটি গান রচনা করলেন। বই লেখা সম্পূর্ণ হলো, রাজারা মাইকেলকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক তো দিলেনই, এমন কি নিজেদের খরচে শর্মিষ্ঠা ছাপিয়ে দিলেন। বাজারে বই বেরুলো—সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহিমান্বিত

আবির্ভাব ঘোষিত হলো। সূচিত হলো বাংলা নাট্যসাহিত্যে দিক্-পরিবর্তন মাইকেল প্রবেশ করলেন বাংলার সাহিত্যজগতে।

'শর্মিষ্ঠা' রচনা করতে মাইকেলের এক মাসেরও কম সময় লেগেছিল। প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শর্মিষ্ঠা বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ নাটক বলে অভিনন্দিত হলো। মেদিনীপুর থেকে রাজনারায়ণ, বালেশ্বর থেকে গৌর বসাক সবাই নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে চিঠি লিখলেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' রাজেন্দ্রলাল মিত্র শর্মিষ্ঠার সমালোচনা করে লিখলেন: "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যে-সকল বাঙ্গালা নাটক এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাধারণজনগণে শর্মিষ্ঠাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিবেন সন্দেহ নাই।" 'ক্যাপটিভ লেডির' মাইকেলকে বাঙালি বিস্মৃত হলো, শর্মিষ্ঠার মাইকেলকে বাঙালি জানালো সমাদর।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর। 'কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী তেজে উজ্জ্বলিত' বেলগাছিয়ার সুরম্য নাট্যশালায় মহাসমারোহে 'শর্মিষ্ঠার' অভিনয় হলো শহরের বহু শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত দর্শকবৃন্দের সমক্ষে। শর্মিষ্ঠা নাটক ও অভিনয়ের সমালোচনায় কলকাতার প্রত্যেকখানা কাগজ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল সেদিন। বাংলার সাহিত্য জগতে মাইকেলের প্রবেশ এমনিভাবেই অভিনন্দিত হয়েছিল, যদিও শর্মিষ্ঠার প্রচ্ছদপত্রে মাইকেল রঘুবংশ থেকে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছিলেন: "মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং।"

ইংরেজি তন্ত্রে দীক্ষিত মধুসূদনকে আমরা খাঁটি বাংলা নাটকের জনক বলতে পারি। তিনিই ইংরেজিনবীস নব্য বাঙালিদের প্রথম নাট্যকার। সমসাময়িক যাত্রাগানের কদর্যতা ও নাটকের তুচ্ছতা দেখেই তিনি নাটক লিখবার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। শর্মিষ্ঠা নাটকের আখ্যানভাগ মহাভারতের আদিপর্ব থেকে নেওয়া। যযাতির উপাখ্যানই এর বক্তব্য। কিন্তু মাইকেল যযাতির উপাখ্যান আগাগোড়া গ্রহণ করেন নি। অনাবশ্যকীয় বিষয় বর্জন করে এবং আবশ্যকীয় বিষয় নাটকোপযোগী করে মাইকেল যথার্থ মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। 'শর্মিষ্ঠা' নাটক সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, আধুনিক বাংলার প্রথম মহাকবি ভারতের আর এক মহাকবির রচনা থেকে বাংলা

নাটকের আদর্শ গ্রহণ করেছেন। শুধু আদর্শ নয়, শর্মিষ্ঠা-নাটকের ঘটনা-সংস্থান এবং স্থানে স্থানে সংলাপেও কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের প্রভাব লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যে প্রাক্‌-মাইকেল যুগে যে সব নাটক রচিত হয়েছে, তুলনা করলে শর্মিষ্ঠাই সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলে প্রতিপন্ন হয়। শেষ দৃশ্যটি অতি নিপুণভাবে পরিকল্পিত। নাটকের প্রধান চরিত্র শর্মিষ্ঠা। মূল মহাভারতে শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর চরিত্র যেভাবে পরিকল্পিত হয়েছে, মাইকেল কোথাও তা ক্ষুণ্ণ করেন নি। শর্মিষ্ঠাতে আঁরিয়েতার ছায়া প্রতিফলিত বলে মনে হয়।

মাইকেল-প্রতিভা উনিশ-শতকীয় রেনেসাঁর একটি উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি। তিনিই এই যুগের বাঙালি জীবনধর্মের সার্থক ও শ্রেষ্ঠ বাণীকার। মহাভারতের প্রখর-স্বভাবা, ঈর্ষাতুরা, রুক্ষভাষিণী শর্মিষ্ঠা মাইকেলের হাতে অপার সৌন্দর্য্য-ময়ীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। দাসীত্বের গ্লানির ভিতর দিয়ে মাইকেল এই সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে তিনি নির্যাতিত নারী-ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহী পূজারী। শুধু সৌন্দর্যের নয়, শর্মিষ্ঠাকে তিনি কল্যাণীত্বের আধার করেও তুলেছেন। উনিশ শতকীয় নবজাগরণের মর্মবাণীকে মাইকেল শর্মিষ্ঠা-চরিত্রের ভেতর দিয়ে অতি সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন—সেদিনের বাংলায় নারী-কেন্দ্রিক পরিবার-জীবনের প্রেমিক বাঙালির ধ্যানের কল্পমূর্তি এই শর্মিষ্ঠা; দাসী হয়েও সহিষ্ণুতায় ও ধৈর্যে তপস্বিনী। অন্যদিকে বঞ্চিতা নারীর মর্মদাহ দেবযানীর ভেতর দিয়ে নাট্যকার এমনভাবে রূপায়িত করে তুলেছেন যে সে-ও আমাদের অনুকম্পাভাজন হয়ে উঠেছে। মাইকেল-প্রতিভা নারী-চরিত্র রচনায় আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। শর্মিষ্ঠাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম জীবন-চিত্রান্বিত ও সু-অবয়বসমৃদ্ধ নাটক।

'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখলেন: "শর্মিষ্ঠা বাংলার নাট্যজগতে নবযুগের সূচক। এই নাটকে মধুসূদন কিছু নূতনত্বের সংযোগ করিয়াছেন। নাটক রচনায় আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তকে প্রধান সংস্কারক বলিতে পারি।"

॥ দশ ॥

বাংলা সাহিত্যে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন মাইকেল।

শর্মিষ্ঠা রচনা করেই বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও মাধুর্য আবিষ্কার করে মাইকেল বিস্মিত হলেন। কালবিলম্ব না করে তিনি নূতন নাটকে হাত দিলেন। ঠিক এই সময়েই পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র মাইকেলের কাছ থেকে একখানি ভালো প্রহসন চেয়ে পাঠালেন। তখনো পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কমেডি-জাতীয় রচনা দেখা দেয় নি। রাজার চিঠি পেয়ে মাইকেল উৎসাহিত হলেন। এই উৎসাহের অবশ্য একটি নেপথ্য কারণও ছিল। সেটি হলো পাইকপাড়ার রাজাদের বদান্যতা। মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে মাইকেল বেশ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। রত্নাবলীর ইংরেজি অনুবাদ ও শর্মিষ্ঠা নাটকের পারিশ্রমিক বাবদ তিনি পাইকপাড়ার রাজাদের কাছ থেকে এক হাজার টাকা পেয়েছিলেন; অধিকন্তু রাজা ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর ব্যক্তিগত দাক্ষিণ্যের দ্বারা সেই সময়ে মাইকেলকে অনেকটা ঋণমুক্ত করেছিলেন। কৃতজ্ঞ মাইকেল তাই রত্নাবলীর ইংরেজি অনুবাদ, শর্মিষ্ঠা নাটক ও তার ইংরেজি অনুবাদ প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন।

রাজার কাছ থেকে অনুরোধ এলো প্রহসন চাই।

এই অনুরোধের ফল—'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'।

নব্য-শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের অধঃপতন এবং প্রাচীন হিন্দু সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা, ভণ্ডামি ও কপটাচার—এই হলো মাইকেলের প্রহসন দুখানির অবলম্বন। নবজাগরণ এখানে তাঁর ভেতর দিয়ে যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। একটি প্রহসন নগরকেন্দ্রিক, অপরটি পল্লীকেন্দ্রিক। নগর ও পল্লীর দুই কেন্দ্রে কাহিনী সংঘটিত হলেও মধুমানস সমকেন্দ্রেই অবস্থিত।

বাংলা সাহিত্যের প্রহসন-বিভাগে মাইকেলের এই প্রহসন দুখানি আজো অগ্রগণ্য। তিনিই বাংলা ভাষায় প্রথম সর্বোৎকৃষ্ট প্রহসন-লেখক। এই

প্রহসন দুখানিও ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের রচনা। "স্বপ্নাকুল জীবন-সৌন্দর্যের রোমান্স-গভীর চিত্রায়ণে যে কবি উচ্ছ্বসিত, অমিত-বাক্, জাতীয় দুর্বলতার বাস্তব চিত্রাঙ্কনে ও ব্যঙ্গাত্মক আঘাত রচনায় তিনিই কত তীব্র, যথাযথ এবং যথোচিত, ভেবে বিস্মিত হতে হয়।" শর্মিষ্ঠায় যত আবেগ, প্রহসন দুটিতে তত বিদ্রূপ ও জ্বালা। শর্মিষ্ঠার প্রকাশে আছে কাব্য ও উচ্ছ্বাস আর প্রহসন দুটির সংলাপে আছে তীব্রতা ও ঔচিত্যবোধ। যে গভীর হাস্যরস বা হিউমার প্রহসন জাতীয় রচনাকে কালোত্তীর্ণ করে, মাইকেলের দুই অঙ্কবিশিষ্ট প্রহসন দুখানিতে তা আছে প্রচুর। জগৎ ও জীবনের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ অথচ ঘৃণা নয়, বিশুদ্ধ কৌতুক অথচ করুণা-মিশ্রিত মনোভাব, প্রচলিত সামাজিকতাকে নীতিহীন বলে নিন্দা করা নয়, বরঞ্চ একটি ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকে তুলে ধরা, মাইকেলের প্রহসনের একটা বিশিষ্ট গুণ। বাঙালির যে চিরন্তন ধর্মপ্রবণতা, মাইকেল তাকে অস্বীকার না করেও উৎকৃষ্ট হিউমার সৃষ্টি করেছেন, যা সমগ্র মধুসাহিত্যেও আর নেই।

মাইকেলই বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন-লেখক। প্রহসনকার হিসাবে রামনারায়ণের দাবী অচল। নাগরিক সভ্যতার আদিরসাত্মক অমার্জিত রুচির মোড় ফিরিয়ে দিলেন মাইকেল। কি ভাষার ব্যবহারে, কি চরিত্র-চিত্রণে, কি রুচির মানদণ্ডে—সব দিক থেকেই তাঁর এই প্রহসন দুটি বাংলা সাহিত্যে একটি প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা'-র বিষয়বস্তু নির্ধারণে মাইকেলের মৌলিকতার দাবী অবিসংবাদিত কিন্তু এর নামের নিহিতার্থ গভীর নয়—উদ্দেশ্যকে নিরাবৃতভাবে এটা প্রকাশ করে দিয়েছে। নাট্যকারের মনোভাব এখানে পরিহাসমুখরতায় উচ্ছল না হয়ে উঠে প্রশ্নবোধক বাক্যে নিঃশেষিত হয়েছে।

'একেই কি বলে সভ্যতা'-র নায়ক নবকুমার। উদ্‌ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও মদ্যপ ইয়ং বেঙ্গলের তিনি প্রতিভূ, জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার পুরোধা ও প্রতিষ্ঠাতা, রাত্রে মাতাল অবস্থায় বয়স্কা ভগিনীকে নির্বিকারচিত্তে চুম্বন করেন, প্রলাপ বকেন, উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করেন; তাঁর মা অস্থির হয়ে উঠলে পিতৃদেব সমস্ত

উপলব্ধি করে, "হায় আমার বংশেও এমন কুলাঙ্গার জন্মেছিল!" বলে আক্ষেপ করেন। এই প্রহসনের প্রতিটি চরিত্রের—কি পুরুষ, কি নারী—একটা বিশিষ্ট ভঙ্গিমা ও স্থান অর্থাৎ স্বকীয়তা আছে; তারা প্রাণরসে সমুচ্ছল, বাস্তবতার পাদপ্রদীপে প্রখরভাবে আলোকিত। নবকুমার ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিনিধি, তৎকালীন সমালোচকগণ এর তীক্ষ্ণতা ও সজীবতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বঙ্কিমের মতো রুচিবাগীশ লোকও লিখেছেন—"*Is this Civilization* is the best in the language." 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় ঈষৎ আত্মপ্রতিফলন আছে।

কিন্তু তুলনাত্মকভাবে মাইকেল দ্বিতীয় প্রহসনেই অধিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'—সে যুগের প্রাচীনপন্থী হিন্দুধর্ম-ধ্বজাধারী, লম্পট, চরিত্রহীন ব্যক্তিদের উপর তীব্র কশাঘাত। প্রহসনখানির প্রথম নাম ছিল 'ভগ্ন শিবমন্দির', পরে মাইকেল এই নাম পরিবর্তন করে বর্তমান নাম রাখেন। বলা বাহুল্য, বর্তমান নামটি প্রথম নামের চেয়ে গভীর ব্যঞ্জনাবহ; প্রচলিত প্রবাদ বচনকে গ্রহণ করে মাইকেল একটা সহজ সত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কাহিনী হিসাবেও দ্বিতীয় প্রহসনখানি সার্থক, প্রথম-খানিতে কাহিনী নেই বললেই চলে। মাইকেল 'The Silvered Rake' নাম দিয়ে এটার একটা ইংরেজি অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তা, তাঁর বহু রচনার মতোই, মধ্য পথেই অসমাপ্ত রয়ে যায়।

'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-র প্রতিটি চরিত্রই আপন মহিমায় আলোকিত, সে চিত্র এত স্বাভাবিক ও উজ্জ্বল যে লেখকের নামোল্লেখ করে না দিলে, এটা যে আদৌ মাইকেলের রচনা সে সন্দেহ কারো মনে জাগে না। আপন ব্যক্তিত্বের এমন নির্লোপ ও নিরস্তিত্ব মাইকেলের অন্য কোনো রচনায় নেই; বিশেষতঃ কবি হিসাবেও তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পুরোধা। সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার এই যে স্বাতন্ত্র্য বা নৈর্ব্যক্তিকতা নাটক হিসাবে (কারণ প্রহসন নাটকই) একে উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেছে। কথা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-কাহিনীর মধ্যে যে ধরণের আন্তরিকতা ও অভিজ্ঞতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, মাইকেলের এই নাটকে যে সমাজ-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এবং কুশীলবের সংলাপে ও আচরণে যে স্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়, তাও ওরই সমগোত্র।

প্রসঙ্গতঃ একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। মাইকেলের কোনো জীবন-চরিতকার বা আধুনিক কোনো সমালোচকই এটির উল্লেখ করেন নি। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" মাইকেলের মৌলিক রচনা নয়। এই প্রহসনের আখ্যানবস্তু মাইকেল নিয়েছেন মোলিয়্যারের *Tartuffe* নাটক থেকে। ফরাসী ভাষায় তারতুফ্ কথাটির অর্থ ভণ্ড। প্রশ্ন হতে পারে ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেল তো ফরাসী ভাষা জানতেন না। কিন্তু ইংরেজিতে মোলিয়্যারের নাটক বহুপূর্বেই অনূদিত হয়েছিল। মাইকেল নিশ্চয়ই তা পড়ে থাকবেন। অবশ্য মাইকেল হুবহু অনুবাদ করেন নি বা অনুকরণও করেন নি। অন্যের ভাব বাংলা ভাষায় চালাবার তাঁর অসীম শক্তি ছিল। তিনি ফরাসী ভাবকে অতি সুন্দরভাবে বাঙালি সমাজের উপযোগী করে দেখিয়েছেন। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' আর তারতুফের আখ্যানবস্তু হচ্ছে দুই ভণ্ডের শাস্তি। তারতুফ্ ও ভক্তপ্রসাদ ধর্মের মুখোস পরে অধর্ম করত। মাইকেল সুদক্ষ শিল্পীর মতো মোলিয়্যারের উপাখ্যানটি আপনার করেছেন; এমন কি নাটকীয় গুণে মাইকেলের সৃষ্টি মোলিয়্যারকে অতিক্রম করে গিয়েছে। এই প্রহসনটির একটিমাত্র ত্রুটি এর অশ্লীলতা।

এইবার প্রহসন দুখানির ভাষার কথা বলবো। যিনি একদিন আলালী ভাষাকে জেলেদের ভাষা বলে বিদ্রূপ করেছিলেন, সেই মাইকেলের কলম দিয়ে বেরুলো আশ্চর্য সাবলীল কথ্য বাক্‌ভঙ্গী। স্ফটিকের মতো সংহত ও স্বচ্ছ আকারে দানা বেঁধে রয়েছে সংলাপের মধ্যে এই প্রহসন দুখানির অন্তর্নিহিত ভাব। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে হানিফ গাজীর বাড়িতে ঢুকে পুঁটি বলছেঃ "থু, থু ! পাতিনেড়ে বেটাদের বাড়িতে আস্‌তেও গা বমি বমি করে। থু, থু, কুঁকড়োর পাখা, প্যাঁজের খোসা। থু, থু। তা করি কি ?" এর অনেক পরে 'নীলদর্পণ' নাটকে দীনবন্ধু আদুরির মুখ দিয়ে অনুরূপ কথা বলিয়েছেন—নিঃসন্দেহে মাইকেল দীনবন্ধুর গুরু। প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতা ভিন্ন এমন সংলাপ রচনা অসম্ভব। আরো একটি কথা। মাইকেলের জীবনীকারদের মতে নারীঘটিত কোনো কলঙ্ক তাঁর চরিত্রে স্পর্শ

করে নি—অথচ 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় বারবিলাসিনীদের যে চিত্র আছে, মাইকেল তা জানলেন কি করে? "দাঁড়া না, বাড়ী যাই আগে। আজ মুড়ো খেঙ্গরা দিয়ে বিষ ঝাড়বো।"—এ-কথার যে বাস্তব রস তা বলে বুঝাবার নয়, এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-য় একজন অশিক্ষিত পল্লীবধূ ফতেমা যখন বলে—'তা ভাই যার যেমন নসিব্। তুই মোকে জওয়ান খসম ছেড়ে একটা বুড়োর কাছে যাতি বলিস, তা সে বুড়ো মলি আমার কি হবে?' তখন আমরা বুঝতে পারি যে, এই একটি কথায় মাইকেল মন-জানার যে যাদুবিদ্যার নিদর্শন দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধুর গুরু হিসাবে তাঁর আসন অটল।

প্রহসন দুখানিতে মাইকেল গদ্য সংলাপের একটি আদর্শরূপ গড়ে তুলেছেন। সংলাপের চরিত্রোচিত ভঙ্গি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চরিত্রোচিত বাগ্ভঙ্গির আরো কৌতুককর, আরো বিচিত্রতর প্রয়োগ আছে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনখানিতে। মাইকেলের সরল, স্বচ্ছ বাগ্ভঙ্গি, চরিত্রোচিত সংলাপ এবং বাস্তব পরিবেশ-সচেতনতা যে-কোনো কালের নাট্যাদর্শ হবার উপযোগী।

মাইকেলের প্রহসন দু'টিতে গদ্যভাষা নিখুঁত কথ্যভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৮৬৬-তেও দীনবন্ধু সেই ভাষাকে অতিক্রম করতে পারেন নি। আদর্শ কথ্যভাষার প্রকৃতরূপ মাইকেলই প্রথম দেখালেন। তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আজ প্রায় এক শতাব্দী পরেও আমরা সভা-সমিতিতে, বক্তৃতায় এর চেয়ে বেশী পরিণত কথ্য ভাষায় কোনো বিষয় আলোচনা করতে পারি না, লেখা তো দূরের কথা। সুতরাং মাইকেলের সৃষ্টি কথ্যভাষা আদর্শ বলে গণ্য হতে বাধা নেই। রবীন্দ্রনাথের আগে গদ্যসাহিত্যে মাইকেলের দক্ষতা আর কেউ প্রয়োগ করতে পারেন নি।

প্রহসনে মাইকেল অপ্রতিরথ। এখানে স্মরণীয় এই যে, মাইকেল এর পূর্বে বাংলা জানতেন না, প্রায় বলতেনও না; বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশের অভিলাষও তাঁর ছিল না—ছিল ইংরেজি ভাষায় মহাকবি হবার অদম্য আশা। হানিফ থেকে আরম্ভ করে বাচস্পতি, নবকুমার ও গ্রাম্য চৌকিদার পর্যন্ত যে ভাষায় কথা বলে, মাইকেল তা অবিকল নকল

করেছেন। সেদিন এই প্রহসন দুখানি অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বহুদিন এদের অভিনয় বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল। সমাজকেও অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই বেলগাছিয়া থিয়েটারে এদের অভিনয় বেশি দিন চলে নি—রাজারাই বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

ভারতচন্দ্র ছিলেন মাইকেলের প্রিয় কবি। শৈশবে জাহ্নবী দেবীর মুখে অন্নদামঙ্গল শুনে অবধি মাইকেল এর রসে মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে কাব্যখানি পাঠ করেছিলেন। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে' রোঁ'-তে ভক্তপ্রসাদ ভারতচন্দ্র থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছে এবং ভারতচন্দ্রের সাহায্যে নাট্যকার কৌশলে আদিরসাত্মকতাকে বেশ দ্রুততালে এগিয়ে দিয়েছেন। মোট কথা, মাইকেলের চিৎপ্রকর্ষের উর্ধ্বায়ন বা সমুন্নতি কালানুক্রমিক হিসাবে সর্বপ্রথম পূর্ণায়তভাবে প্রহসনে প্রকাশিত হয়েছে।

'পদ্মাবতী' মাইকেলের দ্বিতীয় নাটক।

প্রহসন দুইখানি শেষ করবার অব্যবহিত পরেই তিনি এই নাটকে হাত দেন। সুতরাং এরও রচনাকাল ১৮৬০। নাটকখানি নৃত্য-গীতবহুল। সেই হিসাবে 'পদ্মাবতী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম অপেরা। দূরদর্শী মাইকেল বুঝতে পেরেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলার নাট্যশালার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী এবং রঙ্গমঞ্চে নাটকের মাধ্যমে নাচ-গানের প্রচলন হবেই। 'পদ্মাবতী'-তে তিনি তারই সূচনা করে যান। বাংলা থিয়েটারের গিরিশযুগেই মাইকেলের এই প্রত্যাশা সার্থক হয়েছিল। মাইকেল বাংলা লিখতে শুরু করলেন—এটাই সেদিন বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে ছিল একটা বড়ো ঘটনা। সেদিন তাঁকে উৎসাহ দিতে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ, রাজেন্দ্রলাল এবং পাইকপাড়ার রাজাদের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সবাই মাইকেলের মধ্যে একটা বিরাট প্রতিভা দেখতে পেয়েছিলেন এবং সেইজন্যই এঁরা তাঁকে কাব্য, নাটক ইত্যাদি রচনায় উৎসাহ দিতেন। উৎসাহ প্রতিভাস্ফুরণের পক্ষে একটা বড়ো জিনিস। সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিতেন যতীন্দ্রমোহন। এই

প্রসঙ্গে মাইকেলের এক জীবনচরিতকার লিখেছেন : "যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনের প্রত্যেক নাটক ও প্রহসনের প্রথম দুই-এক অঙ্ক পাণ্ডুলিপি অবস্থায় আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া স্বয়ং তাহা পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট লইয়া গিয়া, সমাগত বন্ধুবর্গের নিকট পাঠ করিতেন এবং গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁহাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া মধুসূদনের নিকট পাঠাইতেন। মধুসূদন যতীন্দ্রমোহনের সৎপরামর্শ ও মন্তব্যে প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হইতেন।"

এই উপলক্ষেই মাইকেল মাঝে মাঝে মহারাজার 'মরকত কুঞ্জে' যেতেন এবং সেই মনোরম উদ্যান-বাটিকায় মাইকেলের সাহিত্য-জীবনের অনেকগুলি সন্ধ্যা যাপিত হয়েছে। কবির জীবনে এই মরকতকুঞ্জ আরো একটি কারণে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। বেলগাছিয়া নাট্যশালা থেকে তিনি যেমন একদিন নাটক লিখবার প্রেরণা পেয়েছিলেন, তেমনি মহারাজার মরকত কুঞ্জ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দের ইঙ্গিত। সে-কাহিনী যথা-স্থানে বলব। একখানি নাটক ও দুখানি প্রহসন লিখেই মাইকেল সেদিন বাংলার প্রধান নাট্যকার বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন, এবং নাটক বিষয়ে তাঁর মতামত অনেকেই আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করতেন। যতীন্দ্রমোহনের অনুজ, ঊনবিংশ শতকের বাংলার বিখ্যাত সঙ্গীতরসিক সৌরীন্দ্রমোহন পর্যন্ত এ-বিষয়ে মাইকেলের মতামতকে মূল্যবান মনে করতেন এবং তিনি তাঁর 'মালবিকাগ্নি-মিত্র' নাটকের পাণ্ডুলিপি দেখবার জন্য মাইকেলের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এইভাবেই মাইকেল সেদিন কলকাতার সম্ভ্রান্ত এবং সংস্কৃতি-অনুরাগী সমাজে সমাদর লাভ করেছিলেন। প্রবাস থেকে প্রিয় বন্ধু গৌরবসাক এসব সমাচার পেয়ে আনন্দিত হতেন এবং বন্ধুর গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতেন। মধু বাংলায় লিখছে, লিখে খ্যাতি লাভ করছে—গৌর বসাকের এতেই আনন্দ।

'পদ্মাবতী' গ্রীক পুরাণের একটি সুপরিচিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। নাটকের বিষয়বস্তু—সৌন্দর্যের দ্বন্দ্ব। বিষয়বস্তু বিদেশী হলেও চরিত্রাঙ্কনে এবং কলানৈপুণ্যে মাইকেলের প্রতিভার ছাপ সুপরিস্ফুট। গ্রীক নাটকের ন্যায়

মাইকেলের ‘পদ্মাবতী’ বিয়োগান্ত নাটক। শর্মিষ্ঠা-প্রসঙ্গে মাইকেল একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—“বিদেশ থেকে আমি একটি নেকটাই অথবা একটি ওয়েস্ট-কোট ধার করতে পারি, কিন্তু তাই বলে কি একটি গোটা স্যুট ধার করব?” পদ্মাবতী-প্রসঙ্গে তাঁর এই উক্তিটি সার্থক হয়েছে। এই নাটকখানিকে মাইকেল ভারতীয় পটভূমিতে এমন ভারতীয় পরিচ্ছদে উপস্থিত করেছেন যে, এর গল্পাংশে বিদেশীয়তা কল্পনা করবার উপায় নেই। নাট্যাঙ্গিকে সংস্কৃত আদর্শের ছায়া আছে, সংলাপেও তাই। সর্বোপরি পদ্মাবতী একটি পতিপ্রাণা রোমান্টিক নারীর ভাবমূর্তি হয়ে আছে। ঘটনা-বৈচিত্র্যে পদ্মাবতী শর্মিষ্ঠার চেয়ে ভালো, কিন্তু চরিত্র-চিত্রণে মাইকেল এই নাটকে শর্মিষ্ঠার চেয়ে বেশি নৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি। এখানেও স্ত্রী-চরিত্র চিত্রণে তাঁর দক্ষতা বিস্ময়কর। নাটকখানি মূলতঃ স্ত্রী-চরিত্র প্রধান। পদ্মাবতীতে মাইকেল গদ্য ও পদ্য দু'রকম ভাষাই ব্যবহার করেছেন। তাঁর উদ্ভাবিত অমিত্রচ্ছন্দ এই নাটকেই প্রথম ব্যবহৃত হয়। গ্রন্থরচনার সাত বছর পরে পদ্মাবতীর অভিনয় হয়। মাইকেল তখন সুদূর য়ুরোপে।

মাইকেলের তৃতীয় এবং শ্রেষ্ঠ নাট্য-সৃষ্টি কৃষ্ণকুমারী নাটক।

কৃষ্ণকুমারীর রচনাকাল ১৮৬০। অর্থাৎ মেঘনাদবধ কাব্যের সমসাময়িক। মাইকেল নাটকখানি ঠিক একমাসে লিখে শেষ করেছিলেন। যতীন্দ্রমোহনের অর্থানুকুল্যে নাটকখানি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে। মাইকেল তাঁর এই নাটকখানি উৎসর্গ করেছিলেন তখনকার দিনের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও নাট্য-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে। এই নাটক-রচনার নেপথ্য প্রেরণা ছিলেন তিনিই। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, যাঁকে মাইকেল পরমাত্মীয়ের চেয়েও বেশি মনে করতেন—মাইকেলের এই নাটকখানি দেখে যেতে পারেন নি বলে মাইকেল উৎসর্গ-পত্রে আক্ষেপ করে লিখেছেন: “এই কাব্য বিষয়ে উক্ত রাজা মহাশয় আমাকে যে কতদূর উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িলে ইচ্ছা হয় না যে, আর এ পথের পথিক হই।”

কৃষ্ণকুমারী নাটকের মূল টডের রাজস্থান। ইতিহাস অবলম্বনে বাংলায় নাটক লেখা এই প্রথম। দু'রাত জেগে মাইকেল টডের রাজস্থান পড়ে শেষ করেন এবং এর মধ্যে তিনি নাটকের উপাদান খুঁজে পেলেন। এই নাটকের প্রধান সুর স্বদেশপ্রেম। মাইকেলের অমরকীর্তি মেঘনাদবধ কাব্যেরও মূল সুর তাই। মাইকেলের সমগ্র জীবনের মূল সুরও স্বদেশপ্রেম। মাইকেলের জীবনচরিতকারগণ সকলেই তাঁর খ্রীষ্টান হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং এটা যেন তাঁর পক্ষে একটা মহাপাতকের কাজ, এমন ইঙ্গিতও তাঁরা করেছেন। তাই তাঁদের কেউই মাইকেলের অন্তরের স্বদেশপ্রেমের উত্তাপ অনুভব করেন নি। কবিধর্মের সঙ্গে স্বদেশপ্রেম মিলে তাঁর জীবনকে করে তুলেছে মহিমময়। কৃষ্ণকুমারী নাটকে আমরা তারই প্রথম আভাস পেলাম। নবজাগরণের গতিপথে শিক্ষিত বাঙালির চিত্তে স্বদেশপ্রেমের উন্মেষ সবে মাত্র দেখা দিয়েছে। এই স্বদেশপ্রেমের মর্মবাণীকে আত্মস্থ করে, অনুভব করে কাব্যে প্রথম রূপায়িত করে তুললেন রঙ্গলাল। পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শ এবং সাহিত্যের সংস্পর্শে আসবার ফলে উনিশ শতকের সূচনাকালেই শিক্ষিত বাঙালিসম্প্রদায় এক নূতন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হন। রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যানে তারই মর্মবেদনা প্রথম ধ্বনিত হয়। বাংলার জাতীয়তাবোধের উন্মেষে রাজপুতানার বীরত্বের কাহিনী এবং সেই হিসাবে টডের রাজস্থান বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

'কৃষ্ণকুমারী' বাংলার প্রথম বিষাদান্ত নাটক। উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীকে লাভ করবার জন্য জয়পুরাধিপতি জয়সিংহ এবং মেরুদেশাধিপতি মানসিংহ দুজনেই উদয়পুর আক্রমণে বদ্ধপরিকর হন। এই বিরোধের মূলে ছিল বিলাসবতী—জয়পুররাজের প্রণয়িণী ও রক্ষিতা। ঈর্ষিত ধনদাস বিলাসবতীর প্রতিপত্তিনাশের আকাঙ্ক্ষায় জয়সিংহ-কৃষ্ণকুমারীর পরিণয় সাধনে তৎপর হয়। বিলাসবতী সাধ্বী নয়, কিন্তু জয়সিংহের প্রেম ভিন্ন জীবনে সে আর কিছুই জানে না। তাঁর দুঃসহ আর্তি লক্ষ্য করে বিলাসবতীর সখী মদনিকা উদয়পুরে উপস্থিত হয়ে কৌশলে কৃষ্ণকুমারী ও মানসিংহের প্রণয়াসক্তির সূচনা করে। উদয়পুর তখন মারাঠার আক্রমণে সর্বরিক্ত। পুনরায় যুদ্ধের দায়িত্ব নেবার শক্তি নেই। অথচ মানসিংহের সঙ্গে মারাঠা। এমন অবস্থায় মন্ত্রী রাজ্য রক্ষার একমাত্র উপায় হিসেবে কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যুবিধানের প্রস্তাব করেন।

রাজভ্রাতা বলেন্দ্রসিংহের ওপর ন্যস্ত হলো রাজকীয় কর্তব্য সাধনের দায়িত্ব। স্নেহাতুর খুল্লতাতের বুক ও হাত কেঁপে উঠলো। তখন কৃষ্ণকুমারী দেশের জন্য নিজেই নিজের বক্ষ বিদীর্ণ করে গেল।

টডের রাজস্থানে রাষ্ট্রসংঘাতের যে সম্ভাবনা ছিল, কৃষ্ণকুমারী নাটকে তাকে ছাপিয়ে উঠেছে গার্হস্থ্য জীবন-বেদনা। রোমান্স-সমুজ্জ্বল এই পঞ্চাঙ্ক নাটক-খানিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক এবং ইতিহাসের সত্যতা মাইকেল রক্ষা করেছেন। "বিলাসিনী নারীর মধ্যে পুরাঙ্গনা-দুর্লভ নিষ্ঠা ও তন্মাত্র প্রেমের রূপায়ণে মধুসূদন রেনেসাঁ যুগের সমাজ-বিপ্লবাদর্শকে বাস্তব অভিব্যক্তি দিয়েছেন। মুহূর্তের পদস্খলনের মধ্যেই নারীত্বের প্রাণ-মূল্যকে নির্জিত করে রাখার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে বিলাসবতী যেন একটি মর্মস্পর্শী প্রতিবাদ।" রোমান্টিক কারুণ্যপূর্ণ জীবন-বেদনার চিত্র হিসাবে মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটক তাঁর প্রতিভার অন্যতম সার্থক সৃষ্টি। এই নাটকেই তিনি প্রথম নাট্যরচনায় পাশ্চাত্ত্য রীতিকে অনুসরণ করেন। এই সময়ে তিনি তাঁর অন্যতম বন্ধু রাজনারায়ণকে এক চিঠিতে লিখে জানিয়েছিলেন যে, নাটক রচনায় তিনি সাহিত্যদর্শনকার বিশ্বনাথের বিধান মেনে চলতে প্রস্তুত নন। যদি তিনি বেঁচে থেকে আর নাটক রচনা করেন তা'হলে তিনি আদর্শের জন্য য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদেরই অনুসরণ করবেন এবং তাতেই প্রকৃত জাতীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হবে। বিশ্বপথিক মাইকেলের যোগ্য এই উক্তি। এই নাটকের যা-কিছু ত্রুটি তা'হলো এর কাব্যমণ্ডিত সংলাপ; গদ্য হলেও তা উচ্ছ্বাসপূর্ণ। গিরিশচন্দ্র মাইকেলের কৃষ্ণকুমারীকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি বলে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি স্বয়ং এই নাটকের ভীমসিংহ-চরিত্রে অভিনয় করে তাঁর নট জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দটি মাইকেলের সাহিত্যজীবনের একটি স্মরণীয় বৎসর। এই সময়ে নাট্যকার হিসাবে তিনি প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু দেখা যায়, আর্থিক উন্নতির জন্যও তিনি এই সময়ে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। পুলিশ আদালতের চাকরিতে মাইনে খুব বেশি ছিল না, আর চাকরি হিসেবেও সেটা

এমন কিছু ছিল না। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মাইকেল তাই একটি ভালো চাকরির জন্য সব সময়েই সচেষ্ট ছিলেন। এমন সময়ে একদিন 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় কর্মখালির একটি বিজ্ঞাপন তাঁর চোখে পড়ল। কুচবিহার রাজ্যে একজন ম্যাজিস্ট্রেট দরকার—এই মর্মে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর। মাইকেল ঐ পদটির জন্য প্রার্থী হয়ে একখানি দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলেন। এর তারিখ ২৭শে জানুয়ারি, ১৮৬০। মাইকেলের এই দরখাস্তের পাশে বিদ্যাসাগর স্বহস্তে লিখে দিয়েছিলেন, "একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পাঠাইলাম, দেখিও যেন বাতাসে উড়িয়া না যায়।" বলা বাহুল্য, এ চাকরটিও মাইকেলের ভাগ্যে জোটে নি।

তিনখানি নাটক ও দুখানি প্রহসন অক্লান্তকর্মা মাইকেল এক বছরের মধ্যেই লিখে শেষ করেছিলেন। কিন্তু যে উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে তিনি নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন তার দ্রুত পরিসমাপ্তি ঘটল বেলগাছিয়া থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই। মাইকেল নাটক লেখায় ক্ষান্ত হলেন। রঙ্গালয়কে তিনি দেখেছিলেন বাগান বাড়ির বিলাসিতা হিসাবে নয়, জাতীয় নাট্যশালা হিসাবেই এবং জাতীয় জাগরণের পক্ষে নাট্যশালার প্রয়োজন যে কত, তা মাইকেলই সর্বপ্রথম মনে প্রাণে অনুভব করেন। নাট্যকার হিসাবে তাঁর প্রকৃত মূল্য এইখানেই।

॥ এগার ॥

এইবার কবি মাইকেলের কথা।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে একদিন সন্ধ্যায় বেলগাছিয়ায় মরকতকুঞ্জের সুরম্য উদ্যান বাটিকার সুসজ্জিত হলঘরে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ও মাইকেলের মধ্যে নাটকের ভাষা নিয়ে আলোচনা হয়। সেই আলোচনারই পরিণতি অমিত্রাক্ষর ছন্দ—মাইকেলের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। কথিত আছে, মাইকেল সেদিন সেই সন্ধ্যাবেলাতেই সকলের সামনে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি দু'তিন দিনের মধ্যেই অমিত্রচ্ছন্দে তৈরি কবিতার নমুনা এনে দেখাবেন। এই নাটকীয় তর্কটি আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। প্রসিদ্ধির কারণ, এই তর্কের ভেতর দিয়েই সেদিন বাংলা কাব্যে এসেছিল যুগান্তর। কিন্তু তর্কের অন্তরালের ইতিহাসটুকু আমাদের সর্বাগ্রে জানা দরকার। বাংলার কাব্যরঙ্গ ভূমিতে রঙ্গলালের পরে মাইকেলের প্রবেশ। তবু রঙ্গলালের সঙ্গে মাইকেলের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এই প্রসঙ্গে একজন আধুনিক সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য :

> "রঙ্গলাল উনিশ শতকের নব-উদীয়মান বাঙালি জীবনধর্মকে তাঁর পাণ্ডিত্যের দ্বারা আয়ত্ত করেছিলেন। সেই জ্ঞানমার্গী পরিচয়কে তিনি ছন্দোবদ্ধ করে গেছেন তাঁর নানা কাব্য-কবিতায়। তাই তিনি এই যুগের প্রাণ-চঞ্চল সার্থক কবি নন, স্থিত প্রাজ্ঞ জীবন-দ্রষ্টা। মধুসূদন রঙ্গলালের দেখা জীবনরূপকে নূতন করে আবিষ্কার করেছেন তাঁর সৃষ্টি প্রবাহের মধ্যে। রঙ্গলালের দেখানো পথ বেয়েই মধুসূদনের হাত ধরে আধুনিক কাব্য-সরস্বতী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। মধুসূদন যে জীবন-ধর্মের নির্মাতা, রঙ্গলাল তারই সচেতন পথিকৃৎ।"

মাইকেলের কবি-প্রতিভার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—আত্মপ্রত্যয় আর আত্ম-শক্তির উপরে অবিচল বিশ্বাস। বেলগাছিয়া উদ্যান বাটিকায় মহারাজের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে মাইকেল এই আত্মপ্রত্যয় আর আত্মশক্তির উপর তাঁর বিশ্বাসেরই পরিচয় দিয়েছিলেন। উদ্‌ভ্রান্ত যৌবনের দিগন্ত প্রসারী ধূমকেতু-

লীলা যেমন আমরা প্রত্যক্ষ করি তাঁর কবি-মানসের বহিরঙ্গে, তেমনি এও আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, মাইকেলের কবি-মানস সতত উদ্ভাসিত হয়েছিল উদ্দেশ্য সাধনের প্রত্যয়ালোকে। মাইকেল আত্মসচেতন কবি। তাঁর কাব্য-সাধনার আজন্ম প্রেরণা এসেছে যৌবনোচ্ছ্বসিত আত্মসচেতনতা থেকে, কিন্তু তাঁর কবিসিদ্ধির উৎস উৎসারিত হয়েছিল কবিমানসের অবচেতনা থেকেই।

বেলগাছিয়া থেকে চিৎপুর—সারাটা পথ মাইকেল ভাবতে ভাবতে আসছেন। আজ তাঁর কল্পনা উত্তেজিত। বাড়ি এলেন। টেবিলের ওপর নৈশ আহার প্রস্তুত। স্ত্রী আঁরিয়েতা এগিয়ে এলেন। প্রিয় সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করলেন প্রাণ-প্রতিম স্বামীকে। অন্য দিনের মতো আজ কিন্তু মাইকেল পত্নীর সে সপ্রেম সম্ভাষণে সাড়া দিলেন না। আঁরিয়েতা স্বামীর আচরণের এই ব্যতিক্রম দেখে বিস্মিত। অস্থিরভাবে ঘরের মেঝের ওপর পায়চারি করছেন মাইকেল। আঁরিয়েতা দেখলেন একটা গভীর উত্তেজনায় মাইকেলের সমস্ত সত্তা যেন আলোড়িত হচ্ছে। একটা অব্যক্ত আলোকে উদ্ভাসিত তাঁর মুখখানি। আয়ত চোখ দুইটির দৃষ্টি যেন কোন্ কল্পলোকে। মাইকেল যেন আবিষ্ট—এক নূতন চেতনায় আচ্ছন্ন তাঁর মন। রজনীর নিস্তব্ধ প্রহর। তমসার তীর নয়, উনবিংশ শতকের শহর কলকাতা। বাল্মীকি নন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ব্যাধের শর নয়, ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ আর যতীন্দ্রমোহনের তর্ক। নবজাগরণের প্রবল গতিবেগে আলোড়িত হয়ে উঠল মাইকেলের কল্পনার সমুদ্র। বইয়ের শেলফ থেকে মেঘদূতখানা টেনে নিলেন। মেঘদূত তাঁর প্রিয় গ্রন্থ। দু'একটা পাতা উল্টিয়ে গেলেন। তারপর তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হলো নবযুগের কাব্যবাণী—অমিত্রচ্ছন্দ :

ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন ;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল ;
যেন ঊর্ধ্ববাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগীকুলধ্যেয় যোগী।

মাইকেলের প্রথম কাব্যলক্ষ্মী তিলোত্তমা।

তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের প্রারম্ভিক এই কয়টি পঙক্তিই মাইকেলের নূতন ছন্দের নিদর্শন। বাংলা ভাষায় সৃষ্টি হলো আধুনিক যুগের কবিতা—বাঙালির নবোদ্ভিন্ন জীবন-ভাবনার অবাধ মুক্তিপথ রচনার নূতন ছন্দ। বঙ্গবাণীর বীণার তন্ত্রীতে উঠল নূতন স্বরনির্ঘোষ। বাংলা ভাষাকে আধুনিকতায় দীক্ষা দিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সেই সঙ্গে বাঙালিকেও। রেনেসাঁ সার্থক হলো মাইকেলের উদ্ভাবিত নূতন অমিত্রচ্ছন্দে। মাইকেলের এক জীবনচরিতকার লিখেছেন:

> "তিন-চারি দিনের মধ্যেই মধুসূদন তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গ রচনা করিয়া পাণ্ডুলিপি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে পাঠাইয়া দিলেন। গুণগ্রাহী যতীন্দ্রমোহন কাব্যের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়াই চমৎকৃত হইলেন। কবির রচনা-কৌশল, ছন্দের শিল্প-নৈপুণ্য, কবিতার ভাব ও মাধুর্য দেখিয়া একবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি সাগ্রহে ও সানন্দে কাব্যের পাণ্ডুলিপি পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয়কে দেখাইলেন। সেখানে সাহিত্য-রুচি কয়েকটি বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও উপস্থিত সকলেই উহা পাঠ করিয়া একবাক্যে যতীন্দ্রমোহনের মতের পোষকতা করিলেন, এবং অমিত্রাক্ষর রচনায় মধুসূদনের চেষ্টা যে সম্পূর্ণ ফলবতী হইয়াছে, তিনি যে তাঁহার প্রতিজ্ঞাপালনে পূর্ণরূপে সফল-কাম হইয়াছেন, সকলেই ইহার অনুমোদন করিলেন।"

পাইকপাড়ার প্রশংসা ছড়িয়ে পড়লো কলকাতার বিদগ্ধ সমাজে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক নূতন ছন্দ উদ্ভাবন করেছেন—ক্রমে এই বার্তা সর্বত্র রটে গেল।

ইংরেজি সাহিত্যে মিলটনের প্রতিভা যা পারে নি, বাংলা সাহিত্যে মাইকেলের প্রতিভা আজ সেই অসাধ্য সাধন করল—তিনি উদ্ভাবন করলেন এক নূতন ছন্দ।

উনবিংশ শতকের প্রথম মহাকবির আবির্ভাব ঘোষিত হলো।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম দুই সর্গ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়ে সমগ্র কাব্যখানি প্রকাশিত হলো ১৮৬০-এর মে মাসে। মুখ্যতঃ যাঁর প্রেরণায় এই কাব্যের সৃষ্টি, মাইকেল তাঁরই নামে অর্থাৎ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামে কাব্যখানি উৎসর্গ করলেন। উৎসর্গ-পত্রে কবি লিখলেন:

> "যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেন না, এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন।"

মাইকেল তাঁর এই কাব্যের পাণ্ডুলিপিখানি যতীন্দ্রমোহনকে উপহার দেন। মহারাজা তাঁর সুরম্য উদ্যান ভবন 'মরকতকুঞ্জে' মাইকেলকে সম্বর্ধনা করলেন। মাইকেল এইখানে এসে প্রায়ই মহারাজার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করতেন। কবির এক জীবনচরিতকার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "বিস্তৃত বৈঠকখানায় টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল না। ঢালা-ফরাসের উপর সারি-সারি তাকিয়াশ্রেণী সুসজ্জিত থাকিত। সবুট-পদশোভিত হ্যাট-কোট-পেণ্টালুনধারী মধুসূদন, গৃহদ্বারের নিকটেই একটি তাকিয়া লইয়া, তাহার উপর হেলান দিয়া, অর্ধ-শায়িতাবস্থায় দ্বারের দিকে সবুটপদদ্বয় প্রসারিত করিয়া, সিগারেটের ধূম উদ্গীরণ করিতেন।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মাইকেল একই সময়ে 'একেই কি বলে সভ্যতা' আর 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য রচনা করেছিলেন। আবার সেই একই সময়ে দেখি তিনি ব্যবহারশাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং পুলিশ আদালতের চাকরি করছেন। তাঁর এক বছরের সাহিত্যপ্রয়াস সত্যই বিস্ময়কর—নাটক প্রহসন ও কাব্য—এ সবই তাঁর এক বছরের সাধনার ফল। তাঁর দেহমনের স্বাস্থ্য ছিল অটুট আর সেই সঙ্গে ছিল অসীম আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। অজ্ঞাতবাস থেকে কলকাতায় ফিরে অল্পদিনের মধ্যে

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাধনা করে মাইকেল যেভাবে বাংলা নাটক ও বাংলা কাব্যের গতি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন—তা বাংলার নব-জাগরণের ইতিহাসে আজো একটি প্রকাণ্ড বিস্ময়ের বিষয় হয়ে আছে। জীবন-ব্যাপী অশান্তি ও অতৃপ্তির মধ্যে এমনভাবে বাণীর সাধনা বিরল এবং সেই সাধনায় এমন আশ্চর্য সিদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত আরো বিরল। মাইকেলের প্রতিভা তাঁর জীবিতকালে কি রকম বরণীয় এবং তাঁর রচিত কাব্য ও নাটকাবলী কি রকম সমাদৃত হয়েছিল, সে-কাহিনী তাঁর জীবনেতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। এই প্রসঙ্গে মাইকেলের কাব্যের বিদগ্ধ সমালোচক মোহিত-লাল বলেছেন: "তাঁহার যে আকস্মিক আবির্ভাব এবং তাঁহার কবি-প্রতিভার যে দ্রুত উন্মেষ ও ত্বরিত পরিণতি লক্ষ্য করা যায়, তাহার মত বিস্ময়কর ঘটনা অন্ততঃ আমাদের সাহিত্যে আর নাই। ইংরেজিতে যাহাকে 'man of destiny' বলে, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুসূদনকে তাহাই বলিয়াই মনে হয়।"

বাংলার কাব্যজগতে মাইকেলের আবির্ভাব আর পুরাতন যুগের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু প্রায় সমসাময়িক ঘটনা। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন:

> "বঙ্গসাহিত্য আকাশে মধুসূদন যখন উদিত হইলেন তখন ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভার স্নিগ্ধ জ্যোতি সে আকাশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। কোথায় আমরা গুপ্তকবির রসিকতা ও চিত্তরঞ্জক ভাব সকলের মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম, আর কোথায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধক্ ধক্ করিয়া কী প্রচণ্ড দীপ্তি উদিত হইল।…ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভার রমণীয় কান্তির মধ্যে মধুসূদনের প্রদীপ্ত রশ্মি আসিয়া পড়িল। বঙ্গসাহিত্যের পাঠকগণ আনন্দের সহিত এক নূতন জগতে প্রবেশ করিলেন।"

এই নূতন জগতে প্রবেশ করবার আগে পুরাতন জগতের প্রতি একবার ফিরে তাকান দরকার, তা নইলে আমরা মাইকেলের কবি-প্রতিভার প্রকৃত মূল্য নির্ণয় করতে পারব না। মাইকেল স্বয়ং ঈশ্বর গুপ্তকে কোবিদ্ বলে শ্রদ্ধা

জানিয়েছেন। গুপ্তকবির প্রতিভার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর সাহিত্য-শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই লিখেছেন : "মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙালির কবি—ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙলার কবি।" ঈশ্বরগুপ্তই সর্বপ্রথম কাব্য-সাহিত্যে নিয়ে এলেন একরকম নূতন ভাব। তাঁর সময় থেকেই "বাংলা সাহিত্যে ঢল্ নামিল; স্রোত চলিতে লাগিল, একটা জীবন্ত ভাব আসিল। কেবল পৌরাণিক প্রসঙ্গের নাড়াচাড়া করিয়া সাহিত্য এখন আর সন্তুষ্ট নহে; বাংলার সকল কথাই এখন বাংলা কবিতাতে আলোচিত হইতে লাগিল। কবিতা একটি জীবন্ত পদার্থ হইল। বাঙালির সুখ-দুঃখের সহিত বাংলা কবিতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সকলেই বুঝিতে পারিলেন।"

এই সঙ্গে মাইকেলের জীবন ও সাহিত্য-কর্মকে আমাদের সম্মুখে যদি স্থাপন করি তা'হলে আমরা দেখতে পাই যে, দু'জনেই ঘুমের দেশে কাব্যের ভেতর দিয়ে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে তুলেছিলেন। এক জায়গায় দত্ত-কবি আর গুপ্ত-কবিতে বড়ো সাদৃশ্য। দুজনেরই অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি। দুজনেই তাঁদের কবিতার চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন—দুজনেই প্রতিভাশালী এবং দুজনেই প্রায় আপন আপন সময়ের অগ্রবর্তী। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত—দুজনেরই দেশবাৎসল্য প্রসিদ্ধ। রামমোহন, রামগোপাল ঘোষ, ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পর ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় দেশ-বাৎসল্য ধর্ম গভীরভাবে অভিব্যক্ত হয়েছিল তিনজন কবির রচনায়—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল ও মাইকেল। গুপ্ত কবি মাতৃভাষাকে মাতৃসম জ্ঞান করতেন, মাইকেলও তাই। ঈশ্বরচন্দ্র থেকে যেমন বাংলা কাব্যে নবযুগের সূত্রপাত, মাইকেল থেকেও ঠিক তাই। প্রভাকরের কবিতা পড়বার জন্য লোকে একদিন পাগল হয়ে উঠেছিল, মাইকেলের মেঘনাদ, ব্রজাঙ্গনা তেমনি শিক্ষিত বাঙালিকে মাতিয়ে তুলেছিল। তফাৎ এই যে, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার অনুকরণ বা অনুসরণকারীর অভাব ছিল না, মাইকেলের ছন্দ সার্থকভাবে আর কোনো কবিই প্রয়োগ করতে পারেন নি।

এ কথা আজ বলবার দিন এসেছে যে,—গুপ্ত-কবির মৃত্যুর পর আমরা ঠিক একটি শতাব্দী অতিক্রম করলাম—বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এমন গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন যে, তাঁকে ভুলবার উপায় নেই। গঙ্গা ও

যমুনার মতো প্রাচীন ও নবীন—বাংলা সাহিত্যের এই দুই ধারার সঙ্গমস্থলে তিনি যেন সেতুর মতো দাঁড়িয়ে আছেন। প্রাচীন বাংলার কাব্যধারায় তিনি একদিকে যেমন শেষ কবি, অন্যদিকে আবার নূতন ধারার প্রথম কবি বা পথ-প্রদর্শক। সমসাময়িক বাংলা ও বাঙালি জাতির সমাজের কথা নিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত যা রচনা করেছেন, বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে তা শ্রেষ্ঠ দান সন্দেহ নেই। সাহিত্যে স্বদেশ ও সমাজপ্রীতি তিনিই প্রথম আনেন।

এই স্বদেশ ও সমাজপ্রীতির দ্বিতীয় কবি রঙ্গলাল।

বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ মাইকেল-বঙ্কিমের যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে যুগান্তর বাংলা দেশে ঘটেছিল, তার ফলে বাংলার কাব্যজগতেও একটা পরিবর্তন আসন্ন হয়ে উঠেছিল। যুগ-পরিবর্তনের ফলে চিরাচরিত ধারার পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমেই এই পরিবর্তন দেখা দিল। এই নূতন ধারার প্রবর্তকদের মধ্যে প্রথম নাম যাঁর তিনি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিক্ষিত বাঙালির কাছে এই রঙ্গলালের পরিচয় আজো সম্পূর্ণ নয়। মাইকেলের জন্মের দু'বছর পরে রঙ্গলালের জন্ম, কিন্তু কবি-কর্মে তিনি মাইকেলের অগ্রজ। রঙ্গলালের প্রতিভাও বহুমুখী ছিল এবং পাণ্ডিত্যও ছিল অসাধারণ। মাইকেলের পূর্বে তিনিই প্রথম বাঙালি কবি, যিনি ইংরেজি ও সংস্কৃত ভিন্ন ছয়টি বিভিন্ন ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন—ওড়িয়া, হিন্দী, তেলেগু, লাতিন, গ্রীক ও ফরাসী। রঙ্গলাল একাধারে কবি ও সাংবাদিক। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যখানি প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর হাত দিয়েই আমরা বাংলা সাহিত্যে প্রথম বীররস পেলাম; তিনিই দেশবাসীকে স্বাধীনতার বাণী শুনিয়ে প্রথম দেশাত্মবোধ প্রচার করেন। এর অনেক পরে বঙ্কিমচন্দ্র। পদ্মিনী উপাখ্যানই বাংলা সাহিত্যের প্রথম আখ্যান-মূলক কাব্য। বাংলা সাহিত্যে কালিদাসের গ্রন্থের প্রথম অনুবাদকও তিনি। তাঁর সময় থেকেই কবিদৃষ্টি প্রসারিত হলো রাজপুতানা, উড়িষ্যা ও বৃহত্তর ভারতবর্ষে। বাংলার কবিতার মুখ নবযুগের দিকে তিনিই প্রথম ফেরালেন।

কাব্য-রঙ্গভূমিতে মাইকেলের প্রবেশের আগে নান্দী গাইলেন রঙ্গলাল। বাংলা কবিতায় নূতনের সংকেত সর্বপ্রথম ধ্বনিত হলো তাঁর পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যে। এই কাব্যে শিক্ষিত বাঙালি আপনার এক গাঢ় অনুভূতিকে মূর্ত দেখে উল্লসিত হয়ে উঠল। এই অনুভূতি হলো জাতীয়তাবোধ। পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শ ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সংস্পর্শেই এর বিকাশ।

এই নবলব্ধ মর্মবেদনাকে বুকে নিয়েই ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার কাব্য-রঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হলেন এক নবীন ভাবুক।

তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

॥ বারো ॥

কবিকে বুঝতে পারলে কবির কাব্য আরো সহজে বোঝা যায়।

মাইকেলের সাহিত্য-জীবন বিস্ময়করভাবে স্বল্পস্থায়ী—পুরো চার বছরও নয়। শর্মিষ্ঠা বেরুলো ১৮৫৮-র আরম্ভে আর ১৮৬০ শেষ হবার আগেই তিনি একে একে লিখলেন দুখানা প্রহসন, আর একখানা নাটক আর তাঁর প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমা সম্ভব'। কাব্য এবং নাটকে মাইকেল তখনই অপ্রতিরথ। প্রাচীনের দল যদিও তখনো পর্যন্ত খ্রীষ্টান মাইকেলের বাংলা রচনাকে যোগ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন, শিক্ষিত বাঙালি তাঁকে একজন অদ্বিতীয় প্রতিভাবান্ লেখক হিসেবে স্বীকৃতি জানিয়েছে। সাহিত্যজগতে শিক্ষানবীসির দিন তাঁর শেষ হলো। এইবার তাঁর জীবনের যজ্ঞকুণ্ড থেকে মহৎ কবিতার স্বর্ণশিখা ঊনবিংশ শতকের আকাশকে স্পর্শ করতে উদ্যত হলো। কিন্তু তার আগে তিলোত্তমার কথা আরো একটু আলোচনা করতে হয়।

বন্ধুদের মধ্যে রাজনারায়ণের মতামতকে মাইকেল গুরুত্ব দিতেন বেশি। হিন্দু কলেজের সহপাঠীদের মধ্যে ইংরেজি ভাষা ও কাব্য সাহিত্যে তিনিই ছিলেন মাইকেলের দ্বিতীয়। রাজনারায়ণ তখন মেদিনীপুরে, তাঁর সঙ্গে মাইকেলের দীর্ঘকাল কোনো পত্রালাপ ছিল না বললেই হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় তিলোত্তমার প্রথম দুই সর্গ পাঠ করে সর্বাগ্রে মাইকেলকে অভিনন্দিত করলেন রাজনারায়ণ। তখনো পর্যন্ত সহপাঠীর ঠিকানা তাঁর অজ্ঞাত; পত্রিকার সম্পাদককেই রাজনারায়ণ একখানি চিঠি লিখে কাব্যখানির প্রশংসা জানালেন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' রাজনারায়ণের লেখা তিলোত্তমার প্রথম দুই সর্গের সমালোচনা পাঠ করে উল্লসিত হয়ে মাইকেল ২৪শে এপ্রিল (১৮৬০) বন্ধুকে এক পত্র লিখলেন। সেই চিঠিতে তিনি লিখলেন :

> "প্রিয় রাজনারায়ণ, আমাদের বন্ধু রাজেন্দ্রলালের কাগজে তোমার দুখানি চিঠি দেখে আমি আর নীরব থাকতে পারলাম না। আমাকে উৎসাহ দেবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ—কারণ তোমাকে এই যুগের

একজন প্রতিনিধিস্থানীয় বলে আমি মনে করি এবং সেই হিসাবে তোমার মতামতের মূল্য অনেক। তোমার মত বিজ্ঞজনের এবং কলকাতার আরো আধ ডজন লোকের প্রশংসায় আমি কাব্যখানির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলাম। তিলোত্তমা গ্রন্থাকারে শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। বইখানি চার সর্গে সমাপ্ত। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন—যাঁর ব্যায়ানুকুল্যে বইটি প্রকাশিত হচ্ছে (কারণ ভালো কবির যে রকম দরিদ্র হওয়া উচিত, আমি সেই রকমই দরিদ্র)—মনে করেন যে চতুর্থ সর্গটিই নাকি সবচেয়ে ভালো। তুমি অবশ্য নিজেই তা শীঘ্র বিচার করবার সুযোগ পাবে। বই তো বেরুবে, কিন্তু তা পাঠ করবে ক'জন ? তুমি কলকাতায় নেই, বড়ো দুঃখের বিষয়। যদি থাকতে তাহলে তোমাকে দিয়ে বইখানা সম্বন্ধে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দেওয়াতাম—সেই বক্তৃতার ফলে নিশ্চয়ই কিছু পাঠক সংগ্রহ করা যেতো।...তুমি বোধ হয় আমার বর্তমান অবস্থা অবগত নও—কাব্যের প্রতি আমার অনুরাগ যদি আন্তরিক না হতো, তা'হলে এই সামান্য চাকরি করে আমি কখনই কাব্য-চর্চা করতাম না। সদর আদালতে একটা ভালো কর্মের আশায় আমি এখন আইনশাস্ত্র পড়ছি। আইন আর কবিতা! আর সেই সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের জন্যে মামলা-মোকদ্দমাতেও জড়িয়ে পড়েছি। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন একটি বলিষ্ঠ হৃদয়—সেইজন্যেই আমি জীবন-সংগ্রামে চিরনির্ভীক।...এইসঙ্গে আমার পরবর্তী কাব্য 'মেঘনাদবধ'এ-র প্রারম্ভিক অংশটুকু তোমাকে পাঠালাম। তোমার নিরপেক্ষ অভিমত অবশ্যই জানাবে। কাব্যরসজ্ঞ জনৈক বন্ধু এটা পাঠ করে বলেছেন—অনবদ্য। ভালো কথা—শ্রীমতী রাধিকার বিরহ নিয়ে কিছু কবিতাও লিখেছি—সেগুলি ছাপা হচ্ছে; বই বেরুলেই তোমাকে একখানা পাঠিয়ে দেবো। ইতি, তোমার পুরাতন বন্ধু—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।"

মেদিনীপুর থেকে রাজনারায়ণ মাইকেলের এই চিঠির উত্তরে লিখলেন :
"ভাই মধু, তোমার স্বদেশ এখনো বুঝতে পারল না, তুমি কী একটি রত্ন;

আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা তা জানতে পেরেছি। কবে আমি দেখব মধুসূদনবদনসরোজং।"

তারপর যথাসময়ে তিলোত্তমার এক কপি পেয়ে এবং তা আদ্যন্ত পাঠ করে, এক সুদীর্ঘ সমালোচনা-সম্বলিত পত্রে রাজনারায়ণ মাইকেলকে লিখলেন: "তোমার কাব্য-রচনার চরম পুরস্কার—অমরত্ব।" দীর্ঘদর্শী সমালোচক রাজনারায়ণের এই মন্তব্যটির অভ্রান্ততা আমাদের আজো চমকিত করে। পরে রাজনারায়ণ তৎকালীন অন্যতম প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড'-এ তিলোত্তমার একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা লিখেছিলেন। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাসে নিরপেক্ষ সমালোচক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের যে গৌরব, সেদিন সেই গৌরবের অধিকারী ছিলেন এই রাজনারায়ণ বসু। মাইকেল তাঁর সহপাঠী ও অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু, কিন্তু বন্ধুপ্রীতি সমালোচক রাজনারায়ণের দৃষ্টিকে কোথাও আচ্ছন্ন করে নি। মাইকেলের তিলোত্তমা ও মেঘনাদ বধ কাব্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক আজো রাজনারায়ণ বসু—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তুলনায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনাও এমন গভীর নয়। শুধু সমালোচনা করেই রাজনারায়ণ তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি—বন্ধুকে তিনি কাব্যের নূতন নূতন বিষয়বস্তুরও সন্ধান দিয়েছিলেন। তাঁরই প্রস্তাব অনুসারে মাইকেল 'সিংহলবিজয় কাব্য' নামে একখানা গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু অসমাপ্ত কাব্যের কবি মাইকেল, অন্যান্য বহু রচনার মতো, এটিও শেষ করতে পারেন নি।

রাজনারায়ণের পরেই তিলোত্তমার উল্লেখযোগ্য সমালোচক হিসাবে আমরা দুজনকে পাই—একজন সুপণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং অন্যজন 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক, বাংলার তৎকালীন খ্যাতনামা পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। এঁরা দুজনেই মাইকেলের কবিত্ব-শক্তিকে অভিনন্দিত করেন। যুগের প্রয়োজন তখন দাবী করছে উন্নত কবিতার—মাইকেল লিখলেন সেই কবিতা এবং এই কারণেই তাঁর সমাদর হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার যে, যে মাইকেল হিন্দু কলেজের ছাত্রজীবন থেকে মদের গেলাস ধরে-

ছিলেন, সেই মাইকেল কাব্য-সরস্বতীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণায় স্বেচ্ছায় সেই পানা-সক্তি সাময়িকভাবে ত্যাগ করেছিলেন। 'তিলোত্তমা সম্ভব' প্রকাশের পর বন্ধু রাজনারায়ণকে তিনি এই কথা এক চিঠিতে লিখে জানিয়েছিলেন।

মাইকেল সচেতন শিল্পী। তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের বহু অংশ যে অপরিণত, দুর্বল এবং 'কাঁচা', সে-বিষয়ে তিনি নিজেই সচেতন ছিলেন। তাঁর মধ্যে আমরা যুগপৎ পাই কবি ও সমালোচককে। নিজের রচনা সম্পর্কে মাইকেল ছিলেন অত্যন্ত নির্মম সমালোচক। তাই তিলোত্তমার দ্বিতীয় সংস্করণ যখন মুদ্রিত হয় তখন এক পত্রে তিনি রাজনারায়ণকে লিখছেন: "নিরপেক্ষ সত্য কথা বলতে, তিলোত্তমার ছন্দ অত্যন্ত কাঁচা। আমি এর আমূল সংস্কার করে এই অপ্সরীকে এক নূতন রূপ দেব।" এইভাবে তাঁর কাব্যকলা শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠত।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন: "মাইকেলের তিলোত্তমা সম্ভব প্রকাশ হইতে আমরা নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব।" এই নূতনত্ব কি, এই-বার আমরা তা বিচার করে দেখব। এই কাব্যের কাহিনী হিন্দুপুরাণের সুন্দ ও উপসুন্দের উপাখ্যান থেকে সংগৃহীত। এই কাহিনী অতি পরিচিত। কাব্যের নামকরণে কবি ভারতের মহাকবি কালিদাসকেই অনুসরণ করেছেন। বলা বাহুল্য, কাব্যে মাইকেল আগাগোড়া পৌরাণিক ঘটনার অনুসরণ করেন নি; অনেক স্থানই তাঁর স্বকপোল কল্পিত, আবার অনেক জায়গা অন্যান্য কাব্যের ছায়াপাতে গঠিত। "দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার ন্যায় মধুসূদনও অন্যান্য কাব্য হইতে তিল তিল রূপে তাঁহার কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।" তিলোত্তমার ভাষা ও ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ বটে কিন্তু ভাষার প্রসাদগুণ তেমন নেই আর, "পুঞ্জীকৃত অলঙ্কারের সমাবেশে ইহার ভাব অনেক স্থানে দুর্বোধ্য।" সবচেয়ে লক্ষণীয় এই যে এই কাব্যে human interest কোথাও খুব উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে নি। কবি নূতন ছন্দ আবিষ্কার করেছেন বটে, কিন্তু ভাষা তখনও তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে নি। কবি নিজেই তাঁর প্রথম কাব্যের এই ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং য়ুরোপে থাকতে তিনি কাব্যখানি আমূল সংশোধনে হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ করে যেতে পারেন নি। মাইকেল তাঁর এই প্রথম কাব্যখানির একটি ইংরেজি অনুবাদও আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু সে-অনুবাদও অসমাপ্ত।

'জাতীয়' অর্থাৎ *national* কথাটি মাইকেলের অতি প্রিয়। প্রথম জীবনে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে তিনি জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্ন দেখেছিলেন ; কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে তিনি চেয়েছিলেন *national poetry* সৃষ্টি করতে এবং এর উপকরণের জন্য তিনি প্রতীচ্য পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার কাব্যের প্রতি তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু দুর্লভ জ্ঞান-তপস্যাই মাইকেলের কবি-কর্মের একমাত্র সম্বল নয়—তা যদি হতো তাহলে "বাঙালি জীবনধর্মের রুদ্ধ উৎসের মুক্তিবিধান তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভব হতো না।" খ্রীষ্টান মাইকেল স্বভাব-বাঙালি ; স্বভাব-ভারতীয়। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ কবিদের প্রতি আকৃষ্ট হলেও ভারতের ব্যাস—বাল্মীকি—কালিদাসকে এবং বাংলার কাশীরাম ও কৃত্তিবাসকে তিনি অনাদর তো করেনই নি, বরং এঁরাই আছেন তাঁর সৃজন-কর্মের মূলে। ব্যক্তি-মধুসূদনকে অতিক্রম করে কবি-মধুসূদন বলতে পেরে-ছিলেন—"I love the grand mythology of my ancestors. It is full of poetry"—এবং এই স্বীকৃতির মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি যে, কাব্যের ক্ষেত্রে মাইকেলের পাশ্চাত্ত্য-প্রীতিকে ছাপিয়ে উঠেছে স্বদেশের ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ। মাইকেলের মধ্যে সব সময়ই দুটি সত্তা বিদ্যমান—একটি তাঁর ব্যক্তি-সত্তা, অপরটি কবি-সত্তা। তাঁর মানস-চেতনার এই হলো পৃথক বিচিত্র দুটি দিক। এই দুয়ের সর্বাঙ্গীন সমন্বয়ের পরিণয়ে রূপান্তরিত হয়েছে মাইকেলের কবি-স্বভাব। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের জীবনসাধনার পথ বেয়ে উনিশ শতকের বাংলায় যে রেনেসাঁর লক্ষণ সূচিত হয়েছিল, তার এক প্রান্তে ছিল প্রতীচ্য জ্ঞানলোকের প্রত্যয়দীপ্ত নব আলোকোদ্ভাস, আর অপর প্রান্তে শাশ্বত বাঙালি জীবনধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ও বিশ্বাস। উনিশ শতকের বাঙলার কাব্য-সাহিত্যে মাইকেল ছিলেন সেই "জ্ঞানপ্রত্যয় ও উপলব্ধি-বিশ্বাসের সম্মিলিত পূত প্রবাহের প্রথম উদ্গাতা ভগীরথ।"

মাইকেলের কবি-চেতনার মূলে ভারতীয় ধর্ম যত বেশি না আছে তার চেয়ে বেশি আছে বাঙালি জীবনবোধ। তাঁর কাব্যসৃষ্টির অমরতার মূলে আছে এরই প্রণোদনা। এই জিনিস তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে। উনিশ শতকের রেনেসাঁয় এই জীবনবোধ সেদিন রূপ নিয়েছিল নারী-ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায়। এই নৈতিক বিপ্লবের সূচনা রামমোহন

৮

থেকেই। মাইকেল তাঁর জন্মলগ্নেই এই জীবনবোধের আস্বাদ পেয়েছিলেন—স্বাতন্ত্র্যমর্যাদাময়ী নারীর স্তবগান তাঁর কাব্যেই তাই প্রথম ঝঙ্কৃত হলো। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য সেদিন বাংলা দেশে এই নূতনত্বের বার্তাই বহন করে নিয়ে এসেছিল। এই প্রসঙ্গে মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের একটি উক্তি স্মরণীয়: "All Bengal felt that a new light had dawned on the horizon of the nation's literature, that a genius of the first magnitnde had appeared." রেনেসাঁকে সার্থক করে তোলার জন্য, উজ্জ্বল করে তোলার জন্য সেদিন এই আলোকেরই প্রয়োজন ছিল।

তিলোত্তমায় যার উন্মেষ, মেঘনাদবধ কাব্যে তারই পরিপূর্ণ বিকাশ।

॥ তেরো ॥

রাজনারায়ণকে চিঠি লিখছেন মাইকেল :

"প্রিয় রাজ,···তিলোত্তমা ভালই কাটছে ; প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত-প্রায়। অমিত্রচ্ছন্দ সম্বন্ধে গোঁড়া পণ্ডিতেরা ধীরে ধীরে এখন তাঁদের সুর বদলাতে আরম্ভ করেছেন। সোমপ্রকাশের সমালোচনা খুবই উৎসাহজনক। ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে রণজিৎ সিংহ যেমন বলতেন, 'সব লাল হো যায়েগা'—আমিও তেমনি তোমাকে বলে রাখছি—'সব blank হো যায়েগা।' গতকাল সন্ধ্যায় রঙ্গলালের সঙ্গে পয়ার ও অমিত্রচ্ছন্দ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তার মত এই যে—এই ছন্দ খুব মহৎ। কিন্তু বাঙালির অনেক দিন লাগবে এই ছন্দ গ্রহণ করতে এবং ইংরেজি কাব্যের রস যারা আস্বাদন করে নি, তাদের পক্ষে এই ছন্দ উপভোগ করা কঠিন। আমি রঙ্গলালকে বললাম, কবে এই ছন্দ জনপ্রিয় হবে সে-বিষয়ে আমি বিন্দুমাত্র চিন্তা করি না।···মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গ কপি করে পাঠালাম। লোক পাই নি বলে এতদিন কপি করতে পারি নি—তবুও অনেক বর্ণাশুদ্ধি থেকে গেল। তুমি ঠিক করে নিও। বহু স্থানেই হোমারের অনুকৃতি দেখতে পাবে। তবে যতদূর পেরেছি ভারতীয় রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। তোমার কাছে আমার গোপন করবার কিছু নেই ; কাজেই আমি যদি বলি, আমার অন্তরের সঙ্গে আমি বিশ্বাস করি যে, আমার এই কাব্য সত্যিই *splendid* হবে, তাহলে তুমি যেন আমাকে দাম্ভিক মনে করো না। তোমার অভিমতের আমি খুব মূল্য দিই। তাই আমাদের নাটকে অমিত্রচ্ছন্দের প্রয়োগ সম্পর্কে তোমার বিস্তারিত অভিমত অতি অবশ্য আমাকে জানাবে। আশা করি দুর্গাপূজার ছুটিতে কলকাতায় আসছ। ইতি তোমাদের স্নেহধন্য মাইকেল এম. এস. দত্ত।"

এই চিঠিখানা থেকে দেখা যাচ্ছে মাইকেল তখন মেঘনাদবধ কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন; তাঁর পূর্ববর্তী কবি রঙ্গলালের সঙ্গে নূতন ছন্দ নিয়ে তাঁর আলোচনা হয়েছে এবং প্রাচীনের দল যাঁরা প্রথমে এই ছন্দের প্রতি বিরূপ ছিলেন, তাঁরা মত পরিবর্তন করেছেন এবং তাঁদেরই মুখপত্র 'সোমপ্রকাশ' মাইকেলের এই ছন্দকে জানিয়েছে স্বীকৃতি। মাইকেলের সাহিত্যজীবনের দুইটি পর্ব। প্রথম পর্বে শর্মিষ্ঠা, তিলোত্তমা, পদ্মাবতী আর দুখানা প্রহসন; দ্বিতীয় পর্বে মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা আর কৃষ্ণকুমারী নাটক। কৃষ্ণকুমারীর কথা আগেই বলেছি, এখন আমাদের আলোচনার বিষয় মাইকেলের সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্বের অনুপম কাব্যসৃষ্টি মেঘনাদবধ কাব্য। এই-ই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি। গ্যেটের যেমন 'ফাউস্ট', মিলটনের যেমন 'প্যারাডাইস লস্ট', শেলির যেমন 'প্রমিথিউস', শেক্সপিয়রের যেমন 'হ্যামলেট'—মাইকেলের তেমনি 'মেঘনাদবধ কাব্য'। এই কাব্যই তাঁকে মহত্তের স্বর্গে পৌঁছে দিয়েছে আবার এই কাব্যই তাঁকে দিয়েছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অমরতা। আজকের বিদগ্ধ বাঙালির চিন্তা-ভাবনায় মাইকেল আর মেঘনাদবধ কাব্য—এই কথা দুটি একত্র সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে।

জীবন ও জগৎকে বাদ দিয়ে কাব্য-সাহিত্যের স্থায়ি কোনো মূল্য নেই। মেঘনাদবধ কাব্য এই মানদণ্ডে বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে একটা স্থায়ি মূল্য, একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা পেয়েছে। কাব্যানুরাগী বন্ধুদের কাছে লেখা মাইকেলের নানা পত্রে ও তাঁর কোনো কোনো কবিতার মধ্যে কাব্য ও কবির প্রসঙ্গ আছে। মাইকেলের কাব্যতত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটনের পক্ষে তাঁর এই চিঠিগুলি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। এইসব পত্রে মাইকেল কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধে যা বলেছেন তা নিজের কবিজীবনের প্রসঙ্গেই বলেছেন। তাঁর কাব্যকথা প্রকৃতপক্ষে তাঁর কবিজীবনের আত্মকথা। এই সম্পর্কে তাঁর পত্রগুচ্ছগুলি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি এক নূতন ও মহৎ কাব্য সৃষ্টি করে নিজের ও জাতির গৌরব বৃদ্ধি করতে উদ্বুদ্ধ এবং আরো দেখি যে, তিনি প্রেরণা ও পরিশ্রম দুইয়ের উপরেই নির্ভরশীল। এইসব পত্রে সাধনা ও পরিশ্রমের কথা আছে আর অলৌকিক প্রতিভার প্রয়োজনীয়তার কথাও আছে। একটি কি দুটি করে সর্গ লেখা হয়, আর মাইকেল রাজ-

নারায়ণকে একখানা করে চিঠি লেখেন। লেখেন, "বন্ধু, শব্দ আসছে, ছন্দ আসছে, কিন্তু কোথা থেকে আসছে তা বুঝতে পারছি না, অথচ কাব্যের আখ্যানবিন্যাসে যে বিশেষ নৈপুণ্যের দরকার, তা বুঝতে পারছি—যদি পারো, এই রহস্যের সমাধান করো।"

আমরা জানি, এক মহৎ ও অভিনব কাব্য সৃষ্টি এবং বিপুল কবিযশ, এই ছিল মাইকেলের আকাঙ্ক্ষা। জানি, সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি ছিলেন বীতশ্রদ্ধ। জানি, মাইকেল শিক্ষিতজনের কবি, প্রাকৃতজনের প্রতি উদাসীন। মাইকেলের আত্মপ্রত্যয় সীমাহীন। কাব্যসংসারে প্যারাডাইস লস্ট আর মেঘনাদবধ কাব্য—দুটিই স্মরণীয় সৃষ্টি। মিলটনের ছন্দ নূতন ছিল না, কিন্তু মাইকেলের ছন্দ নূতন। বাংলায় অমিত্রচ্ছন্দের তিনি প্রথম কবি। তাঁর ভাষাও বহুলাংশে সমসাময়িক কাব্যের ভাষা থেকে ভিন্ন। আখ্যান-ভাগে দেখি তিনি রামায়ণের মূল কাহিনীকে ইচ্ছানুসারে পরিবর্তন করে নিয়েছেন। তাঁর কাব্য রাক্ষসকুলের দুঃখ নিয়ে। মেঘনাদবধ কাব্য রাবণ ও তার সংসারের কাহিনী। এর আরম্ভ রাবণের দুঃখ নিয়ে—এর সমাপ্তিও রাবণের দুঃখে। ছন্দে ও আখ্যানে মাইকেলের কাব্য এক অভিনব সৃষ্টি এবং এই কাব্যের কবির যথার্থ ই বলবার অধিকার আছে :—"I altered the mind of men and the colours of things ; there was nothing I said or did that did not make people wonder—এবং এ-কথা মিথ্যা নয় যে, বাংলা সাহিত্যে অসম্ভবকে সম্ভব করার দুর্মদ সাধনাই মাইকেলের সারা জীবনের সাধনা। মাইকেলের কাব্যরচনার ইতিহাস এক বৃহৎ সাহিত্যিক দায়িত্বের ইতিহাস। তাঁর কাব্য মানুষের কথা—সর্ব-কালের ও সর্বদেশের মানুষ। সে মানুষকে কোনো বিশেষ ধর্ম বা দর্শনের পরিবেশে দেখবার প্রয়োজন হয় না। মেঘনাদবধ কাব্যের শ্রেষ্ঠতা এইখানেই। এই কাব্যেই উনিশ শতকীয় রেনেসাঁ একটা সার্থক রূপ পরিগ্রহ করেছে।

রাজনারায়ণ প্রভৃতি বন্ধুদের সঙ্গে এই কাব্যখানি সম্পর্কে মাইকেল চিঠি-পত্রের মাধ্যমে যত কথা বলেছেন, তার থেকে বুঝতে পারি যে, কবি তাঁর কাব্যের অভিনবত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন, কিন্তু এমন একখানি মহৎ কাব্য—মাইকেলের ভাষায় *splendid*—রচনায় যে দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন, তা

মাইকেলের জীবনে আমরা দেখতে পাই না। মেঘনাদবধ কাব্যের ইতিহাস মাত্র তিন বছরের প্রয়াসের কথা। তবু বলবো, এর আবির্ভাব আকস্মিক নয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে কবি বহু পরিশ্রম করেছেন, বহু চিন্তা করেছেন। সেই চন্তা ও পরিশ্রমের কাহিনী আছে মাইকেলের পত্রাবলীতে। এই কাহিনীতে আছে যেমন তীব্র উৎসাহের কথা, তেমন আছে ব্যস্ততা ও উৎকণ্ঠার কথা। প্রকৃত প্রস্তাবে এ এক নূতন সাহিত্যের জন্মকথা। মাইকেলের সাহিত্য-সম্পর্কিত সব চিঠিগুলির মূল বক্তব্য—কি লিখবেন আর কিভাবে লিখবেন।

কাব্য সম্বন্ধে মাইকেলের প্রথম যুক্তিপূর্ণ উক্তি কাব্যের ভাষা নিয়ে। ২৪শে এপ্রিল, ১৮৬০, কলকাতা থেকে মাইকেল রাজনারায়ণকে লিখছেন :

> "তুমি মনে করো আমার স্টাইলটা খুব কঠিন, কিন্তু, বিশ্বাস করো, কাব্যের এই নূতন যুগে অন্যান্য নিস্ফলা লেখকদের মতো বাগাড়ম্বর বিস্তার করবার চেষ্টা আমি আদৌ করি না। শব্দগুলি সবই অনায়াস চেষ্টাপ্রসূত—প্রেরণার পথ বেয়েই নদীর জলস্রোতের মতো তারা আসে। ভালো অমিত্রচ্ছন্দ একটু গম্ভীর নাদবিশিষ্ট হবেই এবং ইংরেজি সাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন সবচেয়ে কঠিনতম কবি অর্থাৎ প্রবীণ জন মিলটন। আর ভার্জিল ও হোমার তো রীতিমতো দুর্বোধ্য। সে কথা থাক। কোনো কবিরই প্রথম প্রয়াস দোষশূন্য নয়—তাই তার প্রথম সৃষ্টিকে একটু ক্ষমার চক্ষেই দেখতে হয়। তুমি জানো আমি এ জিনিস একরকম বাজি ফেলেই লিখতে আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি, আমি এমন একটা কিছু রচনা করেছি যা আমাদের জাতীয় কাব্যকে উন্নত স্তরে নিয়ে যাবে এবং যা ভবিষ্যৎ কবিদেরও পথ প্রদর্শক হবে—যাতে করে তারা কৃষ্ণনগর-রাজসভা কবি অপেক্ষা একটি স্বতন্ত্র ও মার্জিত সুরে কবিতা লিখতে পারবে।"

মাইকেল যখন এই চিঠিখানা লেখেন তখন 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' পত্রিকায় তাঁর 'তিলোত্তমা'র প্রথম দুটি সর্গমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই চিঠিতে তিনি

ভারতচন্দ্রকে অশ্লীল কাব্যরীতির জনক বলেছেন যদিও তিনি ভারতচন্দ্রকে প্রতিভাবান কবি বলে স্বীকার করেছেন। এই কথা কয়টির মধ্যে কাব্য ও কাব্যের বিবর্তনের একটি বিশেষ তত্ত্ব পরিস্ফুট। প্রথম, এখানে মাইকেল প্রেরণা বা স্বাভাবিক প্রতিভার উল্লেখ করছেন। ছন্দ এক প্রেরণার ফল—নদীর জলের মতো স্বাভাবিক গতিতে এ প্রবাহিত হয়। দ্বিতীয়, কাব্যের রসাস্বাদনে অধিকারের প্রয়োজন। মাইকেলের ধারণা, সহৃদয় ও শিক্ষিত এবং মার্জিত-রুচিসম্পন্ন পাঠক ভিন্ন কাব্যের রস আস্বাদনে অধিকার অন্য কারো হতে পারে না। অবারিতমুখ পাত্রে রস এনে কবি কখনো পাঠকের মুখে ধরেন না. বিচিত্র রসাভিমুখী ইঙ্গিত থাকে কাব্যে। সহৃদয় পাঠক সেই ইঙ্গিতের সূত্র ধরেই রসলোকে উত্তীর্ণ হন। তৃতীয়, মহৎ কাব্য এক বিবর্তনের ভেতর দিয়ে আবির্ভূত হয়। সাহিত্যের নূতন যুগের প্রথম কাব্য দোষশূন্য হবে, এ অসম্ভব। চতুর্থ, জাতীয় সাহিত্যের এক নবপর্যায়ে যিনি কাব্যসংসারে নূতন পথ দেখাবেন, তাঁর প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করতেই হবে। এখানে দেখি তাঁর গভীর দায়িত্ববোধ। পঞ্চম, নূতন যুগের প্রথম কবি পুরাতন কবিকে গ্রহণ করতে পারেন না। পুরাতন কবির প্রতিভা শ্রদ্ধার বস্তু, কিন্তু সে প্রতিভার প্রভাব অশ্রদ্ধেয় ও বর্জনীয়। ভারতচন্দ্রের কাব্য সুন্দর কিন্তু, মাইকেলের মতে, সেই কাব্যের প্রভাব কুৎসিত।

আর একখানি চিঠিতেও দেখি মাইকেল এক নূতন সাহিত্য সৃষ্টির পরিকল্পনায় মগ্ন। তখন তিলোত্তমা প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষিত রুচিসম্পন্ন পাঠকের সমালোচনা শুনবার জন্য কবি উদ্‌গ্রীব। তিনি অপেক্ষা করছেন তাঁর কাব্য সম্বন্ধে কে কি বলে। এও নূতন যুগের প্রথম কবির গভীর দায়িত্ববোধের এক লক্ষণ। রাজনারায়ণকে মাইকেল লিখলেন: "আমি তোমার বন্ধু বলে আমাকে যেন রেহাই দিও না—যতদূর পারো সমালোচনা করবে, বন্ধু বলে খাতির করবে না। অবশ্য সেই সঙ্গে যতদূর পারো সুখ্যাতিও করতে বিস্মৃত হয়ো না।" যুগপৎ এই বিনয় ও দম্ভ—এই আপাতবিরুদ্ধ দুই ভাব মাইকেল-চরিত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। মহৎ প্রতিভার আত্মপ্রত্যয় ও আত্ম-সম্বিতের প্রকাশের ধারাই এই রকম। রঙ্গলালের ছন্দ তাঁর কাছে কৃত্রিম ও অপাঙ্‌ক্তেয়। তিনি রঙ্গলালের চাইতে বড়ো কবি। কিন্তু রঙ্গলাল তিলোত্তমা

পড়ে ছন্দোবিন্যাস শিখবে, এই বিশ্বাস মাইকেলের কাছে প্রীতিকর। তাই তিনি লিখছেন: "আমার মতে তার কবিত্বের অনুভূতি আছে, আবার কেউ মনে করেন কল্পনা শক্তিও আছে কিন্তু রঙ্গলালের কাব্যশৈলী অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। তিলোত্তমা রঙ্গলালের মনের ওপর ছাপ ফেলেছে—হয়তো সে উন্নতি করতে পারে।" রঙ্গলাল সম্বন্ধে মাইকেলের এই সমালোচনা দম্ভশূন্য, ঈর্ষাশূন্য। এর প্রত্যেকটি কথা এক চিন্তাশীল কবির নির্দেশবাণী বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। মাইকেলের প্রধান কথা এক নূতন সাহিত্যসৃষ্টির কথা। রাজনারায়ণকে তিনি আবার লিখছেন:

> "তুমি এমনভাবে সমালোচনা করবে—সে সমালোচনা নিশ্চয়ই দীর্ঘ হওয়া চাই যাতে করে এই দেশের লোক ন্যায্য ও নিরপেক্ষ সমালোচনায় দীক্ষালাভ করতে পারে। সাহিত্যিক উদ্যমের পথ এখন আমাদের দেশে কি বিরাট ভাবেই না প্রশস্ত হয়ে গেছে। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর যেন আমাকে সময় দেন। কবিতা, নাটক, সমালোচনা, রোমান্স—এসবের জন্য নূতন শাস্ত্র রচনা করতে হবে আমাদের।"

মনে রাখতে হবে, এই কথা মাইকেল বলছেন তাঁর বন্ধুকে। নূতন কবিতার এক নূতন অলঙ্কারশাস্ত্র চাই—এক নূতন সমালোচনা চাই। এ কবিতা উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহীর সৃষ্টি নয়—যুগ-সচেতন এবং কল্পনাসমৃদ্ধ এক বিরাট মনের সৃষ্টি। মাইকেল তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণকেই সমালোচকের কঠিন দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করছেন। সে সমালোচনা কঠোর হলেও কবি ক্ষুণ্ণ হবেন না। প্রসঙ্গতঃ মাইকেলের একটি উক্তি বড়ো মূল্যবান। রাজনারায়ণকে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন: "I am not a man to be put out by any amount of adverse criticism" এ কথা মাইকেলই বলতে পারেন।

পরিশেষে ছন্দের কথা। মাইকেলের কাব্যতত্ত্বের প্রধান কথাই হলো তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দ। এ ছন্দ অমিত্র বলে নূতন নয়—এর সব কিছুই নূতন। এ প্রসঙ্গেও তাঁর বক্তব্য স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার। রাজনারায়ণকে এক চিঠিতে তিনি লিখছেন:

"আমাদের ভাষা, উচ্চারণ ও গুণের বিচারে স্বধর্মত্যাগী—অর্থাৎ আমাদের পারিবারিক পুরোহিতের আশীর্বাদের জন্য আমার যতটা আগ্রহ, উৎকর্ষ ও উচ্চারণের প্রতি এই ভাষার আগ্রহও ঠিক ততখানি। তোমার বন্ধুদের কেউ যদি ইংরেজি জানে, তাদের প্যারাডাইস লস্ট পড়তে বলো, তা'হলে তারা বুঝতে পারবে অমিত্রচ্ছন্দ—যে ছন্দে বাংলার এক অখ্যাত কবি এখন কাব্য রচনা করছেন —কি ভাবে পঠিত হয়। বন্ধু, আসল কথা কি জানো, বাংলা দেশে এই ছন্দের প্রচলন নিতান্তই সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তোমার বন্ধুরা যদি ঠিকমত যতি ও বিরাম চিহ্নগুলি অনুসরণ করে পড়তে পারে, তাহলে তারা বুঝতে পারবে যে বাংলা ভাষায় এই হোলো মহত্তম ছন্দ। আমার বলার কথা—পড়, পড়, পড়—ভালো করে অমিত্রচ্ছন্দ পড়। কান যেন এই নূতন ছন্দের সুরে অভ্যস্ত হয়—তখন বুঝতে পারবে এ কী জিনিস।"

এই চিঠিখানির মূল বক্তব্য এই যে, এই নূতন ছন্দের রস গ্রহণ করতে হলে গভীর অনুশীলনের প্রয়োজন। সাধনার দ্বারাই কবির সাধনার ফল উপভোগ করা সম্ভব। এবং সহৃদয় পাঠকের বিচারই কবির সার্থক সহায়। মাইকেল পণ্ডিতদের সমালোচনা তুচ্ছ করলেন, কিন্তু রাজনারায়ণের সমালোচনার প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। রাজনারায়ণের তিলোত্তমা-সমালোচনা পড়ে তিনি লাভবান হয়েছেন। তাই মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ বন্ধুকে পাঠিয়ে তিনি লিখলেন :

"প্রত্যেকটি চিন্তা, প্রত্যেকটি উপমা, প্রত্যেকটি প্রকাশভঙ্গী, এমন কি এর প্রত্যেকটি লাইন, গভীর ভাবে বিচার করে দেখো। এসব এক ঘণ্টার কাজ নয়। আমি বোধ হয় তোমাকে বোঝাতে পেরেছি যে আমি তেমন স্পর্শকাতর লোক নই যে, তার দোষ দেখিয়ে দিলে ক্ষুব্ধ হয়। কোথাও যদি দুর্বল বাক্যপ্রয়োগ, অকবিসুলভ চিন্তা বা অপটু প্রকাশভঙ্গী লক্ষ্য করো, নিশ্চয়ই তা তুমি আমাকে জানাতে কুণ্ঠিত হবে না।"

আমরা স্পষ্টতঃ দেখতে পাচ্ছি যে সমালোচকের বিচারের ওপর মাইকেল

নির্ভরশীল। কেন? "প্রতিভার এক বিশেষ লক্ষণ অপরিমিত আত্মপ্রত্যয় আর গভীর আত্মমুখিতা। বস্তুতঃ মাইকেল যেমন আত্মপ্রত্যয়শীল, তেমন আত্মমুখী।" তা না হলে তিনি এই নূতন ছন্দে কাব্য রচনা করতেন না, রাক্ষসকুলের দুঃখের কাহিনী বাঙালি পাঠক-সমাজের কাছে উপস্থিত করতেন না। মাইকেল যদি গীতিকবি হতেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই এ ভাবে সমালোচকের বিচারের ওপর নির্ভরশীল হতেন না। কিন্তু মাইকেল এক মহান্ জীবনদর্শনের গভীর প্রেরণার দ্বারা প্রবুদ্ধ কবি। এই প্রেরণা রেনেসাঁর জারক রসে জারিত হয়ে তাঁর অন্তরে শত বর্ণের কলাপ বিস্তার করেছিল। সেখানে খ্রীস্টান বা হিন্দুর কোনো প্রশ্ন নেই—মাইকেলের কবিসত্তা আলোচনা কালে এই সত্যটি তাঁর প্রথম জীবন-চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু একেবারেই উপেক্ষা করেছেন। মাইকেলের কবিত্ব বিচারে যোগীন্দ্রনাথ তাই একরকম ব্যর্থ বললেই হয়।

মেঘনাদবধ কাব্যে অসাধারণ কবিপ্রতিভার সাফল্য ও ব্যর্থতা দুই-ই পরিস্ফুট। মহাকবি হিসাবে মাইকেলের ব্যর্থতার দু'টি কারণ দেখতে পাই। প্রথম, তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত কোনো মহৎ ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক চরিত্র অথবা ঘটনা কবি অনুসন্ধান করে পান নি। একটি আদর্শ চরিত্রের অভাবেই মাইকেলের প্রতিভা মহাকাব্যের প্রতিভা হিসাবে সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। দ্বিতীয় কারণ, বাংলার রেনেসাঁর সেই ঊষাকালে নবাবিষ্কৃত বাণীর অরুণচ্ছটায় মুগ্ধ মাইকেল জীবনের বাস্তব সত্য রূপায়ণের ক্ষমতা অর্জন করার আগেই তাঁর কবি-জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়েছিলেন। হোমার বা দান্তের মতো জীবনের সত্য রূপ তিনি তুলে ধরতে পারেন নি। অনুভূতির গভীরতা তাঁর এই কাব্যের নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে বিরল। তবু এ কথা অস্বীকার করবার নয় যে, মাইকেলের মেঘনাদ বাঙালির নবজীবন ও নবযৌবনের প্রতীক। নিঃসন্দেহে তাঁর এই কাব্যসৃষ্টি বাঙালি জাতির এক নূতন জীবনকাব্য। এই কথা কয়টি মনে রেখে এইবার আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের মর্মলোকে প্রবেশ করব।

॥ চৌদ্দ ॥

"—কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেঽস্মিন্‌ পূর্বসূরিভিঃ,
মনৌবজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ ॥"

মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যের এই শ্লোকটি সর্বাগ্রে উচ্চারণ করে আধুনিক বাংলার প্রথম মহাকবি তাঁর মহত্তম কাব্যসৃষ্টি মেঘনাদবধ কাব্য লিখতে আরম্ভ করেন। মেঘনাদবধ কাব্য রচনার একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন মাইকেলের এক আধুনিক জীবনভাষ্যকার। তিনি লিখছেন :

> "লোয়ার চিৎপুর রোডের ছয় নম্বর বাড়ি, বাড়িটা দোতলা; দোতলার একটি কক্ষ। কক্ষটি প্রশস্ত ও সুসজ্জিত—মেঝেতে কার্পেট পাতা; চারিদিকে দেওয়ালের ধারে রাশি রাশি পুস্তক; কতক আলমারিতে সাজানো, কতক স্তূপাকার টেবিলের উপরে, কয়েকখানা আধখোলা; কয়েকখানা এমনভাবে আছে, দেখিলেই মনে হয়, এখনই পঠিত হইতেছিল; দেওয়ালে খানকয়েক চিত্র; দেবতার নয়, প্রাকৃতিক নয়, মানুষের নয়, কয়েকজন বিখ্যাত কবির; মাঝখানে টেবিলে বই, কাগজ, কলম, পেন্সিল, ছুরি, মোমবাতিতে আলো ও বোতলে সুরা; দেওয়ালে একটা গোলাকার ঘড়ি, তাহার কাঁটা দুইটিতে মহাকালের পদধ্বনির প্রতিধ্বনি। রাত্রি এগারোটা; পথে শব্দ নাই, পথিক বিরল, এক-আধখানা ভাড়াটে গাড়ির চাকার শব্দ।
>
> "এক ব্যক্তি ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছেন—বয়স ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ, দোহারা চেহারা; মাথায় চেরা সিঁথি, অঙ্গুলি-সঞ্চালনে এলোমেলো; পায়ে একজোড়া দামী চটি, পরনে ঢিলা পায়জামা; গায়ে রেশমের হাতকাটা ফতুয়ার মত, বুকের বোতাম খোলা; ফাঁক দিয়া সুগঠিত রোমশ বক্ষ, বক্ষঃস্থলের খানিকটা দৃষ্ট হয়; পরিপুষ্ট বাহু দুটিও রোমশ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত পায়চারি করিতে করিতে কাব্য-রচনা করিতেছেন—'মেঘনাদবধ কাব্য'। ঘরের তিন কোণে তিন ব্যক্তি; পরিচ্ছদ ও চেহারায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত

বলিয়াই মনে হয়, কাগজ কলম লইয়া উপবিষ্ট; একজনের কাছে কয়েকখানা সংস্কৃত অভিধান· ·ঘরের চতুর্থ কোণে একটি আবক্ষ মর্মর মূর্তি—মিলটনের।"

কথিত আছে, মাইকেল এইভাবেই সাহিত্য-কম করতেন। বাংলা লেখা তাঁর ভালো আসে না তাই তিনি নিজে লিখতেন না, মুখে মুখে বলে যেতেন, পণ্ডিতেরা লিখে যেতেন। তাঁরা সবাই মাইনে পেতেন এর জন্য। অন্তঃপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত কল্পনার উৎস থেকে নির্গত হতো অমিত্রচ্ছন্দের স্রোতোধারা, সুমিষ্ট ভাবগম্ভীর সুরে মাইকেল তা বলে যেতেন, পণ্ডিতেরা তাই শুনে লিখে যেতেন। পরে এর থেকেই চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি তৈরি হতো; যতি বা বিরাম চিহ্নের ভুল ভ্রান্তি যা থাকতো, মাইকেল সেই সময়ে তার সংশোধন করতেন। যখন সংশোধন করা হতো না, রাজনারায়ণকে তিনি চিঠি লিখে বলে দিতেন "ভুল-ভ্রান্তিগুলো শুধ্রে নিয়ে পড়ো, দেখো অনেক জায়গায় 'শিব' লিখতে 'বিব' লেখা হয়েছে—এসব ভুল, ভ্রান্তি তুমি সহজেই ঠিক করে নিতে পারবে" যে তিনজন পণ্ডিতকে মাইকেল বই লেখার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁদের তিনি মাসিক একটা পারিশ্রমিক দিতেন। অনেক সময় এমনও হয়েছে যে পণ্ডিতদের টাকা সময়মত দিয়ে উঠতে পারেন নি। টাকার অভাব থাকতো বলেই দিতে পারতেন না।

মেঘনাদবধ কাব্যের রচনা সম্পর্কে প্রথমেই আমাদের কয়েকটি তথ্য জেনে রাখা দরকার।

কাব্যখানির রচনা কাল ১৮৬০-৬১। এর পাণ্ডুলিপি প্রথমে পাঠ করেন রাজনারায়ণ। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যখানি দু খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার ব্যয়ভার বহন করেন দিগম্বর মিত্র এবং বইখানি মাইকেল এঁরই নামে উৎসর্গ করেছিলেন। পরে, কবির য়ুরোপ প্রবাসকালে, দিগম্বর মিত্রের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে মাইকেল এই উৎসর্গলিপি কাব্যের তৃতীয় সংস্করণ থেকে প্রত্যাহার করেন। এই মহাকাব্য উপলক্ষেই মাইকেল প্রকাশ্যে সম্বর্ধিত হয়েছিলেন। সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন গুণগ্রাহী কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে। প্রকাশ্যে লেখকের সম্বর্ধনা আধুনিক বাংলা-

সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রথম। কালীপ্রসন্ন সিংহের নিজগৃহে অনুষ্ঠিত এই সম্বর্ধনা সভার তারিখ ১৮৬১, ১২ই ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার। তখন মেঘনাদ-বধের প্রথমখণ্ড মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। মাইকেলের এক জীবনচরিতকার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"সেই সভায় মধুসূদনকে সম্বর্ধনা করিবার উল্লাসে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গৌরদাস বসাক, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেশের তৎকালীন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও সুধীমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার সময় মধুসূদন, বন্ধুবর গৌরদাস বসাক ও তাঁহার সংস্কৃত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নকে সঙ্গে লইয়া, ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহের জোড়াসাঁকোর প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মধুসূদন যাইতে যাইতে শকট মধ্যেই উৎকণ্ঠিত হইয়া পণ্ডিত রামকুমারকে বলিলেন, পণ্ডিত! আমার বড়ই দুর্ভাবনা উপস্থিত হইতেছে। পণ্ডিত উত্তর করিলেন, কিসের দুর্ভাবনা? মধুসূদন বলিলেন, সভায় অভিনন্দনের উত্তর আমাকে বাংলায় দিতে হইবে। বাংলা বলা ত আমার অভ্যাস নাই। পণ্ডিত বলিলেন, উত্তর ত প্রস্তুতই আছে, গুছাইয়া বলিতে পারিলেই হইবে। এইরূপ কথা হইতে হইতে শকট দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। কালীপ্রসন্ন সিংহ অন্যান্য বন্ধুর সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। মধুসূদন শকট হইতে অবতরণ করিবামাত্র কালীপ্রসন্ন তাঁহার পাণিপীড়ন করিয়া তাঁহাকে সভামণ্ডপে লইয়া গেলেন। সভাস্থলে মধুসূদন উপস্থিত হইবামাত্রই সমবেত সুধী-মণ্ডলী তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। মধুসূদন আসন গ্রহণ করিলে, স্বাগত-গীতি হইয়া, সভার কার্য আরম্ভ হইল। কালীপ্রসন্ন প্রথমে অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়া, কবির কণ্ঠে স্বহস্তে মাল্যদাম পরাইয়া দিয়া, হ্যামিল্টন কোম্পানীর নির্মিত একটি রজতময় সুরমা পানপাত্র কবিকে উপহার দিলেন।"

মাইকেল তাঁর সাহিত্য সাধনার চরম পুরস্কার পেলেন।

ঘটনাটি মাইকেলের জীবনে এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভারতচন্দ্র পর্যন্ত রাজা-রাজড়ারাই কবিদের সম্মান করতেন। দেশের বিদ্বদ্‌জন দ্বারা কবির সম্মান এইখান থেকেই শুরু। সাহিত্যজগতে মেঘনাদ-বধ কাব্যের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। উনিশ শতকের বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে পাঁচটি যুগ-ওল্টানো মতো ঘটনা ঘটেছিল। যথা, রামমোহনের চেষ্টা ও আন্দোলনের ফলে সতীদাহ নিবারণ আইন (১৮২৯), বিদ্যাসাগরের চেষ্টা ও আন্দোলনের ফলে বিধবার পুনর্বিবাহ আইন (১৮৫৬); দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক (১৮৬০); মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' কাব্য (১৮৬১) আর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)। মাত্র ছত্রিশ বছরের মধ্যেই এই পাঁচটি ঘটনাকে উপলক্ষ করে বাংলার সাহিত্য ও সমাজজীবনে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল, বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে তা নিঃসন্দেহে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। এই পাঁচটি ঘটনায় যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তার তুলনা নেই। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা বাংলায় সমাজবিপ্লবকে বেগবান করে তুলেছিল; দীনবন্ধুর নীলদর্পণ একটি বিরাট গণ-আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল; মাইকেলের মেঘনাদ নিয়ে এলো এক নূতন কাব্যরীতি ও বলিষ্ঠ জীবনবোধ আর বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী সমকালীন সমস্যাজটিল জীবনের পূর্ণায়ত বাস্তব জিজ্ঞাসা। সেই জিজ্ঞাসার মধ্যেই আমরা প্রথম সন্ধান পেলাম নব উদ্ভূত নারী-ব্যক্তিত্বের সামাজিক-পারিবারিক প্রতিষ্ঠাভূমি। এইভাবেই সেদিন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু, মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা-ভাবনা ও রচনার মাধ্যমেই উনিশ শতকীয় রেনেসাঁ তার সকল বর্ণচ্ছটা নিয়ে ইতিহাসের দিগন্ত উদ্ভাসিত করে দিয়েছিল।

মানপত্রের একস্থানে বলা হয়েছিল :

> "আপনি বাংলা ভাষায় যে অনুপম অশ্রুতপূর্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাংলা

ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাংলা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন।"

এই অভিনন্দনের উত্তরে মাইকেল বাংলায় সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর একটি বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন:

"স্বদেশের উপকার করা মানবজাতির প্রধান ধর্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্যদ্বারা যে এদেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়। তবে গুণানুরাগী আপনারা আমাকে যে এতদূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনাদের সৌজন্য ও সহৃদয়তা।"

কলকাতার সমস্ত কাগজে এই সম্বর্ধনা সভার সংবাদ বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং কলকাতা থেকে সারা বাংলা দেশে মাইকেলের এই সৌভাগ্যলাভের সংবাদ প্রচারিত হতে বেশি বিলম্ব হয় নি। মেদিনীপুরে বসে রাজনারায়ণ এই সংবাদ অবগত হয়ে পরম পুলকিত হলেন। সহপাঠী ও বন্ধুর সৌভাগ্যগর্বে গর্বিত রাজনারায়ণ মেদিনীপুর থেকে ছুটে এলেন কলকাতায়। একদিন দুইজনে অনেকক্ষণ অনেক কথা হলো। পরবর্তী কাহিনী তাঁর আত্মচরিত গ্রন্থে এই ভাবে বর্ণিত হয়েছে:

"সেই দীর্ঘ কথোপকথনের সময় আমি মধুকে বলিলাম যে, আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে, তোমার পরিচ্ছদ ও আহার ইংরাজের মতন হলেও তোমার হৃদয়টা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু। তিনি বলিলেন, তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ, আমি হিন্দু, কিন্তু একটা সমাজ ঘেঁষিয়া না থাকিলে চলে না, সেইজন্য খ্রীষ্টীয় সমাজ ঘেঁষিয়া আছি। বিশেষতঃ যখন খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বন করিয়াছি তখন ঐ সমাজ ঘেঁষিয়া থাকা কর্তব্য। তৎপরে একদিন তিনি আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন ও যেদিন আহার করিব সেইদিন ইজার চাপকান পরিয়া আসিতে বলিলেন। আমি নিরূপিত দিবসে উপস্থিত হইলাম ও দেখিলাম তাঁহার ফরাসী স্ত্রী আমার জন্য অনেক খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেইদিন মাদ্রাজের একটি ফিরিঙ্গী বন্ধুও উপস্থিত

ছিলেন। মধু প্রচুর মদ্যপান করিলেন। কথায় কথায় মধু আমাকে সেইদিন বলিয়াছিলেন, ভবিষ্যৎবংশীয় হিন্দুরা বলিবে যে নারায়ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া মধুসূদন দত্ত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং শ্বেতদ্বীপে গিয়া যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন। বিদায় লইবার সময় তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া ক্রমাগত মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। মধুর যাহা দোষ থাকুক না কেন, কিন্তু হৃদয় একেবারে প্রেম ও স্নেহে পরিপূর্ণ ছিল।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মাইকেল যখন এই কাব্য রচনা করতে আরম্ভ করেন সেই বছর আঁরিয়েতার গর্ভে তাঁর প্রথম পুত্রসন্তান মিলটন দত্তের জন্ম হয়। কবি তাঁর পুত্রের বাংলা নাম রেখেছিলেন মেঘনাদ। মাইকেলের মৃত্যুর দু বছর পরে মিলটন মেঘনাদ দত্তের মৃত্যু হয়।

মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হলো।
সঙ্গে সঙ্গে ভাষার সুপ্ত ক্ষমতা আবিষ্কৃত হলো।
বাংলা কাব্যে ভারতচন্দ্র-ঈশ্বরগুপ্তের দিন শেষ হলো।

কবি কাউপার যেমন পোপ ও ড্রাইডেনের ছন্দনিগড়ে দৃঢ়বদ্ধ ইংরেজি কাব্যে স্বাধীনতা ও ওজস্বিতা এনে দিয়ে ইংরেজি কাব্য সাহিত্যে নবজীবনের পথ প্রশস্ত করেছিলেন, তেমনি মাইকেলের অলৌকিক প্রতিভা ভারতচন্দ্র ও গুপ্তকবির রচিত ছন্দনিগড় থেকে বাংলা কাব্যকে উদ্ধার করে তাতে ওজস্বিতা ঢেলে নবজীবনের সঞ্চার করলো। এই প্রসঙ্গে আরো একটু বলার আছে। আমরা জানি উনিশ শতক বাঙালির নবজাগরণের যুগ। দেবলোক থেকে মানবলোক, ঊর্ধ্বচারিতা থেকে মর্ত্যচারিতায়, দেবমহিমাস্থাপন থেকে মানবতার জয় ঘোষণায় যে সুনিশ্চিত ক্রান্তিলগ্ন সেদিনের বাঙালি উত্তীর্ণ হয়েছিল, তার পেছনে মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রেরণা বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। উনিশ শতক নারীজাগরণের শতক। বাঙালি তার নবজাগরণের প্রথম প্রহরে নারীমহিমা সম্পর্কে সচেতন ও শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠেছিল। প্রমাণ রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। উনিশ শতকের বাংলা কাব্যে নারীবন্দনামূলক

একটি পরিচ্ছন্ন ধারা প্রবাহিত হয়েছিল। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই এর সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। নারীর প্রতি কাব্যপ্রণতি রঙ্গলাল ও মাইকেল থেকেই শুরু। বোধ করি অষ্টাদশ শতকের অবহেলা ও মানবতাবোধের প্রতিক্রিয়াতে নারীর প্রতি আধুনিক কবিদের মনে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত হয়েছিল। রঙ্গলালের পর মাইকেলই প্রথম মহাকাব্যের সরণিতে নারীবন্দনা গাইলেন। মেঘনাদবধ কাব্যের আগাগোড়া সেই বন্দনায় মুখর। এই কাব্যের প্রকৃত মূল্য এইখানেই।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই একখানি কাব্য যাকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা হয়েছে এবং বাংলা দেশের খ্যাতনামা সকল কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক ও মনীষী এই কাব্যখানি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এমন বহু-আলোচিত গ্রন্থ বাংলা দেশে আর নেই এবং এইদিক দিয়ে মাইকেল ছিলেন সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান। বিরূপ সমালোচনাও কম হয় নি। মেঘনাদবধ কাব্যকে লক্ষ্য করেই বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্যারডি রচিত হয়—'ছুছুন্দরীবধ কাব্য'। মেঘনাদবধ কাব্যই প্রথম কাব্য যা পরবর্তি-কালে নাটকে রূপান্তরিত হয়ে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। এ কৃতিত্ব ছিল নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের। মেঘনাদবধ কাব্যের বিশিষ্ট সমালোচকগণের মধ্যে এই কয়টি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যথা—রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রমেশচন্দ্র দত্ত, যোগীন্দ্রনাথ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দীননাথ সান্যাল, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং মোহিতলাল মজুমদার। যেসব পত্র-পত্রিকায় মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল সেগুলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান রিফর্মার, হিন্দু পেট্রিয়ট, ক্যালকাটা রিভিয়ু, বিবিধার্থ সংগ্রহ, বঙ্গদর্শন, সাধারণী, নব্যভারত, সাধনা, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবির য়ুরোপ যাত্রার পূর্বে মেঘনাদবধ কাব্যের দুটি সংস্করণ হয়েছিল। গ্রন্থপ্রকাশের এক বছরের মধ্যেই প্রথম সংকরণের

হাজার কপি বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। মাইকেল নিজে এই সংবাদ এক পত্রে রাজনারায়ণকে জানিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের বাংলা-দেশে নূতন অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত একখানি কবিতার বই এক বছরে এক হাজার কপি বিক্রী হয়েছে। এক বছরের মধ্যে দুইটি সংস্করণ কাব্যের জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক। দ্বিতীয় সংস্করণে ছিল হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত মাইকেলের জীবনী ও মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকা ও আলোচনা। কবির জীবিতকালে এই কাব্যের মোট চারটি সংস্করণ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনা লেখেন ইংরেজিতে এবং তাঁর সুদীর্ঘ সমালোচনাটি ক্যালকাটা রিভিয়ু-তে প্রকাশিত হয়েছিল। সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী লালমোহন ঘোষ মেঘনাদ-বধ কাব্যখানি ইংরেজিতে সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছিলেন। এই মূল্যবান অনুবাদটি আজ পযন্ত অপ্রকাশিত রয়েছে।

বিদ্বান ও পণ্ডিতদের সমালোচনার চেয়ে সাধারণ পাঠকের কাছে এই নূতন কাব্যের কেমন সমাদর হলো, মাইকেলের কাছে তাই ছিল সবচেয়ে বেশি বিবেচনার বিষয়। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একখানি পত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, চীনাবাজারে একদিন সন্ধ্যায় মাইকেল এক মুদীর দোকানে তাঁর কাব্য পঠিত হতে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। সেই মুদীর মুখে যখন তাঁর কাব্যখানি সম্পর্কে মন্তব্য শুনলেন যে, এই কাব্য যে কোনো জাতির গর্বের বিষয় হতে পারে, তখন তিনিও গর্ব বোধ না করে পারেন নি। বাংলা দেশে আর কোনো কাব্য সম্পর্কে এমন সৌভাগ্যের কাহিনী শোনা যায় না। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সমালোচক রাজনারায়ণ বসু। কিন্তু কবি নিজেই ছিলেন তাঁর এই কাব্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক। মোট কথা, সমগ্র বাংলাদেশে মাইকেলের মেঘনাদবধ একখানি বহু পঠিত এবং বহু আলোচিত গ্রন্থ—উনিশতকের শেষ তিন দশকে এই কাব্যখানির প্রচার সবচেয়ে বেশি হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের অন্নদামঙ্গলের জনপ্রিয়তাও মেঘনাদবধ কাব্যের জনপ্রিয়তার কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

কেন? সেই কথাই এইবার আলোচনা করব।

॥ পনর ॥

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশকাল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ।

বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে এই বছরটি চিরকালের মতো চিহ্নিত হয়ে আছে। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম—এই দুটিই মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে একই বছরের ঘটনা। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ তখন অতিক্রান্ত। মহাকালের রথের চাকা আরো দশ বছরের পথ উত্তীর্ণ হয়েছে। তখন অষ্টাদশ শতকের বাংলা প্রবীণদের স্মৃতিতে প্রায় মিলিয়ে এসেছে। এই ষাট বৎসর কালের মধ্যে চেতনার মশাল জ্বালিয়ে যিনি নবজাগরণের উদ্বোধন করেছিলেন, সেই রাজা রামমোহন রায় তখন বেঁচে নেই। আধুনিক বাংলার প্রথম মহাকাব্য প্রকাশিত হবার আটাশ বছর আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। তবে তিনি যে যুগের প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন, মাইকেলের জন্ম সেই যুগের কোলেই। আর এই ষাট বৎসর সময়ের মধ্যে একে একে এসে গিয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর প্রমুখ নবজাগরণের নূতন নেতৃবৃন্দ। এঁদের জীবনের পথ বেয়ে যে নূতন চিন্তাধারার উন্মেষ দেখা দিয়েছিল, তার দ্বারাই বাঙালির মনের মানচিত্র ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করেছে। বাংলা কাব্যে যৌবন-মুক্তির এক স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভাতেই মেঘনাদবধ কাব্যের আবির্ভাব ঘটলো ; যুগের একটি মহত্তম বাণীকে বহন করেই বাঙালির কাছে এলো তার নূতন যুগের প্রথম মহাকবির অনুপম কাব্য-সৃষ্টি। সে বাণী :

নিয়তি লঙ্ঘিতে হবে অলঙ্ঘ্য পৌরুষে।

অষ্টাদশ শতকের দৈবনির্ভর জীবনচেতনাকে তাঁর বলিষ্ঠ চিন্তা দ্বারা সরিয়ে দিয়ে রামমোহন যে নূতন জীবনবোধকে নিয়ে এলেন বাঙালির মানসলোকে, তাকেই উজ্জ্বলতর রূপে ফুটিয়ে তুললো মাইকেলের কাব্যবাণী। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের জীবনপথ বেয়ে আত্মপ্রত্যয়ের যে নূতন ভাবধারা দেশের ওপর দিয়ে প্রবল স্রোতে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল, তারই কল্লোল গান প্রতিধ্বনিত

হলো মাইকেলের এই নূতন কাব্যে। এইখানেই 'মেঘনাদের' ঐতিহাসিক মূল্য এবং এই একটি মাত্র কারণেই মেঘনাদবধ কাব্য বাঙালির মনে সেদিন ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল—কেবলমাত্র শিক্ষিতদের মধ্যে এই কাব্যের অন্তর্নিহিত আবেদন সীমাবদ্ধ ছিল না। চীনাবাজারের দোকানদাররা পর্যন্ত মাইকেলের মেঘনাদকে বাংলার এক নূতন সৃষ্টি বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। এ কথা ঠিক যে, সমসাময়িকদের কাছ থেকে মাইকেল নিন্দা পেয়েছিলেন প্রচুর, খ্যাতি পেয়েছিলেন প্রচুরতর। সেরকম সুখ্যাতি আজকের কোনো কবি আশা তো করতেই পারেন না, এমন কি রবীন্দ্রনাথও পান নি। নবজাগরণের প্রচণ্ড গতিপথে এই কবির আবির্ভাব ও তাঁর কাব্যের সৃষ্টি এবং সেই নবজাগরণের যুগে জীবনের প্রথম জয়গান বাঙালি শুনতে পেলো মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যে—এই তথ্যটি আমাদের সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে।

বিদ্রোহী মাইকেল স্বয়ং-স্বতন্ত্র বাঙালিজীবন-রেনেসাঁর বাণীধর কবি। তিনি য়ুরোপীয় রীতিতে কাব্য রচনা করেছেন, কি প্রাচ্য কাব্যাদর্শকে অনুকরণ করেন নি, মেঘনাদবধ কাব্যের আলোচনার প্রসঙ্গে এই জাতীয় বিচার নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। রামমোহন যেমন তাঁর বিশ্বপরিক্রমণশীল পাণ্ডিত্য দিয়ে যুগের সকল সমস্যাকে বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন এবং একটি সমন্বয়ী-চেতনাকে আমাদের জীবনচেতনায় প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যগ্র ছিলেন, তেমনি মাইকেলেরও বিশ্বপরিক্রমণশীল পাণ্ডিত্য শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্যের প্রথম অঞ্জলি রচনা করেছে তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর বেদীমূলে। বঙ্কিমচন্দ্র মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গে একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন—"But he (Michael) has assimilated and made his own most of the ideas which he has taken"—এই *assimilation*-কেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'স্বী-করণ' এবং এই-ই মেঘনাদবধ কাব্যের বিশ্বচারী ভাব ও রূপকে বাঙালি জীবনধর্মের মূলে স্থাপন করেছে নিবিড়ভাবে। স্বী-করণ বা *assimilation*-এর ভেতর দিয়েই সকল দেশে সকল যুগে রেনেসাঁ সার্থক হয়ে ওঠে।

উনিশ শতকের নবজাগ্রত বাঙালি, বাঙালিস্বভাবের মূলীভূত পারিবারিক জীবন-মূল্যবোধকেই নূতন পরিপ্রেক্ষিতে, নূতন দৃষ্টিতে আবিষ্কার করলো।

পুরাতন শাশ্বতের এই নবায়নই যথার্থ রেনেসাঁর মৌল লক্ষণ। এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একজন আধুনিক লেখকের একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য :

> "মধ্যযুগের বিপর্যয় লগ্নে নারীত্বের অবমাননা ও বিনষ্টিকে উপলক্ষ্য করেই বাংলার সমাজ-জীবনের সকল স্তরে এক চরম অবক্ষয়ের সূচনা ঘটেছিল। উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি সমান আত্মস্থ-চিত্তে বাঙলার সেই স্নেহমমতাতুর শাশ্বত জীবনমূল্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, নারীকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি-মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে—যে নারী আন্তরস্বাতন্ত্র্যে মহীয়সী হয়েও সমাজ-পরিবারের মহৎ মঙ্গল-ব্রতে নিয়ত নিযুক্ত কল্যাণী। মধুসূদন সেই উগ্র একান্ত স্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত কল্যাণ-ঋদ্ধ নব বাঙালি-জীবনের স্বপ্নাকুল জীবন-শিল্পী ; আর মেঘনাদবধ কাব্যে সেই নবজীবন-মূল্যবোধের প্রথম সার্থক প্রকাশ।"

রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর—বাঙালির নবজীবনসাধনার ইতিহাস একান্তভাবেই নারী-কেন্দ্রিক। হিন্দু কলেজের ইয়ং বেঙ্গলের পানাসক্তি ও অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়ার কথাই আমরা সাধারণতঃ উল্লেখ করে থাকি, কিন্তু নারী সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাব যে সহজ সম্ভ্রম-নত ছিল, তথ্যাভিজ্ঞদের আলোচনার মধ্যে তার ঘোষণা বড়ো একটা দেখতে পাই না। মাইকেলের দৃষ্টান্তই উল্লেখ করা যাক। তাঁর সকল জীবন-চরিতকার মাইকেলের পানাসক্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতা বর্ণনায় পঞ্চমুখ, কিন্তু তাঁদের কেউ-ই শিল্পী-মাইকেলের সংযম-সুন্দর মানস স্বভাবের কথা উল্লেখ করেন নি। নারী-সম্বন্ধে মাইকেলের মনোভাব চিরকাল পিউরিটান। তাঁর বাল্যবন্ধু বঙ্কুবিহারী দত্তের সাক্ষ্যে আমরা জানি যে, "he was morally strict"—তখনকার দিনের বড়লোকের একমাত্র পুত্রের পক্ষে এই মনোভাব যথার্থ ই প্রশংসনীয় এবং এই যে সংযত আচরণ, এরই ভেতর দিয়ে ফুটে উঠতো মাইকেলের পুরুষোচিত মর্যাদা। মাইকেল কৃত্তিবাসী রামায়ণের আবাল্য অনুরাগী পাঠক—এ কথা তাঁর জীবনেতিহাসেই আমরা পাই এবং এরই প্রভাবে মেঘনাদবধের প্রতিটি নারী-পুরুষ চরিত্রের মধ্যে মাইকেল এনেছেন সংযম-পূত উদাত্ত কল্যাণ-বুদ্ধি।

এ জিনিস হোমারে নেই। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির জীবন-চেতনা অনেকখানি আত্মস্থ হয়েছে—সেদিনের বাঙালি সামাজিক দায়িত্বের কথা চিন্তা করতে শিখেছে, তাদের হৃদয়ে জেগে উঠেছে স্নেহ-মমতাপূর্ণ মানবধর্ম। সেই জীবনমূল্যবোধকে কাব্যে নিয়ে এলেন মাইকেল।

মেঘনাদবধের মধ্যে আর একটি সুর ধ্বনিত হয়েছে—স্বদেশপ্রীতি।

মাইকেলের স্বদেশপ্রীতিতে কিন্তু ভারতবর্ষ নেই—ভারতভূমিকে তিনি কোনো দিনই মাতৃবুদ্ধিতে ভক্তি করতে পারেন নি—এদিক থেকে ইংলণ্ডের প্রতিই তাঁর অনুরাগ-আকর্ষণ ছিল একান্ত। আবার আমরা দেখেছি, এই মাইকেলই ছাত্রাবস্থায় লিখেছেন :

Oh ! how my heart exalteth while I see,
These future flowers to deek my country's brow,

এই যে পরস্পর-বিরোধী ভাবানুভূতি—এর পেছনে রয়েছে মাইকেলের স্বদেশপ্রেমের সহজ অনুভূতি। উদ্ধৃত কবিতার ওপর স্পষ্টতঃ রয়েছে ডিরোজিওর প্রভাব। একদিকে প্রতীচ্য-প্রীতি অন্যদিকে ডিরোজিওর দেশ-প্রেমাত্মক কবিতা—এই দুয়ের সংমিশ্রণের ফলেই মাইকেলের মধ্যে দেখা দিয়েছিল দেশপ্রেমের একটি অপরূপ ভাবালুতা। মাইকেল যদিও রিচার্ডসনের ছাত্র ছিলেন তথাপি তাঁর মানসগঠনে ডিরোজিওর চিন্তাধারার প্রভাবই বেশি। ডিরোজিওর জীবনেতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর চেতনার মূলে ছিল য়ুরোপীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা-প্রীতির সঙ্গে মাতৃরক্ত-প্রভাবিত ভারত-প্রেম। মাইকেলের চিন্তাধারা একান্তভাবে বাংলা ও বাঙালির সামাজিক নবজাগরণের মুক্তিপথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছে, তাঁর দেশপ্রেম তাই বাংলার সমাজ-মানস ও বাঙালি পারিবারিক জীবন-মাধুর্যে অভিসিঞ্চিত। মাইকেলের প্রতিভাকে প্রয়োজন ও বিধাতৃবিধান হিসেবে দেখতে হবে ; কাব্যে তাঁরই ভেতর দিয়ে বিজ্ঞাপিত হয়েছে বাঙালি-জীবনের জন্য এক নূতন জীবনবোধ। মেঘনাদবধ কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে সেই জীবনবোধ। কাব্যের কাহিনী কৃত্তিবাসের রামায়ণ থেকে গৃহীত।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রামায়ণ-প্রসঙ্গ নিয়ে প্রথম বই লেখেন বিদ্যাসাগর আর প্রথম কাব্য রচনা করেন মাইকেল। প্রাচ্যের এই কাহিনী বর্ণনায় বহু-গ্রন্থপাঠী মাইকেল য়ুরোপের বহু বিখ্যাত কাব্য থেকে নানা উপকরণ আহরণ করে বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তর সৃষ্টি করেন। ইলিয়াড, ডিভাইনা কমেডিয়া, জেরুজালেম ডেলিভার্ড, প্যারাডাইস লস্ট, বাল্মীকির মূল ও কৃত্তিবাসের ভাষা রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালিদাসের কুমারসম্ভব প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বহু কাব্যের ভাব, কল্পনা ও বিষয়বস্তুর সাহায্যে মেঘনাদবধ কাব্যের সৌন্দর্য সাধিত হয়েছে সত্য, কিন্তু তাঁর রাবণ মেঘনাদ বিভীষণ অথবা রাম লক্ষ্মণ সীতা হোমারের প্রায়াম হেক্টর অথবা আগামেনন নেস্টর হেলেন ইউলিসিসের অনুকৃতি হয়ে ওঠে নি। স্বাতন্ত্র্য-দীপ্ত নবীন সমাজমূল্যবোধে উদ্দীপ্ত পারিবারিক জীবনাদর্শই সেদিন বাঙালির গোষ্ঠীচেতনা এবং মাইকেলের কবিচেতনার মধ্যে এক নূতন সমষ্টিবুদ্ধি ব্যাপ্ত করে তুলেছিল। রেনেসাঁর প্রকৃত স্বভাবই এই। মাইকেল নূতন যুগের এক বিদ্রোহী সন্তান। সেদিনের বাংলার আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে গেছে আধুনিকতার মূল উৎস—মানব-বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই মাইকেলকে নিয়ে এলো মানবতার বেদীমূলে। এই মানবশক্তির প্রতীক মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ। পরাজিত রাবণ পরাভবকে স্বীকার করলেন না, সবংশে মরলেন তবু শক্তিহীনতার দুর্বলতা স্বীকার করলেন না। সেই অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মধ্যে বসেও কোনো মতেই হার মানতে চার না। এ দম্ভ নয়, এ পৌরুষ। এই পৌরুষ মন্ত্রই মেঘনাদবধ কাব্যের ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে। আবার এই বীরত্বের সঙ্গে মানবত্ব, দিগ্বিজয়ী শৌর্যের সঙ্গে স্নেহমমতা প্রীতি-বাৎসল্য সমসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। এই দুই কারণেই মেঘনাদবধ কাব্য আবির্ভাবের প্রথম ক্ষণ থেকেই আলোড়ন জাগিয়ে তুলতে পেরেছিল। মাইকেলের রাবণ শক্তির প্রতীক, আর মেঘনাদ সে যুগের নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের স্বর্ণ-চূড় তুঙ্গ-মহিমা।

ইংরেজিতন্ত্রের কবি হলেও মাইকেলের ঐতিহ্যবোধ ছিল প্রখর। অতিক্রান্ত অতীতকে শুধু অনুভব করেই তিনি তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেন নি। তাঁর

ঐতিহাসিক বোধও ছিল তীক্ষ্ণ। এই ঐতিহাসিক বোধ জাতীয় ঐতিহ্যের নিবিড় পরিচয় গ্রহণ করে ক্ষান্ত হয় না—তাকে বৃহত্তর ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেবার প্রেরণা পায়। মাইকেলের ইতিহাস-চেতনার গভীরতা ও ব্যাপকতা দুই-ই তাঁর মনের ও কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ। তিনি জাতীয় ঐতিহ্যকে এক অজ্ঞাত নিগূঢ় পূর্বজন্ম বাসনায় চিরকাল ভালবেসে এসেছেন। তাঁর খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ কিম্বা হিন্দু ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাবের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তাঁর জীবন ও কাব্য অধিকার করেছিল তাঁর শ্যামল জন্মভূমি। বালক বয়সে তিনি রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ, চণ্ডী ইত্যাদি গ্রন্থ পড়েছিলেন। সেগুলি তাঁর মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। কাব্য ও সঙ্গীত, এই ছিল মাইকেলের সব চেয়ে প্রিয়। সেই সঙ্গে তাঁর চিত্তলোকে বিরাট স্থান অধিকার করেছিল কপোতাক্ষের স্বচ্ছ সলিল-বিধৌতা সাগরদাঁড়ি। এই প্রিয় জন্মভূমি, তার নদীতীর, নদীতীরের গ্রামদেউল, ঝুরিনামা বটবৃক্ষ, সন্ধ্যাবেলার জোনাকীজ্বলা গ্রামপ্রান্তর, ভাঙা শিবের মন্দির, নদীতীরের গ্রামবধূ, জ্যোৎস্নারাত্রির আলোয় ঝলমল গ্রামকুটীরগুলি মাইকেলের মনে চিরকাল জাগরূক ছিল। তাই বহু কবির গীতিমুখরিত বনবীথিকায় বিচরণ করলেও এবং জগতের সমস্ত ক্লাসিক কাব্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে আস্বাদন করলেও, মাইকেল ঐতিহ্য-সচেতন বাঙালি কবি ছিলেন। য়ুরোপের অর্ঘ্য অঞ্জলিভরে গ্রহণ করলেও তাঁর জীবনের চিন্তা ছিল জাতীয় কবিতা, জাতীয় নাট্যশালা এবং জাতীয় মহাকাব্য। বিশ্বমুখী মন সত্ত্বেও মাইকেল তারই জন্য ভেবেছেন। তাঁর সেই চিন্তা-ভাবনার পরিণত ফল মেঘনাদবধ কাব্য।

মেঘনাদবধ কাব্যের মূল প্রেরণা কি, রবীন্দ্রনাথ তার একটি চমৎকার বিশ্লেষণ দিয়েছেন ঃ

> "মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা-প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই।…তিনি (মধুসূদন) স্বতঃস্ফূর্ত প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন।…এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য, ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে: ইহার রথ-রথি অশ্বে-গজে পৃথিবী কম্পমান, যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি

শাস্ত্রের বা অস্ত্রের কোন কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে।…যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।"

এই প্রসঙ্গে মোহিতলাল মজুমদারের বিশ্লেষণও সুন্দর। তিনি লিখেছেন:

"এ কাব্যের কবি ইংরেজি-শিক্ষিত, য়ুরোপের মানবতামন্ত্রে দীক্ষিত ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন বাঙালি। বাংলার জলবায়ু ও বাঙালি জাতির রক্তগত সংস্কারের প্রভাবে বাঙালির জীবনে, প্রেম-স্নেহের যে অপূর্ব সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল—মানবতার যে একটি মধুর মোহময় আকুতি ও অনুভূতি একটি বিশেষ আদর্শকে জীবনে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল, এ কাব্যের প্রেরণায় তাহার প্রচুর প্রভাব আছে।"

আগেই বলেছি, মাইকেল সচেতন শিল্পী। অমন যে মেঘনাদবধ কাব্য—যার পরিকল্পনা ও রচনায় তিনি তাঁর সমস্ত প্রতিভা নিয়োগ করেছিলেন বললেই হয়—তাও যে একেবারে ত্রুটিহীন নয়, কবি এ কথা নিজেই বিলক্ষণ জানতেন এবং অকপটে বন্ধুর কাছে এক পত্রে তা ব্যক্ত করে তিনি লিখছেন: "আমি নিশ্চিতভাবেই জানি, মেঘনাদবধ কাব্যখানিতে বহু ত্রুটি আছে। মানুষের সৃষ্টি কোন্ জিনিসের ত্রুটি নেই, বলো? তুমি সেগুলি অবশ্যই আমাকে দেখিয়ে দেবে।" মাইকেলের আত্মপ্রত্যয় সুগভীর ছিল বলেই না তিনি তাঁর রচনা সম্পর্কে এমন কঠিন সমালোচক হতে পেরেছিলেন। তিনি রেনেসাঁ-যুগের কবি এবং সেই কারণে তাঁর দায়িত্ব অনেক বেশি। এই দায়িত্বসচেতনতাই কবি মাইকেলকে করে তুলেছিল সমালোচক।

মহৎ কাব্যমাত্রেরই একটি message বা বাণী থাকে। মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যকে খাঁটি মহাকাব্য বলতে না পারলেও নিঃসন্দেহে একে আমরা একটি মহৎ কাব্য বলতে পারি। এই কাব্যের ভিতর দিয়ে একটিমাত্র বাণীই মাইকেল বাঙালিকে দিয়ে গিয়েছেন। সে বাণীটি হলো এই: সর্ববিধ নিয়তির উপরে ভ্রূক্ষেপহীন আত্মপ্রতিষ্ঠা। এবং একমাত্র রাবণ চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই মাইকেল নবজাগরণের এই মর্মবাণীকে সার্থক ভাষা দিয়েছেন। হোমার বা মিলটন কিংবা শেক্সপিয়ার এখানে তাঁর কবি-মানসের উপর বিন্দু-মাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। ধার করা সৃষ্টি হলে মেঘনাদবধ কাব্য বাঙালির চেতনায় কখনই এতখানি স্থান জুড়ে থাকত না; এ তাঁর নিজের অন্তরের সৃষ্টি। এ নবযুগের জীবনচেতনা। সেই কারণেই এই কাব্যের উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে এমনভাবে চিরকালের মতো রাঙিয়ে দিতে পেরেছে। এই গ্রন্থের সূচনাতেই বলেছি, রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতো যুগনায়কদের প্রবর্তিত নবীন জীবনচেতনা ও মূল্যবোধকে আয়ত্ত করেই উনিশ শতকের ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির সমাজ ও সাহিত্যে আধুনিকতার প্রথম পদক্ষেপ ঘটে। মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণের চরিত্রকে উপলক্ষ করে মাইকেল এই আধুনিক জীবন-বাণী এমন বিচিত্র ভাষায়, এমন একটি নূতন ছন্দে আমাদের শোনালেন, যা আমরা তার পূর্বে কখনো শুনি নি। বীরত্বে ও শৌর্যে, বেদনায় ও মমতায় অভিসিঞ্চিত সেই বাণীর মধ্যেই প্রতিফলিত রেনেসাঁ-যুগের বাঙালির জাতীয় জীবন এবং সেই জীবনের রূপৈশ্বর্য। এই আধুনিকতার সবচেয়ে বড়ো অভিব্যক্তি আছে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রত্যেকটি নারী-চরিত্রের মধ্যে।

আমরা জানি মাইকেলের যুগেও গতানুগতিকতার অন্ধ জীবনাচরণের সীমায় বাতাহত হয়ে ফিরত বাংলার পুরনারীদের জীবন। নিজের মায়ের জীবনেই তিনি এই ট্র্যাজেডি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। রামমোহন সতীদাহ নিবারণ করলেন, বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন ও বহু-বিবাহ বন্ধ করলেন—বাঙালি নারীর ব্যক্তিসত্তা এই কালের মধ্যে অনেকখানি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পেরেছে। তারপর বেথুন-বিদ্যাসাগরের যত্নে নারী-শিক্ষারও প্রচলন তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। তথাপি বাংলার পুরনারীর জীবনের

ব্যর্থতা ও বেদনা ষোল আনা তখনো ঘোচে নি বা বাংলার সাধারণ মেয়েদের অবস্থার শোচনীয়তা তখনো পর্যন্ত সাহিত্যে বা কাব্যে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে নি। এরই জন্য সেদিন প্রয়োজন ছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতো একজন যুগন্ধর কবির। প্রমীলা, মন্দোদরী, চিত্রাঙ্গদা, সীতা ও সরমা—এই কয়টি নারী-চরিত্র চিত্রণে মাইকেল সচেতনভাবেই বাংলার পুরনারীদের স্মরণ করেছেন। গার্হস্থ্য-জীবনের পবিত্রতা এবং অন্যদিকে মুক্তির বুভুক্ষা—সমাজ ও সংসারের বহুবিধ প্রথা ও সংস্কারের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি—কাব্যের প্রত্যেকটি নারী-চরিত্রের মাধ্যমে মাইকেল এই দু'টি বিষয় পাঠকের কাছে এমনভাবে তুলে ধরেছেন—যা ভারতচন্দ্র থেকে রঙ্গলাল কেউ পারেন নি। মেঘনাদবধ কাব্য তাই এক হিসেবে উনিশ শতকের বাঙলার নারী-জীবনের বেদনার কাব্য। অতুলনীয় এবং অদ্বিতীয়।

মেঘনাদবধ কাব্যের জনপ্রিয়তার আরো একটি নিগূঢ় কারণ আছে। আমরা দেখেছি, মাইকেলের স্বরূপ-পরিচয় নিহিত আছে তাঁর জীবনব্যাপী কবি-প্রস্তুতি ও কাব্য-সাধনার ইতিহাসে। তিনি সমস্ত জীবন ধরে নবযুগের শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিনিধি হবার সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। নবযুগের কবিতা সৃষ্টি করবেন তিনি—তাঁর সকল চিন্তা-ভাবনা যেন এই একটি কেন্দ্রবিন্দুতে এসে সংহত হয়েছিল। এই দুশ্চর সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য মাইকেল তো তাঁর জীবনই পণ করেছিলেন। তাই দেখি, তাঁর অপরিমিত ভোগবিলাস, (মাইকেলের ভোগবিলাস সুরা, সুখাদ্য, আর সুবেশ—এই ত্রিসীমানার মধেই আবদ্ধ ছিল), খামখেয়ালি মেজাজ ইত্যাদি বহুবিধ দোষত্রুটিকে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর আত্মপ্রত্যয়। এই আত্মপ্রত্যয় তাঁর কাব্যপ্রতিভা উন্মেষের প্রধান উপাদান। একদিকে বিদ্রোহ ও বন্ধন ছিন্ন করার অনমনীয় দৃঢ় সংকল্প, অন্যদিকে প্রত্যাখ্যাত জীবনের জন্য অশ্রুসজল স্বপ্নকরুণ আর্তি—এই উভয় সুর মাইকেলের জীবন থেকে তাঁর কাব্যে—বিশেষ করে মেঘনাদবধ কাব্যে সংক্রামিত হয়েছে। বিদ্রোহের সববাধা চূর্ণকারী উন্মত্ত আবেগ ও আত্মগ্লানির মর্মদাহী অনির্বাণ তুষানল—এরই দ্বারা গঠিত হয়েছে মাইকেলের

কবি-প্রকৃতি। তাঁর উদ্ধত আত্মতৃপ্তি ও উদ্দাম ভোগবাসনা তাঁর অন্তরকে বিদীর্ণ করে দিয়েছিল—সেই পথ দিয়েই এক শুভক্ষণে কাব্যলক্ষ্মী প্রবেশ করেছিলেন যুগপ্রতিনিধি কবি মাইকেলের অন্তরে। তিনি লাভ করলেন দিব্যদৃষ্টি—তাঁর মানস-আকাশে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল যুগ-চেতনা—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। মাইকেলের কাব্যলোক এই দিব্যচেতনায় অভিষিক্ত।

এইখানে প্রসঙ্গতঃ একটু ইতিহাসের কথা বলতে হয়। রেনেসাঁর একটি বিশেষ বর্ণচ্ছটা হলো স্বাদেশিকতা। যে কোনো দেশের নবজাগরণ এরই ভেতর দিয়ে সার্থক হয়ে থাকে। দীর্ঘকালের ইংরেজ-শাসনে ভারতবর্ষের পরাধীনতার জন্য বাংলা সাহিত্যের বিকাশে একটি সুর বিশেষভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল; সেটি দেশ-জননীর শৃঙ্খলমুক্তির সুর। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় স্বাদেশিকতার সুর প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল। তারপর রঙ্গলালের কবিতায় বাঙালির স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধ আরো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। সাহিত্যে সেই প্রথম সমাজচেতনা ও জাতীয়তাবোধ প্রজ্জ্বলিত হলো। ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশবাৎসল্য ও সমাজপ্রীতির ধারাকে কাব্যে বইয়ে নিয়ে এলেন রঙ্গলাল। বাংলা কাব্যে প্রচলিত পয়ার ছন্দের নূতন প্রাণসঞ্চার করলেন ঈশ্বর গুপ্ত। তিনিই প্রথম নিয়ে এলেন শব্দালঙ্কারের সুষ্ঠু প্রয়োগ। রামায়ণের পয়ারকে তিনি আপন প্রতিভায় অধিকতর শক্তিমান ও বাস্তবধর্মী করে দিলেন—পয়ারের যে কত শক্তি ঈশ্বর গুপ্তই তা প্রথম দেখালেন। রেনেসাঁর প্রথম পর্বে বাংলা কাব্যে ঈশ্বর গুপ্তের এই দান শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়। তারপর যুগ আরো এগিয়ে চললো, নবজাগরণ আরো গতিবেগসম্পন্ন হয়ে উঠল। তখন প্রয়োজন হলো পয়ারের নিগড় ভাঙ্‌বার। বিদ্রোহী ভিন্ন সে অসাধ্য সাধন করবে কে? মাইকেল এই পয়ারকেই রীতিগত আর একটি বৈশিষ্ট্য দান করে বহতা নদীর মতো একে চঞ্চল ও প্রাণবান করে তুললেন। দান্তে ও চসার যেমন কাব্যের ভাষা ও রীতি সৃষ্টি করেছেন, মাইকেলও তেমনি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত রীতিকে বর্জন করে নূতন রীতির প্রবর্তন করেছেন। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সংস্কার আন্দোলন যেমন উনিশ শতকের রেনেসাঁকে একটা প্রচণ্ড গতি প্রদান করেছিল, মাইকেলের উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর ছন্দও

তেমনি সেদিনের নবজাগরণকে দিয়েছিল একটা দুর্বার গতি। আর এই ছন্দের মাধ্যমেই অভিব্যক্ত হয়েছে তাঁর স্বাদেশিকতা। সমাজ-চেতনার বলিষ্ঠ প্রকাশের জন্য সেদিন এই ছন্দের প্রয়োজন ছিল।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ একটি রীতিমতো বিপ্লব।

সমাজে রূপান্তর ঘটেছে—পুরাতন গতানুগতিক সমাজের পুনরাবৃত্তি নয় আবার বহিরাগত নূতন সমাজের সংস্কৃতির হুবহু অনুকরণও নয়—এই সমন্বয় বা বিপ্লব মাইকেল সেদিন নিয়ে এলেন বাংলা কাব্যে এক নূতন ছন্দ প্রবর্তন করে। সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যে বিপ্লব এনে দিয়েছিলেন—কাব্যে তাই-ই নিয়ে এলেন জন্ম-বিদ্রোহী মাইকেল। নবজাগ্রত স্বাদেশিকতা ও সমাজ-চেতনাকে যুগের উপযোগী ভাষায় প্রকাশ করবার জন্যই তাঁকে ভাঙতে হলো পয়ারের শৃঙ্খল। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভিন্ন সেদিন বাংলা কাব্যে তথা বাঙালির জীবনে যৌবন-মুক্তি সার্থক হতো কিনা সন্দেহ। বাংলা ছন্দের নবজন্মের যবনিকা উত্তোলন করলেন মাইকেল মেঘনাদবধ কাব্যে। সেই ছন্দেরই সম্পূর্ণতা ও পরিণতিই শিক্ষিত বাঙালি ও জনসাধারণের চিত্তে এমন আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। যতিস্থাপনের এই যে বৈচিত্র্য, যথেচ্ছ-যতির এই যে উর্মিলতা, ছন্দের এই প্রবহমানতা যে কী অন্তহীন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছিল, তা সেদিন কোনো অনুসন্ধানীর দৃষ্টিগোচর হয় নি। রবীন্দ্রনাথ মিথ্যা বলেন নি—"অপরিচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঘনঘর্ঘরমন্দ্রিত রথে চড়িয়া সেই প্রথম আবির্ভূত হইল আধুনিক কাব্যে 'রাজবদুন্নত ধ্বনি'।" সত্যই, মাইকেলের সমগ্র কবিসত্তা এই নবসঙ্গীতময় ছন্দে ধরা দিয়েছে। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে ততদিন মেঘনাদবধ কাব্যের মেঘনির্ঘোষ বাঙালিকে মুগ্ধ ও সচকিত করবে। কালের নিরবধি প্রবাহের সঙ্গে মিশে আছে বিদ্রোহী মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দের প্রবহমানতা। মিশে আছে বাঙালির জীবন-চেতনায়। বাংলার রেনেসাঁর মহাকাব্য মাইকেলের মেঘনাদবধ। নূতন আঙ্গিক ও নূতন রূপকল্পের প্রতীক এই কাব্য। এই দিয়েই তিনি রচনা করে গিয়েছেন পরবর্তী বংশধরদের জন্য শাশ্বত গভীর জীবনপথ-রেখা।

বলেছি অমিত্রাক্ষর ছন্দ একটি বিপ্লব। এই বিপ্লব শুধু যে ভাষা ছন্দের একটি আমূল পরিবর্তন এনে দিল তা নয় ; এরই ফলে বাংলা সাহিত্যে গুপ্ত-যুগের অবসান এবং ভারতচন্দ্রীয় ভাবধারার অবলুপ্তি সুনিশ্চিত হলো। এই ছন্দ রেনেসাঁকে দিল একটি নূতন বেগ, একটি অনাস্বাদিতপূর্ব আবেগ। ছন্দো-মুক্তির দুশ্চর তপস্যায় মাইকেলের দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের পরিচয় আছে রাজ-নারায়ণকে লেখা একটি পত্রে। কবি লিখছেন ঃ

> "আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবে যখন এদেশের সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন।"

কবির এই ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নি।

বাংলা কাব্যসাহিত্যের বর্তমান রূপৈশ্বর্য তার চূড়ান্ত স্বাক্ষর বহন করছে আজ। মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিপ্লবের জয়ডঙ্কা সর্বপ্রথম বেজে উঠল।

॥ ষোলো ॥

মাইকেলের কবি-কর্মের দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয় প্রয়াস ব্রজাঙ্গনা কাব্য।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবিষ্কর্তার পক্ষে এও এক বিস্ময়কর সৃষ্টি।

বিস্ময়কর হলেও বাংলার কাব্যধারার সঙ্গে অসম্পৃক্ত বা বিচ্ছিন্ন নয়।

স্মরণ করি ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য। শ্রীচৈতন্যের অনুপ্রেরণায় বাংলা সাহিত্য তখন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ভাষাসাহিত্যকে পেছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। কোনো ধর্মপ্রচারক মহাপুরুষ কোনো দেশের বা জাতির সাহিত্যের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত সাহিত্য-সংসারে মাত্র একটিই আছে। তিনি বাংলার শ্রীচৈতন্য। তাঁর সময় থেকেই বাংলা কাব্যসাহিত্যে আমরা একটা বিরাট দিক্-পরিবর্তন লক্ষ্য করি। ডক্টর বিমান বিহারী মজুমদার যথার্থই বলেছেন: "চৈতন্যচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব প্রতিভার কিরণ-সম্পাতে বঙ্গসাহিত্য যে দ্যুতি লালিত্য লাভ করিয়াছে তাহার তুলনা বিশ্ব-সাহিত্যে বিরল।...উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে মেঘনাদবধ মহাকাব্য রচনা করেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিও বৈষ্ণব কবিদের অনুসরণে ব্রজাঙ্গনা কাব্য লিখিয়া প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন।"

মাইকেলের এক জীবনচরিতকার লিখেছেন: "অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মধুসূদনের চিত্ত নিধুবাবু, রামবসু, হরুঠাকুর প্রভৃতি বাংলার প্রাচীন কবিওয়ালাদের রচিত সংগীতের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ টপ্পা-রচয়িতা নিধুবাবুর আদর্শে গীতিকা রচনা করিতে তিনি অভিলাষী হইয়াছিলেন।" কিন্তু ঐ পর্যন্তই। মাইকেলের কবি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য এই যে, তা কিছুতেই রুচিহীনতাকে বরদাস্ত করতে পারত না। কবিওয়ালাদের রচনার মধ্যে তিনি তাই ভোগলালসার কদর্যতা ভিন্ন আর বিশেষ কিছু দেখতে না পেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি গিয়ে পড়ল জয়দেব-বিদ্যাপতির উপর। অপরূপ এক সৌন্দর্যের জগৎ উদ্ভাসিত হলো মহাকাব্য-রচয়িতার দৃষ্টিপথে। বৈষ্ণবের গীতিকবিতার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলো মাইকেলের কবি-চিত্ত। সংকল্প করলেন মনে মনে গীতি-ছন্দে রচনা করবেন একখানা বই।

ঠিক সেই শুভ মুহূর্তে একদিন ভূদেব এলেন মাইকেলের কাছে। বললেন—মধু, তোমার কাব্যে সিংহনাদ শুনেছি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি কি তোমার হাতে বাজতে পারে না? মধুর কোমলকান্ত কবিতা রচনা করতে পার না তুমি?

মহৎ প্রতিভা কি না পারে?

লোককে আশ্চর্যান্বিত করবার সঙ্কল্প নিয়েই তো মাইকেল বাংলা সাহিত্যে হাত দিয়েছিলেন—বাংলা সাহিত্যে অসম্ভবকে সম্ভব করবার দুশ্চর সাধনাই তো তাঁর সারা জীবনের সাধনা। তাই ভূদেবের কথা শুনে, "মধুসূদনের গীতি-কবিতা রচনার অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। বাঙালি-হৃদয়ের কমনীয় উচ্ছ্বাসের প্রখর বেগ তিনি সম্বরণ করিতে পরিলেন না।" তাঁর চিত্ত-তটে উত্তাল জলধিগর্জনের সঙ্গে প্রবাহিত হলো যমুনার মধুর কলধ্বনি—মহাকাব্যের উদাত্ত সঙ্গীতের ধারায় এসে মিশলো বৈষ্ণবপদলহরীর শান্ত সুমধুর ধ্বনি। বহুকাল পরে মধুসূদনের বীণায় বেজে উঠল শ্রীরাধিকার বিরহ-গাথা। সেই গাথা ঝঙ্কৃত হলো ব্রজাঙ্গনায়।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য মাইকেলের কবি-প্রতিভার আর এক নূতন সৃষ্টি।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে যেমন, মিত্রাক্ষরেও তেমনি সরস সুমিষ্ট কবিতার মধু ঢেলে দিলেন মাইকেল।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' আর 'একেই কি বলে সভ্যতা'—কাব্য ও প্রহসন এক সঙ্গে রচনা করে মাইকেল যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন, তার চেয়ে বেশি বিস্ময়কর যুগপৎ মেঘনাদবধ কাব্য ও ব্রজাঙ্গনা কাব্যের রচনা। মেঘনাদবধের নবম সর্গ লিখবার সময়েই মাইকেল এক চিঠিতে লিখছেন:

> "মেঘনাদের পর এইবার বীররসের কবিতাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাব। তাহা নহিলে আমার নূতন কাব্যপ্রয়াস পূর্বেকার অনুভূতিমাত্র হইবে। কিন্তু রোমান্টিক ও গীতিকবিতার প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, এবং আমার মনে হয় আমার কবিমন গীতিধর্মী।"

এই গীতিব্যাকুলতা মাইকেলের কবি-কল্পনায় আকস্মিকভাবে আসে নি। মেঘনাদবধ কার্ব্যের চতুর্থ সর্গ রচনা কালেই তিনি গীতিকবিতায় মাধুর্য প্রথম

অনুভব করেন। প্রকৃতপক্ষে মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গটি যে অপূর্ব লিরিক গুণবিশিষ্ট, সে বিষয়ে মাইকেল নিজেই সচেতন ছিলেন। ব্রজাঙ্গনার রচনা-কাল ১৮৬০। কাব্যটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬১-তে। তখন মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম খণ্ডমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মাইকেলের একখানি পত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিলোত্তমা রচনা-কালেই কবি ব্রজাঙ্গনার প্রথম কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন। অর্থাৎ একই সময়ে মাইকেলের কলম থেকে অমিত্রচ্ছন্দ ও গীতিছন্দ এবং প্রহসন বেরুচ্ছে। মাইকেল তাঁর সকল নাটক ও কাব্যেই কোনো না কোনো সংস্কৃত কবির একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। ব্রজাঙ্গনাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। 'পদাঙ্কদূত' থেকে তিনি ব্রজাঙ্গনা কাব্যে এই শ্লোকাংশ সন্নিবিষ্ট করেছেন: "গোপীভর্তৃবিরহবিধুরা উন্মত্তেব"—এবং এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ব্রজাঙ্গনার মূল সুর—রাধার বিরহের দিব্যোন্মাদ অবস্থা। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নানা মহৎ কাব্য ও মহাকাব্যসঞ্চারী মাইকেলের কবি-মানসে লিরিক-কল্পিত ব্রজাঙ্গনার আবির্ভাব, বাংলা দেশের বাঙালি-ধর্মী ভাবনারই এক উজ্জ্বল অভিব্যক্তি। এই কাব্যের সৌন্দর্য-বিচারে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ প্রবল। এই মতভেদের কারণ তাঁরা বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবরূপের সঙ্গে ব্রজাঙ্গনার তুলনা করতে গিয়ে ইতিহাসকে বিস্মৃত হয়েছেন। ইতিহাসের গতিপথেই সাহিত্যের বিকাশ। "ষোড়শ শতকের জীবন-বাণী ও প্রাণচেতনা উনিশ শতকেও প্রত্যাশা করতে চাওয়া ও ইতিহাসের কালাশ্রিত গতিকে রুদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষাতে কোন পার্থক্য নেই।"

বন্দিনী নারীর বেদনায় উনিশ শতকের রেনেসাঁ উত্তপ্ত—পরিবারে ও সমাজে নারীর স্বাতন্ত্র্য প্রতিপদে উপেক্ষিত। রামমোহন-বিদ্যাসাগর যেমন সেই বেদনাকে, বঞ্চিত নারী-জীবনের সেই আর্তিকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন, শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মাইকেলের কাব্য ও নাটকে সেই অনুভূতি যেন একটা বলিষ্ঠ বাণীমূর্তি নিয়ে আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হলো। ব্রজাঙ্গনার রাধাও প্রমীলা-মন্দোদরী-সীতার মতো পরিবেশ-লাঞ্ছিতা আত্মসচেতন নারী-মানসের বেদনার্তি। তাই মাইকেলের রাধা বৈষ্ণবের রাধা থেকে স্বতন্ত্র। বল্লভ-বঞ্চিতা রাধা আর ভাগ্য-বঞ্চিতা সীতাকে মাইকেল একই তুলিকা-

সম্পাতে চিত্রিত করেছেন। মাইকেলের মন বাঙালির মন; তাঁর কবি-ধর্ম বাঙালি-ধর্মী ভাবনার আশ্রয় আনুকূল্যেই বিকশিত হয়েছে, পরিণতি লাভ করেছে। বহুপাঠী মাইকেলের কবি-চিত্তে প্রাচ্য কি প্রতীচ্য, কোনো মহা-কবিরই ভাবনার ছায়াপাত হয় নি, আঙ্গিক হয়ত নিয়েছেন, কিন্তু ভাবসম্পদ তাঁর নিজস্ব। তাঁর প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য এইখানেই। ব্রজাঙ্গনা ঠিক মহাজন পদাবলী নয়। এই প্রসঙ্গে সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্রজাঙ্গনা'-র ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় যথার্থই বলেছেন:

> "এগুলি সুরে গেয় মহাজন-পদাবলীও নয়; আবার পালায় বিভক্ত কবি বা পাঁচালি গানও নয়। মধুসূদন স্বয়ং এগুলিকে *Ode* আখ্যা দিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও চতুর্দশপদী কবিতার মত মধুসূদন বাংলায় এই শ্রেণীর গীতি-কবিতারও জন্মদাতা।"

আধুনিক লিরিক কবিতার সূচনা এখান থেকেই। এই ব্রজাঙ্গনার রাধা-বিরহের অন্তরালে রয়েছে উনিশ শতকের বাংলার নারী-জীবনের মর্মপীড়া। এরই বেদনা-মধুর প্রকাশ মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা। এখানে ভক্তির প্রশ্ন গৌণ, রেনেসাঁর ধর্মই মুখ্য। "ব্রজাঙ্গনার ভাষা মধুসূদনের গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মধুর এবং সংস্কৃতভাবাপন্ন। জয়দেব ও বিদ্যাপতির ভাষার আদর্শে তাহা কল্পিত হইয়াছিল।" মাইকেলের এই কাব্যখানি অসমাপ্ত। পরিকল্পিত কাব্যের মাত্র প্রথম সর্গটি—রাধা-বিরহ—কবি রচনা করেছিলেন। বহুকাল বাদে 'বিহার' নামে আর একটি সর্গ রচনায় হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু তা তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি—মাত্র দু'টি কবিতা লিখেছিলেন। তাই আবার বলতে ইচ্ছা হয়—মাইকেল অসমাপ্ত কাব্যের কবি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' থেকে আমরা জানতে পারি যে, মাইকেল ব্রজাঙ্গনার স্বত্ব বৈকুণ্ঠ দত্তকে দান করেন। এই বৈকুণ্ঠ দত্ত ঠাকুর-বাড়ির একজন অনুগত লোক ছিলেন। তিনি একজন কাব্যরসিকও ছিলেন এবং ব্রজাঙ্গনার পাণ্ডুলিপি পড়ে মুগ্ধ হন। "মাইকেল তাহাই জানিতে পারিয়া ব্রজাঙ্গনা কাব্যের সমস্ত স্বত্ব সেই পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই বৈকুণ্ঠবাবুকে দান করেন। বৈকুণ্ঠবাবু নিজব্যয়ে কাব্যখানি প্রথম প্রকাশ করেন।"

পূর্বের ন্যায় মাইকেল তাঁর ব্রজাঙ্গনা কাব্যের এক কপি রাজনারায়ণকে পাঠিয়ে দিলেন এবং তাঁর নিরপেক্ষ অভিমত চেয়ে বন্ধুকে একখানি পত্র লিখলেন। সেই পত্রের শেষাংশে তিনি লিখছেন: "একটি বিয়োগান্ত নাটক, একখণ্ড কবিতাবলী ও একটি কাব্যের অর্ধাংশ—এ সবই আমার এক বছরের ফসল আর সে-বছরও এখনো পর্যন্ত মাত্র অর্ধেক অতিক্রান্ত হয়েছে। যদি আর কিছুর জন্যে আমার প্রশংসা করতে না পারো, তা হলে অন্ততঃ এটুকু নিশ্চয়ই বলবে যে আমি শ্রমবিমুখ নই।" মূল ইংরেজি চিঠিতে মাইকেল *an industrious dog* কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। এই উক্তিটি নিঃসন্দেহে মাইকেলের কর্মঠতার পরিচায়ক। তেমনি অন্য একখানি চিঠিতে দেখতে পাই, মাইকেল তাঁর সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে লিখছেন—"পার্বত্য স্রোতস্বতীর বেগে আমি কাজ করে চলেছি।" মাইকেলের উদ্দাম ও উচ্ছল প্রাণশক্তি বাইরে নিরলস কর্মোদ্যমের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর স্বল্পকালের সাহিত্যজীবনে। বাণীর সাধনায় মাইকেল সত্যই নিরলস সাধক ছিলেন—এবং সাধকোচিত নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ছিল বলেই না তিনি সেই সাধনায় এমন আশ্চর্য সিদ্ধিলাভ করে সাহিত্য-সংসারে এমন বিপুল কীর্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ব্রজাঙ্গনা যখন মধুর মুরলী নিস্বনে চারদিক সচকিত করে বাংলার সাহিত্য-অঙ্গনে দেখা দিল, তখন মাইকেলের বয়স সাঁইত্রিশ। যৌবন অতিক্রান্ত বললেই হয়। তাঁর তখনকার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের দিকে আমরা একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করব। কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি তখন প্রায় সারা বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বিদ্যাসাগরের মতো মাইকেলের নাম তখন বিদগ্ধ ও সম্ভ্রান্ত সমাজের সকল লোকের মুখে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য তখন রেনেসাঁর গতিপথে অনেকখানি পথ অতিক্রম করেছে দুইটি শিল্প-মূর্তিকে পুরোভাগে রেখে—একজন কবি, অপরজন ঔপন্যাসিক। মাইকেলের দীপ্ত আত্মপ্রত্যয় আর বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্ব-প্রসারি অনন্ত জীবন-জিজ্ঞাসা এবং বাস্তব জীবন-বুদ্ধি, বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছে এক নূতন গরিমা। দীনবন্ধু মিত্রের

নাট্যপ্রতিভাও তখন 'নীলদর্পণ' নাটককে কেন্দ্র করে সাহিত্যে এনে দিয়েছে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন। আপাততঃ আমাদের আলোচনার বিষয় মাইকেল।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে মাইকেলের যাওয়া-আসা ছিল। মহর্ষি স্বয়ং মাইকেলকে 'কবিকুল-কেশরী' বলে সমাদর করতেন এবং তাঁর মুখ থেকে মেঘনাদবধের আবৃত্তি শুনতে ভালবাসতেন। জোড়াসাঁকোর কালীপ্রসন্ন সিংহের বৈঠকখানা তখনকার কলকাতায় আর একটি প্রসিদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বলে পরিগণিত ছিল। এখানেও মাইকেলের সমাগম ঘটতো। পটলডাঙায় সংস্কৃত কলেজের সম্মুখে অবস্থিত শ্যামাচরণ দে-র বৈঠকখানা ছিল শহরের আর একটি বিদ্বদ্‌জন সম্মেলনের কেন্দ্র। বিদ্যাসাগর থেকে দীনবন্ধু মিত্র সকলেই এখানে তাঁদের জীবনের বহু সন্ধ্যা যাপন করেছেন। এখানেও মাইকেলের আবির্ভাবে আসর জমে উঠত। আলাপচারী মাইকেলের প্রাণোচ্ছল ও সরল হাস্য-পরিহাসই ছিল সকলের পরম উপভোগ্যের বিষয়। কলকাতার বাইরে শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী গোপীকৃষ্ণ গোস্বামীর বাড়িতে পর্যন্ত মাইকেল মাঝে মাঝে গিয়ে উদয় হতেন; উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের ভবনেও তিনি মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হতেন। মাইকেলের মতো আলাপচারী ব্যক্তি সেদিনের বাঙালি সমাজে খুব কমই ছিলেন—এ কথা তাঁর সমসাময়িক সকলেই স্বীকার করেছেন। ঝামাপুকুরে দিগম্বর মিত্রের রাজসিক বৈঠকখানা তাঁর আগমনে ঝলমল করে উঠতো। আবার দিগম্বর মিত্রের বাড়ির সামনে বন্ধু তারকনাথ ঘোষের বাড়িতেও সময়ে সময়ে সাহিত্য-বৈঠকে তিনি মিলিত হতেন। তখনকার দিনে ঝামাপুকুরে তারক ঘোষের বাড়ি ছিল শহরের অন্যতম প্রসিদ্ধ সারস্বত-কুঞ্জ; মাইকেল, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বদা গতিবিধি ছিল এখানে। থিয়েটার রোডে ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের ড্রয়িংরুমও মাইকেলের উচ্চ হাসিতে প্রতিধ্বনিত হতো। এ ছাড়া, বন্ধু গৌর বসাকের বাড়ি তো তাঁর নিজের বাড়ি বললেই চলে—গৌর বসাক যখন কলকতায় থাকতেন তখন তাঁদের বাড়িতে মাইকেলের নিমন্ত্রণ নিয়মিত ছিল এবং মাইকেলের জন্য এক সেট স্বতন্ত্র রূপোর বাসনের ব্যবস্থা ছিল এখানে। কথিত আছে, তাঁর মায়ের হাতে রান্না মোচার ঘণ্ট মাইকেলের অতি প্রিয় ছিল। পাইকপাড়ার রাজবাটি, মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের মরকত

কুঞ্জ, বর্ধমানের মহারাজার গোলাপবাগ—সেখানেও অবসর মতো মাইকেল যেতেন। এর থেকেই মাইকেলের জনপ্রিয়তা আমরা কিছুটা অনুমান করতে পারি। এই সময়টুকুই মাইকেলের জীবনের সৌভাগ্যের দিন। যে সমাজকে একদিন হৃদয়ের এক উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে তিনি ত্যাগ করেছিলেন, কবি-জীবনে সেই সমাজেই তাঁর সমাদর হয়েছিল সর্বাধিক। নামে মাত্রই তিনি মাইকেল; কিন্তু বাঙালির কাছে তিনি চিরদিনের প্রিয় মধুসূদন। সেদিনের কলকাতার বিদগ্ধ ও সম্ভ্রান্ত সমাজে সকলের মুখে মুখে ফিরতো একটি নাম – মধুসূদন। খ্রীস্টান সমাজ কিন্তু তাঁকে দূরেই রেখেছিল—যদিও তিনি নিজে সেই সমাজ ঘেঁষে থাকতে চেয়েছিলেন। শেষ জীবনে, মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে মাত্র, আমরা দেখতে পাই যে, কোনো একটি মোকদ্দমা উপলক্ষে পুরুলিয়ায় এলে পরে স্থানীয় খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় মাইকেলকে সেখানকার মিশন হাউসে অভ্যর্থনা করেছিলেন। কিন্তু কলকাতার খ্রীষ্টীয় সমাজে তাঁর অভ্যর্থনার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এর জন্যে মাইকেলের মনে এতটুকু ক্ষোভের দাগ পড়েনি। ছ নম্বর লোয়ার চিৎপুর রোডের বাড়িতেও অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নিয়ে মাইকেল বহু সন্ধ্যা, বহু রাত্রি আনন্দে যাপন করেছেন। সুতরাং ১৮৬১-তে মাইকেলের সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাঁর চির অভাবগ্রস্ত জীবনে নিশ্চয়ই কিছুটা সুখের সঞ্চার করেছিল।

যেখানে যে-আসরে যতটুকু সময়ের জন্য সেই 'শালপ্রাংশুমহাভুজ' পুরুষ-সিংহ কবির আবির্ভাব ঘটতো, সেখানেই সকলে সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখতো মানুষটিকে। দেখতো মাইকেলের ঈষন্মুক্ত অধরোষ্ঠ যেন সর্বদা নীরব ভাষায় নিজের মনের কথা বলে চলেছে; দেখতো মাইকেলের চোখের অচঞ্চল উদারতায় ও ওষ্ঠের ব্যগ্র বাচালতায় কত প্রভেদ! চোখে প্রতিভা, ওষ্ঠে চরিত্র। বক্তা এবং অতিব্যক্তিক মাইকেলের সমাগমে যে কোনো আসর ঝলমল করে উঠতো। তাঁর প্রাণোচ্ছলতা মুহূর্ত মধ্যে সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যেত। তিনি যে নব জাগরণের বিষাণ।

শ্যামাচরণ দে-র বৈঠকখানার একটি দিনের ঘটনা এখানে উল্লেখ করব। একদিন বর্ষার এক সন্ধ্যায় মাইকেল টম টম চড়ে এসে হাজির হলেন সেখানে। সেদিনের মজলিসে বিদ্যাসাগর অনুপস্থিত। এবং বিদ্যাসাগরের বিষয় নিয়েই

সেদিনের বৈঠকে আলোচনা হচ্ছিল। আলোচনার মাঝ পথে এসে উদয় হলেন মাইকেল। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরস বাক্যে সকলকে শিষ্টাচার জানিয়ে মাইকেল জিজ্ঞাসা করলেন—"Now, my boys! what is the subject matter of to-day's discussion?" শ্যামাচরণ দে বললেন—বিদ্যাসাগর। আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল যে এখন বাংলা দেশে তাঁর মতন বিদ্বান আর কে আছে? এই কথা শুনে মাইকেল খুব হাসলেন—শিশুর মতো সেই প্রাণখোলা সরল হাসি—তারপর ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, "Learned! I am ten times learned than your Vidyasagar. But that means nothing—I have no heart like him—his is the golden heart I have ever seen or Bengal has ever seen"—বলতে বলতে মাইকেল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। তাঁর গলার স্বর রুদ্ধ হলো। সকলে নির্বাক বিস্ময়ে মাইকেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিন্তু তাঁর পারিবারিক জীবন এই সময়ে কি রকম ছিল? এই প্রসঙ্গে মাইকেলের প্রথম জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন:

> "পূর্বের ন্যায় তখনও তিনি পুলিশ আদালতে কার্য করিতেছিলেন; রাজকার্য, পুস্তক বিক্রয়ের আয় এবং পৈতৃক সম্পত্তি হইতে তাঁহার যে অর্থাগম হইত, তাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ন্যায় স্বচ্ছন্দে তাঁহার দিনপাত হইত, তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল; বাংলা ভাষার একজন অদ্বিতীয় লেখক বলিয়া তাঁহার নাম সকলেরই পরিচিত হইয়াছিল। সুতরাং যেসকল সামগ্রী লইয়া মানুষ পারিবারিক জীবনে সুখী হয়, তাহার কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না; অথচ তিনি একদিনের জন্যও সুখী ছিলেন না।...ধন, যশ, পরিবারবর্গের স্নেহ, কিছুই তাঁহাকে সুখী করিতে পারে নাই। বাহিরে লোকে দেখিত, তিনি বিলাসী, আমোদ নিরত এবং উদ্বেগশূন্য, কিন্তু অভ্যন্তরে তাঁহার হৃদয়, এক এক সময় বিষম যন্ত্রণায় দগ্ধ হইত।"

যোগীন্দ্রনাথ যে পৈতৃক সম্পত্তির কথা উল্লেখ করেছেন, তা মাইকেল

তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুদীর্ঘ কাল মামলা করার পর উদ্ধার করেছিলেন। যতটুকু ভূ-সম্পত্তির অধিকারী তিনি তখন হতে পেরেছিলেন, তখনকার দিনে তার মূল্য ছিল প্রায় একলক্ষ টাকা।

তাঁর জন্মলগ্নেই বিধাতা মাইকেলের ললাটে এঁকে দিয়েছিলেন অশান্তির টিকা। তাই দেখতে পাই জীবনে কোনো অবস্থাতেই সুখ, শান্তি বা তৃপ্তি তাঁর জীবনের ত্রিসীমানার মধ্যে ছিল না। সংসারে একজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনে যা আশা করা যায়,—ধন, জন, মান এবং প্রতিপত্তি—কিছুরই তো অভাব ছিল না মাইকেলের, তবু মানসিক অশান্তির উত্তাপে তাঁকে জর্জরিত হতে হয়েছে আজীবন। আবার আমরা তাঁর বিচিত্র জীবনেতিহাসে এও দেখতে পাই যে, এক প্রবল মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন বলে তিনি জীবনের সকল রকম অবস্থার মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন একটা রাজকীয় মর্যাদা নিয়ে। অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু যাঁরা ছিলেন—সেই গৌর বসাক, ভূদেব কি রাজনারায়ণ—তাঁরা স্বচক্ষে কবির দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনকে দেখছেন, কিন্তু তাঁদের কারো কাছেই মাইকেল কখনো তাঁর অভাবের কথা জানাতেন না। মুন্সী রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে তিনি—উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর পিতার স্বভাব কিছুটা পেয়ে থাকবেন। দারিদ্র্য মাইকেলের চিরসহচর, অশান্তি তাঁর বিধিলিপি। মাইকেলের অন্তরের এই বেদনা তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যের বহু স্থলে রাবণের মুখ দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর, ত্রিলোকবিজয়ী রাবণের সর্বপরিজনহীন নিঃসঙ্গতা, তাঁর অন্তর্জ্বালার ভেতর দিয়ে মাইকেল যেন নিজের অন্তরের ইতিহাসকেই তুলে ধরেছেন। মেঘনাদবধ কাব্য এক হিসাবে মাইকেলেরই আত্মচরিত, তাঁরই জীবনকাব্য।

কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি, রাবণের ভালে?

অথবা,

নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে
বাম মম প্রতি।

অথবা,

শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে।

—রাবণের এই কথাগুলি মাইকেলেরই অন্তরের হাহাকার ভিন্ন আর কি?

তাঁর হৃদয়ের এই মর্মভেদী বিলাপ আরো তীব্রভাবে ধ্বনিত হয়েছে, এই সময়ে রচিত প্রসিদ্ধ 'আত্মবিলাপ' কবিতাটিতে। মাইকেলের কলম দিয়ে যখন রাধার বিরহ অপূর্ব কাব্যশ্রী নিয়ে বেরুলো, তখন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর একদিন মাইকেলকে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করতে অনুরোধ করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবনচরিতকার লিখেছেন :

> "কিন্তু তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তৎপরিবর্তে মধুসূদন, তাঁহার বিষাদময়ী পূর্বস্মৃতি বিজড়িত, 'আত্মবিলাপ' শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত করেন।"

মাইকেলের আত্মবিলাপ রাবণের বিলাপের চেয়েও গভীর ও মর্মস্পর্শী। এ তাঁরই জীবনের এবং প্রত্যেক মানুষের ব্যর্থজীবনের তীব্র মানস বিক্ষোভ। নানা বিপরীত শক্তির সংঘাতে দোলায়মান ও বিক্ষুব্ধ কবিচিত্তের মর্মবেদনা এই কবিতাটির প্রতিটি ছত্রে ধ্বনিত। কবি ও নাট্যকার হিসাবে তিনি ঝড়-ঝাপটার যুগ অতিক্রম করেছেন, কিন্তু কোন্‌খানে নোঙর ফেলবেন তা ঠিক করতে পারছেন না। জীবন তাঁর কোনো দিনই সুশৃঙ্খল নয়, শান্ত নয়। আত্মবিলাপ সম্পূর্ণভাবেই মাইকেলের আত্মচিন্তা। এমন sublime অথচ করুণ কবিতা বাংলা কাব্যজগতে আর দুটি নেই। এর সঙ্গে তুলনা করে যেতে পারে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'তপোভঙ্গ' কবিতাটি। আত্মবিলাপের প্রেরণা কবির গভীর দুঃখানুভূতির মর্মমূলে। কবির জীবনে চাওয়া-পাওয়ার ব্যর্থতা থেকে যে বেদনা, তা তো ছিলই—তার চেয়েও বেশি ছিল স্বখাত-সলিলে ডুবে মরার দুঃখ। তাই 'আত্মবিলাপের' মধ্যে আত্মধিক্কারের সুরটিই স্পষ্ট। যে বিপুল শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে মাইকেল কাব্য-সংসারে এসেছিলেন, সে বিষয়ে আত্মসচেতন ছিলেন বলেই অপচয়ের বেদনা কবিকে পীড়া দিয়েছে। সাহিত্যাকাশে উল্কার মতো দুর্মদ আবেগে অক্লান্ত ছুটাছুটির পর যখন তিনি আপনার কক্ষটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তখন সে দীপ্তি হয় তো ক্ষীয়মান। তাই সেই সীমাহীন আক্ষেপ কবিকে থেকে থেকে তুষের আগুনে দগ্ধ করেছে। সেই ইতিহাসই আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন মাইকেল এই কবিতাটিতে।

এর প্রকৃত মূল্য এইখানেই। শূন্যচারী ভাবস্বপ্ন নয়, বেদনার হলাহলমথিত এর সুধারস। তাই এর উপভোগ্যতা এত নিগূঢ়। কবির অন্তর্গূঢ় বেদনা রসে রূপে আর অনুপম উপমায় ফুটে উঠেছে এই কবিতাটির স্তবকে স্তবকে। কবির বেগবান প্রকৃতি আর কল্পনার প্রাচুর্য ছন্দের উদ্দাম নৃত্যের মধ্যে যেন প্রতিফলিত। সেই শক্তি, বিদ্যুৎগর্ভ প্রতিভার সেই প্রদীপ্ত স্ফুরণ মর্মভেদী হাহাকারের কালো মেঘ দীর্ণ করে খেলে গিয়েছে। 'আত্মবিলাপ' সত্যই মাইকেলের অন্তরের একটি বিশ্বস্ত আলেখ্য। আবার বাস্তবতার তপ্ত কটাহে আবর্তিত মানবাত্মার আর্ত আক্ষেপ এই কবিতাটি।

বলেছি, 'আত্মবিলাপ' মাইকেলের আত্মচিন্তা। প্রায় লক্ষ টাকা মূল্যের পৈতৃক জমিদারী লাভ করা সত্ত্বেও কি গভীর যন্ত্রণায় মাইকেলের জীবন অতিবাহিত হতো, কবি সেই ইতিহাসই ব্যক্ত করেছেন তাঁর এই কবিতাটির মধ্যে। মাইকেল তাঁর অতীতে জীবনের বহুবিধ বিড়ম্বনার কথা, বহুবিধ আশাভঙ্গের বেদনার কথা এই কবিতায় সরলভাবে বলেছেন, এমন কি সাহিত্যকর্মে লিপ্ত হয়ে আশানুযায়ী অর্থোপার্জন না হওয়ার দরুণ যে ক্ষোভ, তাও তিনি এখানে অকপটে এবং ব্যথিতচিত্তে বলেছেন;—নিজের বহুবিধ দোষক্রটির জন্য কবি যে অনুতপ্ত, সে কথাও মাইকেল গোপন করেন নি—"কিন্তু হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি যে কিছু অন্যায় কার্য করিয়াছেন, এরূপ কোথাও ইঙ্গিত-আভাসও করেন নাই।" এই আন্তরিকতা মাইকেলের বলিষ্ঠ মনেরই পরিচায়ক। এটুকু না থাকলে মাইকেল কপটাচারী বলে আখ্যাত হতেন। এই আন্তরিকতা তাঁর চরিত্রকে এক অপূর্ব মহত্বে মণ্ডিত করেছে। ধর্মান্তর গ্রহণের প্রাক্কালে ধর্মাচার্য ডিলট্রি যে নামে তাঁকে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন, তাঁর পিতৃ-দত্ত নামের প্রথমে সেই নামটি তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই ব্যবহার করতেন। তাই 'মধুসূদন' নামটির মধ্যে কবির চরিত্র যতখানি না অভিব্যক্ত হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি অভিব্যক্ত হয়েছে 'মাইকেল' এই নামটিতে।

১৮৬১। জুন মাস।

মাইকেল রাজনারায়ণকে এক পত্র লিখে জানাচ্ছেন—"এরপর থেকে আমাকে এই·নূতন ঠিকানায় চিঠি লিখবে। আমি লোয়ার চিৎপুর রোডের বাসা ছেড়ে দিয়েছি। ঠিকানার ওপরে লিখবে: 'c/o James Frederick Esqr, Kidderpore." মাইকেল মাদ্রাজ থেকে ফিরবার পর তাঁর পৈত্রিক বাসভবনে বাস করবার অধিকার আর পান নি। পৈত্রিক বাসভবনের উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত ৬নং জেম্‌স লেনের বাগানবাড়িটি তিনি এই সময়ে ভাড়া নিয়েছিলেন। মাইকেলের পত্রে উল্লিখিত ঐ জেম্‌স ফ্রেডরিক ছিলেন তখন এই বাড়ির মালিক।

বাড়িটি তিনি এঁর কাছেই বন্ধক রেখে টাকা কর্জ করেন; সেই বন্ধকী বাড়ি তিনি আর উদ্ধার করতে পারেন নি। পৈত্রিক-সম্পত্তির বহু অংশই মাইকেল এইভাবে হেলায় হারিয়েছেন। রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে হিসেব করে টাকা খরচ করতে জানতেন না বলেই অর্থকষ্ট ছিল মাইকেলের জীবনের চিরসহচর। মাইকেল অমিতব্যয়ী ছিলেন সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর দরাজ হাতের দানের কথা, তাঁর কোনো জীবনচরিতকারই ভুলেও উল্লেখ করেন নি। বিদ্যাসাগরের মতো মাইকেলও কম দাতা ছিলেন না। কিন্তু সে-ইতিহাস নেই। আছে শুধু অপবাদ—মাইকেল অমিতব্যয়ী, মাইকেল উচ্ছৃঙ্খল।

এই বছরের প্রথম ভাগে মাইকেলের সাহিত্যজীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা হলো—'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ। নাটকের রচয়িতা ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। কিন্তু তিনি তখন সরকারী কার্যে নিযুক্ত ছিলেন বলে নাটকখানি ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। প্রকাশকাল—১৮৬০। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারকে কেন্দ্র করেই নাটকখানি রচিত হয় এবং দীনবন্ধুর নেপথ্য প্রেরণা ছিল 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জ্বালাময়ী রচনা এবং তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। মেঘনাদবধ কাব্য যে রকম আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের ফলও হয়েছিল ঠিক তেমনি। এই সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন: "নাটকখানি বঙ্গসমাজে কি উদ্দীপনার

আবির্ভাব করিয়াছিল তাহা আমরা কখনো ভুলিব না।…ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমা পর্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল।"

যুগ-সচেতন কবি মাইকেলের পক্ষে সমসাময়িক এত বড়ো একটি ঘটনা সম্পর্কে নীরব থাকা সম্ভব ছিল না। হরিশচন্দ্রের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার তিনি একজন নিয়মিত পাঠক ছিলেন এবং হরিশচন্দ্রের নির্ভীকতা ও স্বদেশপ্রেম তাঁকে মাইকেলের পরম শ্রদ্ধার বিষয় করে তুলেছিল। হরিশচন্দ্রের লেখনী যে আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল, দীনবন্ধুর নাটক যাকে বেগসম্পন্ন করে তুলেছিল, মাইকেলের অনুবাদ তাকেই পূর্ণতা প্রদান করেছিল। এই অনুবাদের ব্যাপারে পাদ্রি জেমস্ লং-ই ছিলেন অগ্রণী। যখন এর ইংরেজি অনুবাদের প্রশ্ন উঠল, তখন সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ইংরেজি ভাষায় সবচেয়ে বেশি কৃতবিদ্য মাইকেলের ওপর। এখানেও মাইকেলের প্রতিভা অসাধ্যসাধন করলো। কথিত আছে, তিনি এক রাত্রির মধ্যেই নাটকখানির একটি চমৎকার অনুবাদ করেন। মূল নাটকে দীনবন্ধু নিজের নাম প্রকাশ করেন নি এবং অনুবাদক হিসাবে মাইকেলও তাঁর নাম প্রকাশে বিরত ছিলেন; কারণ দুজনেই তখন সরকারী কর্মচারী। নাটকের ইংরেজি অনুবাদই সারা বাংলা তথা ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে সেদিন তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। এর পরবর্তী কাহিনী সুবিদিত।

নীল আন্দোলনের প্রাণ ছিলেন হরিশচন্দ্র। তাঁর অকাল মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে মাইকেল রাজনারায়ণকে এক পত্রে লিখেছিলেন: "হরিশ মরিয়াছে। তাহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইতে তাহার নামে একটি 'স্কলারসিপ' দিবার কথা হইতেছে। ছোঃ; একটি মর্মর মূর্তি নয় কেন? যাই হোক, আমি চাঁদা দেব। হরিশাক আমি ভালবাসিতাম ও শ্রদ্ধা করিতাম।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে, বিদ্যাসাগরের অনুরোধে মাইকেল কিছুদিন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদনাও করেছিলেন।

॥ সতের ॥

মাইকেলের কবি-মানস প্রাচীন ধারার পুনরাবৃত্তি নয়—অথবা মৃত ঐতিহ্যের রোমন্থনও নয়।

উনিশ শতকের বিপুল বেগবান সৃষ্টিমুখর প্রাণশক্তির মূর্তবিগ্রহ মাইকেল। তাঁর নাটক, প্রহসন, কাব্য, গীতিকবিতা এবং অসংখ্য পত্রাবলীর মধ্যে সেই শক্তিরই দুকূলপ্লাবী লীলা। শিবনাথ শাস্ত্রী যথার্থই লিখেছেন:

> "ইহার পরে (১৮৬০-এ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য প্রকাশিত হওয়ার পর) তিন বৎসরের মধ্যেই মধুসূদনের অসাধারণ প্রতিভা দেখিতে দেখিতে প্রাতঃসূর্যের ন্যায় উঠিয়া যেন মাধ্যাহ্নিক রেখাকে অতিক্রম করিয়া গেল…তাঁহার কবিত্বখ্যাতি দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইল।"

স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে যে, রেনেসাঁর মর্মবাণী মূর্ত হয়ে উঠতো মাইকেলের কাব্যে; তাঁর হৃদয়ের গোপন কোণে সুরবীণায় স্বদেশের ইতিহাসগুলিই কবিতা হয়ে বেজে উঠতো। তাই মাইকেলের খ্যাতি এমন দ্রুত ও ব্যাপক ছিল। তাঁর প্রতিভার মাধ্যাহ্নিক রেখাকে চিহ্নিত করেই মাইকেলের মানসলোকে এইবার আবির্ভূতা হলেন বীরাঙ্গনা। নারীহৃদয়ের ক্ষাত্রপ্রেমকে মাইকেল কাব্যবারিতে অভিষিক্ত করেছেন এই কাব্যে।

মাইকেলের কবি-কর্মের দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ প্রয়াসের কথা এইবার বলব। খিদিরপুরের নূতন বাসভবনের পরিবেশে মাইকেল রচনা করলেন 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। অপূর্ব প্রীতিপদ এবং অভিনব এই কাব্যখানিও মাইকেলের প্রতিভার এক নূতন সৃষ্টি—তার মানসজীবনের শেষ ফসল। বাংলা সাহিত্যে এ জিনিস এই প্রথম। এই কাব্যের রচনাকাল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ এবং প্রকাশকাল ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ। কবি বীরাঙ্গনা কাব্যকে অভিনব বলেছেন। এই অভিনবত্ব কি, সংক্ষেপে তার আলোচনা করব।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য পাঠ করে রাজনারায়ণ মাইকেলকে একখানা নূতন কাব্য রচনা করবার জন্যে অনুরোধ করেন এবং তার উপকরণও লিখে পাঠিয়েছিলেন। বিজয়সিংহের লঙ্কা-বিজয়ের কাহিনী নিয়ে 'সিংহল-বিজয়' নামে একখানা কাব্য মাইকেল আরম্ভ করেছিলেন; কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হবার

পূর্বেই কবি-কল্পনায় অবিভূর্তা হলেন ব্রজাঙ্গনা—গীতিকবিতার মাধুর্যমুগ্ধ কবি সেই মূর্চ্ছনার জের টেনে হাত দিলেন বীরাঙ্গনা কাব্যে। এই সম্পর্কে মাইকেল রাজনারায়ণকে লিখছেন :

> "সিংহলবিজয় কাব্যের মাত্র ত্রিশ লাইন লিখেছি। সত্যি কথা বলতে কি ওটা আপাততঃ এক পাশে সরিয়ে রেখেছি। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ ধরে 'বীরাঙ্গনা' নাম দিয়ে একটি নূতন বস্তু কলমের আঁচড়ে খাড়া করেছি। প্রসিদ্ধ পৌরাণিক নায়িকারা তাঁদের স্বামী অথবা প্রণয়াস্পদকে পত্র লিখছেন—ইহাই বীরাঙ্গনা। সর্বসমেত একুশখানি পত্রে কাব্যটি সম্পূর্ণ করার ইচ্ছা, এর মধ্যে আমি এগারটি লিখে শেষ করেছি। এইগুলিই এখন ছাপা হচ্ছে. কারণ বাকীগুলি লিখবার অবসর এখন নেই। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, আমার মুদ্রাকর ঈশ্বরচন্দ্র দাস ও আরো দু-একজন এই কাব্য পাঠ করে half-mad হয়েছেন। তুমি নিজের বুদ্ধিতে বিচার করে দেখো।…'বীরাঙ্গনা'-র এক কপি তুমি শীঘ্রই পাবে।"

বীরাঙ্গনা অমিত্রচ্ছন্দে রচিত।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের পর মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করেও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে মাইকেলের শেষ কথা বলা হয় নি। ভাষার গাম্ভীর্য, যতি ও ছন্দের বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে যে আরো পরিণতির অবকাশ ছিল, মাইকেলের সে বিশ্বাস ছিল। ইতালীয় কাব্য-সমুদ্রে অবগাহনের কালে তিনি রোমক কবি ওবিদ-এর *Heroic Epistles* বা বীর-পত্রাবলীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ওবিদ এই কাব্যের পুরাণ-কাহিনীর নায়িকাদের সম্পূর্ণ নূতন ও রোমান্টিক মূর্তিতে সজ্জিত করেছিলেন। পত্রাকারে নায়িকাদের চিত্ত উদ্ঘাটনের এই আদর্শেই মাইকেল তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা করেন। কিন্তু বাহ্য-রূপাঙ্গিকে ওবিদের কাব্যাদর্শকে অনুসরণ করলেও, এ কথা সত্য যে, "বীরাঙ্গনার অন্তরঙ্গে আপাদমস্তক বিচ্ছুরিত হয়ে আছে সমকালীন রেনেসাঁ-সমুচ্ছ্বাসিত বাঙালি জীবন-প্রেরণার শান্ত পরিমিত, বিচিত্র সুন্দর ভাব-সুষমা।" মেঘনাদবধের গাম্ভীর্য ও ব্রজাঙ্গনার সৌন্দর্য মিলিত হয়ে এই কাব্যখানিকে

দিয়েছে অনন্যসুন্দর একটি পূর্ণতা। যদিও তিনি কাব্যখানির নাম দিয়েছেন বীরাঙ্গনা এবং যদিও তিনি ওবিদের বীরত্বধর্মী কাহিনীর আঙ্গিককে গ্রহণ করেছেন, তবু প্রেমানুরক্তির রোমান্টিক শিল্পমণ্ডলে মাইকেল সাজিয়েছেন তাঁর এই কাব্যের প্রত্যেকটি নায়িকাকে। মাইকেল তো নিজেই রাজনারায়ণকে এক চিঠিতে লিখে জানিয়েছিলেন, "সম্ভবতঃ আমার প্রবণতা লিরিকের দিকে।" তাঁর কবিমানসের রহস্য বুঝবার পক্ষে কবির নিজের এই স্বীকৃতিটি বিশেষ মূল্যবান। এবং এই লিরিকপ্রবণতার জন্যই বীরাঙ্গনার অমিত্রাক্ষরে দেখা দিয়েছে এক অপরিমেয় সৌন্দর্য, স্নিগ্ধ কারুণ্য এবং আশ্চর্য মসৃণতা। বীরাঙ্গনা বীররসের আবরণে লিরিক কাব্য ; এর ভাব যেমন লিরিকধর্মী, ভাষা তেমনি সরল এবং ছন্দও নিরর্গল। এই কাব্যের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য এর নাটকীয়তা। নাটক ও কাব্যকে একসঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে মাইকেলের প্রতিভা এক নূতন জিনিস সৃষ্টি করেছে এই 'বীরাঙ্গনায়'।

কাব্যখানি যথাসময়ে প্রকাশিত হলো। বন্ধুর কাছে এক কপি ডাকযোগে প্রেরিত হলো সকলের আগে। সেই সঙ্গে একখানি ছোট্ট চিঠিও :

> "প্রিয় রাজ! নূতন কাব্যটি সদ্য বাহির হইয়াছে। তোমাকে একখণ্ড পাঠাইবার জন্য বলিয়াছি। যতশীঘ্র সম্ভব, ইহার সম্বন্ধে তোমার মতামত জানাইয়া আমকে বাধিত করিবে। কারণ, কবিতা বিষয়ে অনেকের অপেক্ষা তোমার মতকেই আমি শ্রদ্ধা করিয়া থাকি।··· আমাদের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু বিদ্যাসাগরের নামে বইটি উৎসর্গ করিয়াছি। বিশ্বাস কর, এমন চমৎকার মানুষ হয় না। অনেক দিক দিয়া তাঁহাকেই আমি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি।"

বলা বাহুল্য, যোগ্য ব্যক্তিকেই মাইকেল তাঁর এই নূতন কাব্যখানি উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গ লিপিটি বড়ো সুন্দর :

মঙ্গলাচরণ।

> "বঙ্গকুলচূড় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের চিরস্মরণীয় নাম এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণি রূপে স্থাপিত করিয়া, কাব্যকার ইহা উক্ত মহানুভবের নিকট যথোচিত সম্মানের সহিত উৎসর্গ করিল। ইতি। ১২৬৮ সাল। ১৬ই ফাল্গুন।"

এই কাব্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন :

> "মেঘনাদবধের পর বীরাঙ্গনা কাব্যের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ আমাদিগকে মুগ্ধ করে। উহার সর্বত্র একটি সঙ্গীতধ্বনি ঝঙ্কৃত হইয়া কাব্যখানিকে পরম উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে। কবিত্ব শক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' উৎকৃষ্ট; কিন্তু ভাষার লালিত্যে ও ছন্দের পারিপাট্যে মধুকবির বীরাঙ্গনা সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।"

ব্রজাঙ্গনা সত্যই মাইকেলের পরিণত প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্ণ পরিণত রূপ আমরা এই কাব্যেই পাই।

বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম ও শেষ পত্রকাব্য।

মাইকেলের প্রতিভার পরিপূর্ণ রূপ বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রতিটি ছত্রে প্রতিফলিত। এই কাব্যের গঠনরীতিও নূতন—এ রীতি বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে আর ছিল না। রসবৈচিত্র্য এই কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি লিপি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে মনোহর—প্রত্যেকটিতে নব নব ভাব পল্লবিত। এক-এক পত্রিকার বিষয় ভাব ও রস এক-এক রূপ। কবি আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে প্রত্যেকটি নায়িকার—যে নায়িকাদের কেউ পতিপরায়ণা সাধ্বী, কেউ কলঙ্কিনী প্রেমিকা আবার কেউ বা অভিমানক্ষুব্ধা সতী—অন্তর-রহস্য বিশ্লেষণ করে তাঁদের প্রেমপূর্ণ জগৎ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। নায়িকাদের মধ্যে কেউ তার প্রেমাস্পদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করে চিঠি লিখছে, কেউ প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করতে ব্যগ্র, কেউ স্বামীর অদর্শনে ব্যাকুল হয়ে চিঠি লিখছে, কেউ বা স্বামীর আচরণে মর্মপীড়িতা হয়ে অনুযোগ করে চিঠি লিখছে। প্রেম ও বীরত্ব, তেজ ও প্রণয়—সমান স্রোতে এই পত্রকাব্যের তটপ্রান্ত দিয়ে অবাধ লীলায় বয়ে চলেছে। অনুযোগের পত্রগুলিতেই মাইকেলের প্রতিভা সম্পূর্ণতা লাভ করেছে দেখা যায় এবং এই পত্রগুলিই কাব্যের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। নীলধ্বজের প্রতি জনা আর দশরথের প্রতি কৈকেয়ী—এই দুখানি পত্র অতুলনীয়। হৃদয়ভেদী আর্তনাদ, মর্মান্তিক ব্যঙ্গ, এবং কঠোর তিরস্কার—এই তিন ভাবের সম্মেলনে বিচ্ছুরিত যে তীব্রতা ও উত্তাপ, তাই-ই এই লিপিদুখানিকে উপাদেয় করে তুলেছে। ভাব, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী—সকল দিক দিয়ে বিচার করলে পরে আমরা দেখতে পাই

যে, মাইকেলের প্রতিভা বীরাঙ্গনা কাব্যে তার উধ্বর্তম সীমায় এসে পৌঁছেছে।

কিন্তু এহো বাহ্য। নারীত্বের প্রতি নবজাগ্রত শ্রদ্ধাবোধের যে পরিচয় মাইকেল তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যের প্রমীলা-চরিত্রে দিয়েছেন, তারই এক নূতন রূপ আমরা পেলাম বীরাঙ্গনা কাব্যের নায়িকাদের চরিত্রে। এই কাব্যের নায়িকাদের আত্মিক বল আরো বেশি। উর্বশী, রুক্মিণী, তারা, দ্রৌপদী, শকুন্তলা, জাহ্নবী, জনা—সকল অঙ্গনাই বীর্যবতী, সকলের 'প্রেম মহিমার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই যে আত্মিক দৃঢ়তার পরিচয়, এ সর্বতোভাবে ভারতীয় সংস্কারেরই অনুকূল। কবির এই কাব্যখানির মূল্যায়ণ তাই বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য। প্রথমেই নারীত্বের পূর্ণতা সম্পর্কে উনিশ-শতকের প্রচলিত মনোভাবকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। নারীর প্রকৃত মহিমা কোথায়? মনীষী সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের মতে—"প্রেমের একাত্ম বন্ধনে নারী যেখানে পুরুষের কর্মব্রতধারিণী, পুরুষের, আশা, গর্ব, উৎসাহ, শৌর্য, বীর্য, ধর্ম, যাহা কিছু পরম প্রেয় ও পরম শ্রেয় আছে, তাহারই সেখানে স্বাধিকার, সেইখানেই নারীর যথার্থ মহিমা।" এই উক্তির আলোয় নারীর উন্নতিবিধায়ক উনিশ শতকের যাবতীয় উদ্যমকে সমশ্রেণীভুক্ত করা চলে। সতীদাহ নিবারণ থেকে বিধবা-বিবাহ আইন—এক সুরেরই পুনর্বিন্যাস। সংস্কৃত সাহিত্যে যজ্ঞানুষ্ঠানে পত্নীর কৃত্য আছে, সেই হিসাবে তাকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে সহধর্মিণী বা পত্নী। কিন্তু যজ্ঞের কাল অতীত হয়েছে. মানুষের কার্যক্ষেত্রের মধ্যে নারীকে দীর্ঘকাল আর কোনো অংশ দেওয়া হয় নি। যজ্ঞ-কর্মের সহধর্মিণীত্ব যজ্ঞের সঙ্গে শেষ হয়েছে। সেইজন্য দেখতে পাই, পরবর্তী কালের সংস্কৃত সাহিত্যে নারীর আর সহধর্মিণীরূপ নেই, সে নর্মসহচরী, ভোগ-সঙ্গিনী। তার পূর্বমহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। 'রঘুবংশ' কাব্যের রাজা অগ্নিবর্ণকে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়। উনিশ শতকের জাগ্রত বাংলার পারিবারিক জীবনের প্রতি আমরা যদি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, তাহলে দেখতে পাই যে, সেখানে রাজা অগ্নিবর্ণের মতো পুরুষদের প্রতি অন্তঃপুরচারিণীদের অন্তরে একদিকে যেমন প্রবল ধিক্কার ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি শৌর্যে, বীর্যে, ত্যাগে, সাহসে প্রকৃত পুরুষসিংহদের প্রতি তাদের অন্তরে জেগে উঠেছে

দলিলের ২য় পৃষ্ঠা

দলিলের ৩য় পৃষ্ঠা

Here you are, old Ray! — all that I can say is — "মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।"
Praying God to bless you & yours & wishing you all success in life, —
I remain
Ever your affectionate friend
Michael M. S. Dutt

য়ুরোপ যাত্রাকালে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মাইকেলের চিঠির শেষাংশের প্রতিলিপি

আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষাকে ফলবতী করতে পুরুষের প্রেরণাদায়িনী উদ্দীপ্ত অঙ্গনার প্রয়োজন দেখা দিলো এই শতাব্দীর মানসে ও মননে। তাই বীরাঙ্গনা কাব্যে স্থান লাভ করেছে কৈকেয়ী, জনা ও জাহ্নবী।

যুগ-সচেতন কবি মাইকেল জানতেন, শক্তিশালী সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে নারীর প্রয়োজন আছে—সে নারী বলদৃপ্তা, সত্যে স্থির, ন্যায়ে দৃঢ় ও কর্তব্যে অবিচলিত। সেই নারীরই অন্তরের বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়েছে তাঁর বীরাঙ্গনাকাব্যের প্রতিটি পত্রে। মাইকেলের নায়িকার অন্তরে যে দৃপ্ত তেজ আমরা অনুভব করি, পরবর্তীকালে তাই উৎসারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে। জীবনধর্মী মাইকেলের তারা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছে শৈবলিনী ও কিরণময়ীর মধ্যে। জীবনের বাস্তব সত্যের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে নারী কি ভাবে তার অন্তরের মহিমাকে মেলে ধরতে পারে - বীরাঙ্গনা কাব্যে সেই জীবনসত্যই তীব্র হৃদয়াবেগের সঙ্গে প্রতিফলিত।

এই কাব্যের প্রকৃত মূল্য এইখানেই।

মাইকেলের প্রতিভা আবার তাঁকে অস্থির করে তুললো।

মাথায় একটা নূতন খেয়াল চাপলো—বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হবেন।

বীরাঙ্গনা কাব্য রচনাকালে মাইকেল রাজনারায়ণকে যে পত্রখানি লিখেছিলেন, সেই পত্রের শেষাংশে এইটুকু ছিল :—

> "আমার কাব্যজীবন শেষ হইয়া আসিতেছে। আমি ইংলণ্ড যাইবার আয়োজন করিতেছি—ব্যারিস্টার হইবার আশায়। তাই কাব্যলক্ষ্মীকে এখন বিদায় সম্ভাষণ জানাইলাম।...আমার ইংলণ্ড গমনের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর প্রচুর উৎসাহ দেখাইতেছেন। সহজ কিস্তীতে পরিশোধ করিতে পারা যায় এইভাবে আমার সম্পত্তি বাঁধা রাখিয়া তিনি আমার ইংলণ্ড গমনের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। ব্যারিস্টারি পড়িতে আমার বিশ হাজার টাকা খরচ হইবে এবং এই ব্যয়সঙ্কুলান আমার সাধ্যায়ত্ত। আর 'কবি মধু' নয়, এখন হইতে আমি মাইকেল এম. এস. ডাট্—ব্যারিস্টার-এ্যাট-

ল, এস্কোয়ার অব দি ইনার টেম্পল।…যদি বাঁচিয়া থাকি এবং ফিরিয়া আসি, তাহা হইলে আবার দেখা হইবে। সম্ভবতঃ আমি আগামী মাসেই ইংলণ্ড রওনা হইতেছি।”

এই চিঠির তারিখ মে মাস, ১৮৬২।

মাইকেল ইংলণ্ড যাত্রা করেন ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন। আটত্রিশ বছর বয়সে তিনি বিলেতে গেলেন ব্যারিস্টারি পড়তে।

তাঁর জীবনেতিহাস পাঠ করে আমরা জানতে পারি যে, বিলাত যাওয়া ও ব্যারিস্টারি পাশ করা—এই দুটি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে গিয়ে মাইকেল তাঁর জমিদারী হারিয়ে পথের ভিখারী হয়েছিলেন। ইংলণ্ডে যাওয়া তাঁর শৈশবের স্বপ্ন—কিন্তু তখন সেই স্বপ্নের সঙ্গে মিশেছিল আর একটি আকাঙ্ক্ষা। ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করে, হোমার, দান্তে, ভার্জিল, মিলটন প্রভৃতি পাশ্চাত্যের অমর কবিগোষ্ঠীর দরবারে তিনি স্থান লাভ করবেন। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হিন্দু কলেজের ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ইংরেজিকে করেছিলেন তাঁর মাতৃভাষা আর নিজের মাতৃভাষাকে তিনি জেলে-জোলাদের ভাষা বলে অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে উনিশ শতকীয় রেনেসাঁ যুগের অয়স্কান্ত এবং তাঁর কবি-কর্মের ভিতর দিয়ে যে সেই যুগের একটি বিশিষ্ট ভাবধারা আত্মপ্রকাশ করবে—এই বিধিলিপি জীবনের অজ্ঞাতবাস অধ্যায়েও তাঁর চেতনায় ধরা দেয় নি। তাঁকে শেষ পর্যন্ত তাঁর মাতৃভাষারই শ্রেষ্ঠ কবি হতে হলো এবং সেই ভাষাতেই রচনা করতে হলো সেই যুগের প্রথম মহাকাব্য। কাজেই আটত্রিশ বছর বয়সে, কাব্যজীবন যখন নিঃশেষিত হয়ে এসেছে, অলৌকিক প্রতিভার উদ্ভাসন যখন নির্বাণোন্মুখ, তখন ইংলণ্ডে গিয়ে সেখানকার খ্যাতনামা কবিসমাজে স্থান লাভের প্রশ্ন ছিল না। তবে তিনি সেই বয়সে ইংলণ্ডে গেলেন কেন?

মাইকেলের জীবন ও চরিত্রের কোনো আচরণকে মাপতে গেলে তাঁরই গজকাঠি দিয়ে মাপতে হয়—তা নইলে তাঁর জীবনের অনেক ‘কেন’র সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না। পুলিশ কোর্টের চাকরি করে জীবনে আর্থিক উন্নতি অথবা পদোন্নতির আশা সুদূর পরাহত ছিল - কুচবিহার মহারাজের কাছে দরখাস্ত করে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিটিও যদি তিনি লাভ করতেন,

তাহলে মনে হয়, মাইকেলের ইংলণ্ড যাওয়ার সিদ্ধান্ত স্থগিত থাকতো। তাঁর মত একজন কৃতবিদ্য এবং বহুভাষাবিদ্ লোকের পক্ষে যেরূপ সামাজিক প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত ছিল, মাইকেলের ভাগ্যে তা ঘটে নি। অবশ্য 'প্রতিষ্ঠা' বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায়, তা তিনি ষোল আনার ওপর আঠার আনা পেয়েছিলেন ; কিন্তু এখানে আমরা বিচার করছি অর্থনীতিগত প্রতিষ্ঠার কথা—যে-প্রতিষ্ঠা আমরা টাকা-আনার মাপকাঠি দিয়ে মেপে থাকি। পাঁচ-খানা নাটক ও চারখানা কাব্য রচনা করে দেশজোড়া খ্যাতি তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু সেসব বই থেকে আশানুযায়ী অর্থলাভ তাঁর হয় নি। তাই মাইকেলের মনে হলো, যদি বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে ফিরতে পারেন, তাহলে তাঁর জীবনের অর্থনৈতিক বনিয়াদ হয়ত সুদৃঢ় হতে পারে। তাঁর চাল-চলন, বেশভূষার খরচ চাকরির টাকা দিয়ে মিটবার মতো ছিল না, কিন্তু পৈত্রিক জমিদারীর যেটুকু অংশ তিনি মামলা করে উদ্ধার করেছিলেন, তার আয়ের পরিমাণ তো কম ছিল না। কিন্তু উচ্চাভিলাষ ছিল মাইকেলের জীবনের চালক। তাঁর জীবনের রথ যেন কর্ণের জয়রথ। ব্যারিস্টার হতে পারলে কলকাতার বিত্তবানদের সমাজে তিনি আশানুযায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবেন—এই ধারণাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার যে, মাইকেলের ব্যারিস্টারি পড়ার ব্যাপারে নেপথ্য প্রেরণা ছিল বিদ্যাসাগরের। তিনিই মাইকেলকে এ বিষয়ে বেশি উৎসাহিত করেন।

৪ঠা জুন। ১৮৬২। বিলাত যাত্রার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। রাজ-নারায়ণকে মাইকেল চিঠি লিখছেন :

> "প্রিয় রাজনারায়ণ, আর পাঁচ দিন পরেই ইংলণ্ড যাত্রা করিব। ভগবান জানেন, আমাদের আর সাক্ষাৎ হইবে কি না। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই তোমার বন্ধুকে বিস্মৃত হইবে না। চার বছর থাকিতে হইবে—উপায় নাই। বন্ধুকে মনে রাখিও আর দেখিও তাহার খ্যাতি যেন ম্লান না হয়। আমি কবি—তাই জন্মভূমির নিকট

হইতে বিদায় লইবার পূর্বে একটি কবিতা রচনা করিয়া বিদায় লইলাম। সেই কবিতাটি তোমাকে এইসঙ্গে পাঠাইলাম। কবিতাটি উৎকৃষ্ট না হইলেও, ভদ্রলোকের পাতে দিবার মতন।···আমার শেষ কথা—"মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।" ইতি তোমার স্নেহধন্য মাইকেল এম. এস. দত্ত।"

রাজনারায়ণের এই পত্রে উল্লিখিত কবিতাটিই মাইকেলের প্রসিদ্ধ কবিতা, 'জন্মভূমির প্রতি'। কবিতাটি রাজনারায়ণ পরে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কাছে পাঠিয়ে দেন তাঁর 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশ করবার জন্য। 'সোমপ্রকাশ' ভিন্ন, কবিতাটি সেই সময়ে আরো কয়েকটি পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। মাইকেল তখন ইংলণ্ডে। মাইকেলের জনপ্রিয়তার এও একটা নিদর্শন। বিলাত যাত্রাকালে তাঁর মনের ভাব কি রকম ছিল তারই প্রতি-ফলন আছে এই কবিতাটিতে। 'আত্মবিলাপ' কবিতায় কবি তাঁর জীবনের বহু আশাভঙ্গের কথা, বহু অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এইখানে কবির মন শান্ত ও স্থির। 'শ্যামা জন্মদে' বলে জন্মভূমিকে প্রাণের সম্ভাষণ জানিয়ে কবি তাঁর কাছ থেকে প্রার্থনা করছেন অমরত্ব—এই রকম প্রার্থনা একমাত্র আত্মপ্রত্যয়ী মাইকেলের পক্ষেই সম্ভব। তিন-চার বছরের মধ্যে যে কাব্যাগুলি তিনি বাণীর চরণে অর্পণ করেছেন, কবির আশা, তাই-ই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে অমর করে রাখবে।

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
... ...
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে!

এই আশা বুকে নিয়ে বিশ্বপথিক বাঙালি কবি মাইকেল ইংলণ্ড যাত্রা করলেন।

মাইকেলের জীবন-নাট্যের দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা এইখানেই।

॥ আঠার ॥

প্রায় পাঁচ বছর পরে এই কাহিনীর তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা উঠলো কলকাতার স্পেন্স হোটেলে। তখনকার সাহেবপাড়ার বিখ্যাত এবং ব্যয়বহুল হোটেল। মাইকেল ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরলেন। তাঁর য়ুরোপ প্রবাসের মর্মন্তুদ কাহিনী সুপরিচিত এবং আমাদের এই আলোচনায় সেই কাহিনীর উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই। এই পাঁচ বছরের জীবনে তিনি বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তারও পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই পাঁচ বছরের জীবনে সবচেয়ে বড়ো যে ঘটনাটি—প্রসঙ্গতঃ সংক্ষেপে তার উল্লেখ করব। কারণ এই ঘটনার এক প্রান্তে আছেন বিদ্যাসাগর অন্য প্রান্তে মাইকেল। এক হিসাবে মাইকেল-উদ্ধার সেই ব্রাহ্মণের জীবনেরও একটি স্মরণীয় ঘটনা। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসেও এটি একটি মর্মস্পর্শী অধ্যায়।

মাইকেল তাঁর ভূ-সম্পত্তি পত্তনি দিয়ে ও খিদিরপুরের পৈত্রিক বাড়ি বিক্রী করে বিলাত যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন। অর্থাৎ একরকম সর্বস্বান্ত হয়েই তিনি তাঁর শৈশবের স্বপ্ন চরিতার্থ করেছিলেন। মাইকেলের মতো বেহিসাবী মানুষেরা চিরকালই এমনি করে থাকে, তবে তাঁর বেহিসাবের মাত্রা ছিল অপরিমিত। ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাজ করা মাইকেলের প্রকৃতিতে ছিল না কোনো দিন—তা যদি থাকতো তাহলে 'আত্মবিলাপ' কবিতা লিখবার প্রয়োজন হতো না, কিম্বা তাঁকে হাসপাতালেও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে হতো না। এ যে তাঁর বিধিলিপি ; তাই না রাবণের ব-কলমে তিনি বারবার বলেছেন—হায়, বিধির বিধি বুঝিব কেমনে ? হৃদয়ের একটি উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করবার জন্য পৃথিবীতে মাইকেলের মতো এমন ভাবে আর কেউ চরম মূল্য দিয়েছে বলে জানা যায় না। গৌর বসাক এই প্রসঙ্গে সত্যই লিখেছেন : "ইংলণ্ডে যাওয়া মধুর আজীবনের সাধ—সেই সাধ পূর্ণ করবার জন্য তিনি তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি হেলায় নষ্ট করেছিলেন।"

জমিদারী পত্তনি নিয়েছিলেন মহাদেব চট্টোপাধ্যায়। ইনি মুন্সী রাজনারায়ণ দত্তেরই একজন কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁরই অন্নে প্রতিপালিত হয়েছিলেন।

সেই অন্নদাতার একমাত্র পুত্রের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাঁর জমিদারী গ্রাস করে ভদ্রলোক কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। পত্তনির অছি ছিলেন দুইজন, রাজা দিগম্বর মিত্র ও বৈদ্যনাথ মিত্র। শেষোক্ত ব্যক্তি মাইকেলের আপন পিসতুতো ভাই। এই দিগম্বর মিত্রের কারসাজিতেই মাইকেলের পৈত্রিক সম্পত্তির অনেকখানি বেহাত হয়ে যায়। দিগম্বর মাইকেলের সহপাঠী ও বন্ধু ; এঁরই নামে কবি তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান, মেঘনাদবধ কাব্য উৎসর্গ করেছিলেন। বন্ধুর এই ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়েই মাইকেল সেই কাব্যের তৃতীয় সংস্করণ থেকে ঐ উৎসর্গপত্র প্রত্যাহার করেন—এ ছাড়া তাঁর মনের ক্ষোভ প্রকাশের অন্য উপায় ছিল না। ব্যবস্থা হয়েছিল যে, পত্তনিদার মাইকেলকে তাঁর ইংলণ্ড যাত্রাকালে অগ্রিম কিছু দেবেন এবং প্রতি মাসে ইংলণ্ডে তাঁর খরচ বাবদ কিছু টাকা আর কলকাতায় তাঁর পরিবারবর্গের খরচ বাবদ কিছু টাকা দেবেন। কিছুকাল পরে মহাদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। ফলে মাইকেলের ইংলণ্ড যাত্রার প্রায় এক বছর বাদেই আঁরিয়েতাকে পুত্রকন্যা-সহ স্বামীর কাছে যেতে হয়। দুর্দশা ও আর্থিক কষ্টের শুরু তখন থেকেই। এমন কি কলকাতায় থাকবার সময়ে মাইকেল খিদিরপুরে তাঁর পরিচিত কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে অনেক টাকা—কাউকে পাঁচশো, কাউকে হাজার—ধার দিয়েছিলেন। বিলেত থেকে বার বার চিঠি লিখেও তাদের কাছ থেকে তিনি কোনো জবাব পান নি। প্রবাসে অর্থ-সংকট যখন চরমে উঠল—অনশনে মৃত্যু এবং অর্থাভাবে কারাবাস যখন একরকম অবধারিত—সেই সময়ে বিপন্ন মাইকেল স্মরণ করলেন বিদ্যাসাগরকে। সাগরপারে মহাবিপন্ন মাইকেলকে উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর সেদিন শুধু মাইকেলকে রক্ষা করেন নি—বাংলার মুখও রক্ষা করেছিলেন। ভার্সাই থেকে মাইকেল ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখছেন:

> "প্রিয় পণ্ডিত, তুমি শুনিয়া চমকিত ও গভীর দুঃখে অভিভূত হইবে যে, দুই বৎসর পূর্বে উচ্ছ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে তোমার নিকট যে ব্যক্তি বিদায় লইয়াছিল, আজ এইক্ষণে আমি সেই সবলকায় ও প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তির ভগ্নাবশেষ মাত্র, এবং কয়েকজন লোকের নিষ্ঠুরতা, বোধাতীত নির্মম ব্যবহারের জন্য আমি এইরূপ দুর্বিপাক মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি।

আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইহাদের মধ্যে একজন আমার পিতার কর্মচারী আর অপর জন আমার হিতাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃৎ।...আমার চারি হাজার টাকা স্বদেশে পাওনা, তবু আমি অর্থাভাবে বিদেশের কোনো কারাগারে যাইতেছি, আর আমার স্ত্রী ও সন্তানেরা কোনো অনাথ আশ্রমে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইল। যে দুরবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, ইহা হইতে উদ্ধার করিতে তুমিই একমাত্র সুহৃৎ।"

য়ুরোপ থেকে মাইকেল বিদ্যাসাগরকে একাধিক চিঠি লিখেছিলেন। এর মধ্যে অনেকগুলিই দীর্ঘ। সব চিঠিই ইরেজিতে। এই সব চিঠিপত্রে তাঁর আর্থিক অবস্থার কথা—কে তাঁর সম্পত্তি ফাঁকি দিলো, কে টাকা ধার নিয়ে পরিশোধ করে নি, কোন্ আত্মীয় তাঁকে বঞ্চিত করেছে তা বিশদভাবে বর্ণিত আছে। মাইকেল-উদ্ধার নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি সুমহৎ কর্ম। মাইকেলকে সাহায্য করতে গিয়ে ব্রাহ্মণ নিজেও কম বিপদগ্রস্ত হন নি এবং কবি তা বিলক্ষণ জানতেন। তবু বিদ্যাসাগরই ছিলেন সেদিন বিদেশে বিপন্ন কবির একমাত্র ভরসা। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের এক পত্রে মাইকেল তাই অকপটে লিখছেন (ইংরেজি পত্রের মধ্যে এই অংশটুকু মাইকেলের নিজস্ব বাংলা):

"আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে, এ হতভাগার বিষয়ে হস্ত নিক্ষেপ করিয়া আপনি এক বিষম বিপদজালে পড়িয়াছেন। কিন্তু কি করি? আমার আর এমন একটি বন্ধু নাই, যে তাহার শরণ লইয়া আপনাকে মুক্ত করি।...এ শরণাগতজনকে রক্ষা করিতে হইবেক। এ কথাটি যেন সর্বদা স্মরণ পথে থাকে।"

পরবর্তী কাহিনী সুপরিচিত এবং এখানে তার বিস্তারিত উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই। সত্যের খাতিরে এখানে শুধু একটি বিষয়ের উল্লেখ করব। মাইকেল বিদ্যাসাগরের ঋণ পরিশোধ করেন নি বা করতে পারেন নি—এই অপবাদ চিরকালের মতো রয়ে গেছে। এর জন্য দায়ী দু'জন—মাইকেলের জীবনচরিত-লেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু ও বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকৃত ইতিহাস কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ভার্সাই থেকে

বিপদাপন্ন মাইকেলের প্রথম চিঠি পেয়ে (চিঠির তারিখ ২রা জুন, ১৮৬৪) বিদ্যাসাগর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছ থেকে কোম্পানীর কাগজ ধার করে প্রথমে দেড় হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন। মাইকেলের তখন দরকার ছিল পনর হাজার টাকা। তখন বিদ্যাসাগরের নিজের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল—এত টাকা দেবার সঙ্গতি তাঁর ছিল না, অথচ না দিলে মাইকেলের ব্যারিস্টারি পড়া শেষ হয় না। তখন বিদ্যাসাগর চিঠি লিখে মাইকেলের বিষয়-সম্পত্তির প্রকৃত অবস্থা অবগত হন এবং তাঁকে যথারীতি একটি আমমোক্তারনামা বা power of Attorney দেবার জন্য তিনি মাইকেলের কাছে প্রস্তাব করেন। মাইকেল সেই প্রস্তাবে রাজী হয়ে বিদ্যাসাগরকে তাঁর বিষয়-সম্পত্তির অছি বা সম্পত্তিপরিচালক নিযুক্ত করেন। এই সম্পর্কিত দলিল মাইকেল প্যারিস থেকে কলকাতায় তখনকার Registrar-General of Assurance-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। এই দলিলের তারিখ ২৩শে জুন, ১৮৬৫। তারপর বিদ্যাসাগরের মারফৎ মাইকেল জজ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শতকরা পনর টাকা সুদে পনর হাজার টাকা কর্জ করেন এবং এই ঋণ গ্রহণের সময়ে মাইকেলের এজেণ্ট হিসাবে বিদ্যাসাগর মাইকেলের খুলনার চক্ মুনকিয়ার সম্পত্তি (খুলনা তখন যশোহরের সাব ডিভিসন ছিল) অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের নিকট বন্ধক রাখেন। পরে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, য়ুরোপ থেকে ফিরবার এক বছর বাদে, মাইকেল সেই বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রী করে অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের ঋণ পরিশোধ করেন। সেই দেনা তখন সুদে-আসলে উনিশ হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছিল। প্রায় পাঁচ হাজার বিঘার একটি বিরাট সম্পত্তি মাইকেল মাত্র কুড়ি হাজার টাকায় বিক্রী করে ঋণমুক্ত হয়েছিলেন। এই সম্পর্কিত মূল দলিলখানির নকলের একটি প্রতিলিপি এই গ্রন্থের অন্যত্র দেওয়া হলো। অনুমান হয়, যিনি পনর হাজার টাকার দেনা শোধ করেছিলেন, তাঁর পক্ষে অন্য কোনো সম্পত্তি বিক্রী করে বিদ্যাসাগরের দেড় হাজার টাকার দেনা পরিশোধ করা অসম্ভব নয়।* সুতরাং মাইকেল বিদ্যাসাগরের ঋণ

*মাইকেলের বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় দলিল আলিপুরের রেজেষ্ট্রী অফিসে ও রাইটার্স বিল্ডিং-এ অবস্থিত পশ্চিম বঙ্গের রেজেষ্ট্রী অফিসে সংরক্ষিত আছে। কোনো উৎসাহী গবেষক যদি এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে পারেন, তাহলে আমার ধারণা, মাইকেলের বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত অনেক চমকপ্রদ তথ্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।

পরিশোধ করেন নি, এ অপবাদ নিতান্তই অমূলক। তবে এ কথা ঠিক যে, সেদিন বিদ্যাসাগর না থাকলে ফ্রান্সে মাইকেলের মৃত্যু অবধারিত ছিল। সেই ঋণ অবশ্য অপরিশোধ্য ছিল।

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের কথা, তাঁর অসীম করুণা ও স্নেহের কথা মাইকেল তাই কিছুতেই বিস্মৃত হন নি। কবি তাঁর হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, য়ুরোপে থাকতেই, একটি অপূর্ব সনেটে চিরদিনের মতো লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেলন ঃ

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে!
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!

এ শুধু কবিতা নয়, সাগর-চরণে মাইকেলের অন্তরের শুভ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। ঊনবিংশ শতকের এই দুই শ্রেষ্ঠ বাঙালির মধ্যে যে যোগাযোগ ঘটেছিল, সে ইতিহাস প্রত্যেক বাঙালির কাছে চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষাপ্রদ। বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রতি মাইকেলের সমর্থন প্রকাশ পেয়েছিল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা রাজনারায়ণকে একখানি চিঠিতে। সেই চিঠিতে মাইকেল লিখেছিলেন ঃ "বিধবা বিবাহের প্রবর্তক হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটি মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিৎ—আমি তাহার জন্য আমার বেতনের অর্ধেক প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।"—এই কয়টি কথার মধ্যেই বিদ্যাসাগরের প্রতি মাইকেলের অসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্যাসাগর মিথ্যা বলেন নি, মধু একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দীপ্তি কোনো দিনই ম্লান হবার নয়।

এইবার ফরাসীদেশে অবস্থানকালে মাইকেলের সাহিত্যপ্রয়াসের কথা।

আধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্যে মাইকেলের মতো বহু ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিত আর কেউ নন। আমরা দেখেছি, মাদ্রাজের অজ্ঞাতবাসজীবনে মাইকেল হিব্রু, গ্রীক, তেলেগু, সংস্কৃত প্রভৃতি কয়েকটি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। য়ুরোপে এসেও তিনি ফরাসী, ইতালিয়ান ও জার্মান ভাষা বিশেষরূপে আয়ত্ত করলেন। মনে রাখতে হবে, তখন মাইকেলের বয়স চল্লিশ বছর।

২৬শে জানুয়ারি, ১৮৬৪, ভার্সাই থেকে বন্ধুবর গৌরদাস বসাককে এক চিঠিতে মাইকেল লিখেছেন যে তিনি এখন ছয়টি য়ুরোপীয় ভাষায় সুপণ্ডিত। ৩রা নভেম্বরের এক চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে তিনি লিখছেন :

> "আমি ফরাসী ও ইতালিয়ান ভাষায় দক্ষতা প্রায় অর্জন করিয়াছি এবং এক্ষণে জার্মান ভাষা শিখিতেছি—এবং এ সবই আমি ভাড়াটে শিক্ষকের সহায়তা ভিন্নই আয়ত্ত করিয়াছি।"

আমরা জানি, অর্থকষ্টে পড়ে মাইকেল ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে গিয়েছিলেন। সেখানে ভাষা শিক্ষার সুবিধা ছিল। ফরাসীদেশে তাঁর থাকবার এই একটা কারণ। মাইকেল ফরাসীদেশকে সত্যই ভালবাসতেন। দুঃখের দিনেই তিনি ফরাসী ভাষা শিখেছিলেন। ঋণের দায়ে যখন কারাবাস ছিল অবধারিত, তখন এক সহৃদয়া ফরাসী মহিলাই তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন। সেইজন্যই কি গৌরদাসকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন : "London is not half so pleasant a place to live in as this country ?" এই চিঠি থেকে আমরা আরো একটি বিষয় জানতে পারি। মাইকেল সেই সময়ে (১৮৬৪) ফ্রান্সের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলেন।

মাইকেল ফরাসী লিখতেন ; ফরাসী ও ইতালিয়ান ভাষায় কবিতা রচনা করে অবসর বিনোদন করতেন। মাইকেল যখন ফ্রান্সে অবস্থান করেন সেই সময় মহাকবি দান্তের মৃত্যুর ত্রিশতবার্ষিক মহোৎসব সম্পন্ন হয়। য়ুরোপীয় অনেক কবি এই উপলক্ষে কবিতা-উপহার পাঠিয়েছিলেন। মাইকেলও এই উপলক্ষে বাংলায় একটি কবিতা রচনা করেন এবং সেটি ফরাসী ও ইতালিয়ান ভাষায় অনুবাদ করে ইতালিরাজের নিকট পাঠিয়েছিলেন। ইতালিরাজ ভিক্টর ইমানুয়েল তা পাঠ করে প্রীতি প্রকাশ করে মাইকেলকে এক পত্র লিখেছিলেন, এবং তাতে লিখেছিলেন—আপনার কবিতা গ্রন্থিরূপে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে সংযুক্ত করবে। এ ছাড়া, মাইকেল ফরাসী কবি ও ঔপন্যাসিক ভিক্টর হুগোকে একটি সনেট লিখে সম্মান দেখিয়েছিলেন। ভিক্টর হুগো, টেনিসন ও প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত থিওডোর গোল্ডষ্টুকার—সকলেই মাইকেলের পাণ্ডিত্য এবং প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। য়ুরোপে মাইকেলের ভাষা-শিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন :

> "শুধু ভাষা শিক্ষা করিয়াই তিনি নিরস্ত হন নাই; একখানি ইংরাজি কাব্য এবং বাংলা ভাষায় 'সুভদ্রাহরণ', 'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর' ও 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের' পুনর্লিখন প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়াভাবে সেগুলি সম্পূর্ণ হয় নাই। বস্তুতঃ আইন অধ্যয়ন, ভাষা শিক্ষা, এবং বিশেষতঃ সাংসারিক ব্যয়নির্বাহের বন্দোবস্ত করিতে, তাঁহার এত সময় ব্যয়িত হইয়াছিল যে, তাঁহার চক্ষের পলক ফেলিবার অবকাশ ছিল না।"

আমরা দেখতে পাই যে, মাইকেলের মানস-উদ্যানে কল্পনার বহু কুসুমই পূর্ণ প্রস্ফুটিত হবার আগেই কোরক অবস্থায়ই বৃন্তচ্যুত হয়েছে। সমুদ্রযাত্রার বিস্তৃত কাহিনী তিনি লিখবেন সংকল্প করেছিলেন, কিছুটা লিখেও ছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেন নি।

মাইকেল ফরাসী সাহিত্য পাঠ করেছিলেন; ফরাসীতে কবিতা লিখেছিলেন। ইতালিয়ান ও ফরাসী ভাষার কয়েকটি কবিতা তিনি বাংলা ভাষায় নিজের মতো করে লিখেছিলেন। সেগুলি সংখ্যায় অতি অল্প ও মাইকেলের গৌরব তাদের দ্বারা বিশেষ বৃদ্ধি পায় নি। কোন্ কোন্ ফরাসী কবিতার অনুকরণ তিনি করেছিলেন, মাইকেলের জীবনীকারদের মধ্যে কেউই তা বলতে পারেন নি। যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেন: "নীতিমূলক কবিতাগুলি Æsop's Fables-এর আদর্শে, বাংলা কথামালার প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল।" ইহা সম্পূর্ণ ভুল। মাইকেলের হিতোপদেশমূলক কবিতাগুলি ঈসপের নয়, লা ফন্‌ত্যানের (La Fontaine) অনুকরণে লেখা। মাইকেল ও ফন্‌ত্যানের কবিতায় আশ্চর্য রকমের মিল আছে—ভাষার মিলও দেখতে পাওয়া যায়। মাইকেল ঠিক অনুবাদ করেন নি; লা ফন্‌ত্যান্ যেমন ঈশপের গল্পগুলো নিজের মনের মতো করে লিখেছেন, মাইকেলও লা ফন্‌ত্যানের গল্পগুলি মনের মতো গুছিয়ে লিখেছেন। লা ফন্‌ত্যানের 'ওক ও শরগাছ,' মাইকেলের হাতে 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা'য় রূপান্তরিত হয়েছে। মাইকেলের এই কবিতাটির প্রথম স্তবক হুবহু লা ফন্‌ত্যানের অনুকরণে লেখা। বাকী অংশটুকু মাইকেলের নিজস্ব

কল্পনা। তেমনি মাইকেলের 'ময়ূর ও গৌরী' লা ফন্‌ত্যানের 'জুনোর নিকট ময়ূরের নিবেদন' কবিতার হুবহু অনুবাদ। কেবলমাত্র ফরাসী কবির 'সিংহ ও মশক' কবিতাটিকে মাইকেল তাঁর 'সিংহ ও মশক' কবিতায় এক নূতন রূপ দিয়েছেন। এই কবিতাটিকে সম্পূর্ণ নূতন বললেও চলে। এই অনুকরণের স্বীকৃতি মাইকেলের চিঠিতেই আছে। ১৮৬৪, ২৬শে অক্টোবর গৌরদাসকে লেখা চিঠির শেষাংশে মাইকেল লিখছেন:

> "I have not been doing much in the poetical line of late beyond imitating a few Italian and French things"

মাইকেলের প্রধান জীবনীকার লিখেছেন: "এই কবিতাগুলি হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি গম্ভীর বিষয়ের ন্যায় সহজ সরল বিষয়েও মধুসূদনের প্রতিভা কিরূপ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইত।" কিন্তু মূল ফরাসীর তুলনায় বাংলা কবিতাগুলি যথেষ্ট সুন্দর নয়। এই নীতিমূলক কবিতাকয়টিতে মাইকেলের যশ কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় নি এবং বাংলা সাহিত্যেও এগুলি স্থান পায় নি। মাইকেল যখন কাব্যরচনায় পূর্ণচ্ছেদ টেনেছেন, তখনই এই *imitation* কবিতাগুলি রচিত হয়।

এইবার মাইকেলের সনেটের কথা।

মাইকেলের প্রবাসজীবনের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম চতুর্দশপদী কবিতা রচনা। এই-ই তাঁর শেষ কবিকর্ম। বাংলা ভাষায় চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম জন্ম ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের হাতে। ঐ সময়ে ইতালিয় ভাষা-সাহিত্যে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রবেশ শুরু হয়েছে। রাজনারায়ণের কাছে একটি চিঠিতে মধুসূদন তাঁর প্রথম সনেটটি লিখে পাঠিয়েছিলেন। এই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "I want to introduce the sonnet into our language" এবং তিনি যা সংকল্প করেছিলেন তা তিনি সিদ্ধ করেন সুদূর য়ুরোপে বসে। ১৮৬০-এ যে বীজটী বাংলার উর্বর কাব্যক্ষেত্রে—মাইকেলের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়েছিল, তারই পরিণতি আমরা প্রত্যক্ষ করি পাঁচ বছর পরে। কবি তখন

ফরাসী দেশের ভার্সাই নগরে। অর্থাৎ বিলেত যাবার তিন বছর পরে তাঁর এই কাব্য-প্রয়াস। তখন মাইকেলের মানসিক উদ্বেগ বড় কম ছিল না, বরং নিদারুণই বলা চলে। কিন্তু তাঁর কাব্যসাধনা তো জীবনব্যাপী অশান্তি ও অতৃপ্তির মধ্যেই। এই সময়ে (১৮৬৫, ২৭শে জানুয়ারী) গৌরদাস বসাককে মাইকেল একখানি পত্রে লিখছেন ঃ

> "প্রিয় গৌর, আমি সম্প্রতি ইতালির কবি পেত্রার্কার কাব্য পড়িতেছি এবং তদনুকরণে কতকগুলি চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনা করিয়াছি। তোমাকে চারিটি পাঠাইলাম।···তুমি নকল করাইয়া যতীন্দ্র ও রাজনারায়ণকে পাঠাইবে ও তাঁহাদের মতামত আমাকে জানাইবে। চতুর্দশপদী কবিতা আমাদের ভাষায় চমৎকার লাগিবে, ইহা বলিতে আমার সাহস হয়।"

মাইকেলের কবিজীবনের এই একটি বৈশিষ্ট্য। যখনই নূতন কিছু ভেবেছেন, কিম্বা নূতন কিছু রচনা করেছেন, সর্বাগ্রে তা পাঠিয়েছেন তাঁর কাব্যরসিক বন্ধুদের কাছে এবং সব সময়েই তিনি আমন্ত্রণ করেছেন তাঁদের মতামত। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। বলা বাহুল্য, যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ বন্ধুজন মাইকেলের এই নূতন কাব্যপ্রয়াসের যথেষ্ট প্রশংসা করলেন এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'রহস্যসন্দর্ভ' পত্রিকায় এই অভিনব কবিতাচতুষ্টয় প্রকাশ করলেন। কলকাতার বিদগ্ধ মহলের প্রতিক্রিয়া যথাসময়ে মাইকেলের কাছে গিয়ে পৌঁছল ; তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। কিছুকাল পরে একশতটি সনেট সম্বলিত চতুর্দশপদীর পাণ্ডুলিপি কলকাতায় তাঁর প্রকাশক ঈশ্বরচন্দ্র দাসের হাতে এসে পৌঁছল। ভার্সাইতে কোনো বাঙালি লিপিকার ছিল না—মাইকেল নিজের হাতেই চতুর্দশপদীর পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন। বই বেরুলো ১৮৬৬র আগষ্ট মাসে। পাঁচটি কবিতা য়ুরোপের বিষয় নিয়ে রচিত ; বাকী সবই বাংলা ও ভারতের বিষয় নিয়ে রচিত। বাংলার কথাই বেশি।

বাংলার জয়দেব, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত এবং ভারতের বাল্মীকি, কালিদাস, য়ুরোপের দান্তে, ভিক্টর হুগো, টেনিসন, প্রভৃতি কবিদের উদ্দেশেই মাইকেল যেমন সনেটগুলি দান করেছেন, তেমনি ভারতের অমর-কাব্য মহাভারত, রামায়ণ ও মেঘদূতকেও স্মরণ করে তিনি কয়েকটি সনেট

রচনা করেছেন। অন্তরে মাইকেল যে কতখানি বাঙালি ছিলেন, চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তিনি তার সুস্পষ্ট পরিচয় রেখে গেছেন। মাইকেলের সনেট তাই একাধারে কবিতা ও কবি-চেতনার ইতিহাস।

তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে আমরা একটি জিনিস দেখতে পাই—মাইকেলের চোখে বাংলা দেশ কী নিবিড়ভাবে ধরা দিয়েছে। চতুর্দশপদীর মধ্যে এই বাংলার রূপ আরো সমগ্রভাবে আছে তার অতীত ও বর্তমানের ধারা নিয়ে। চতুর্দশপদীর দ্বিতীয় কবিতা—'বঙ্গভাষা'। এটি মাইকেলের একটি মূল্যবান কবিতা। এই কবিতাটি মাইকেল প্রথম রচনা করেন ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। তখনকার পাঠের সঙ্গে পাঁচ বছর পরে লেখা দ্বিতীয় পাঠের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য অনেক; ভাবগত পার্থক্যও কিছু আছে। সুদূর ফ্রান্সে কবি যখন প্রবাসবেদনায় ক্লিষ্ট, তখন তিনি লিখেছেন:

"......পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।"

সুদূর সাগরপারে শ্যামা বঙ্গভূমির রূপৈশ্বর্যকে কবি নূতন দৃষ্টিতে যেন প্রত্যক্ষ করলেন—ফিরে এলেন তিনি কপোতাক্ষের কূলে। "এবার যেন তাঁর কাব্যের বিষয় বাংলা দেশ—অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের প্রকৃত বাংলা। প্রকৃত পক্ষে চতুর্দশপদী কাব্য বাংলার জীবনেরই একটি মহাকাব্যের খসড়া। কপোতাক্ষ তটভূমিতে দ্বাদশ শিবের মন্দির, প্রাচীন বটের ছায়ায় দোল-শ্রীপঞ্চমীর উৎসবমুখর গ্রামভূমি, আশ্বিনের স্নিগ্ধ আকাশ, দূরে শান্ত মধুকর গুঞ্জন, শতাব্দীর পুরাতন কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্রের স্মৃতিমুখর বাংলাদেশ। এমন করে বাংলা দেশকে ইতিপূর্বে আর কেউ দেখেন নি।" মেঘনাদবধের মতো চতুর্দশপদীও জাতীয়তার কাব্য এবং মাইকেলের সনেট-গুলির প্রকৃত মূল্য এইখানেই। মাইকেলের সনেট মর্মপীড়িত জীবনাহুভূতি।

সমালোচকদের মতে—"চতুর্দশপদী কবিতাবলী মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই কবিতাগুলির মধ্যে কবি যতটা আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তেমন আর কোথাও নয়। সনেটই নবীন কবিতায় মধুসূদনের সফলতম সৃষ্টি।" কিন্তু মাইকেলের সনেটের সবকয়টিই যে উৎকৃষ্ট এবং রসোত্তীর্ণ, এমন কথা বলা চলে

না। এমন কি, যে চল্লিশটি কবিতায় মাইকেল পেত্রার্কার ছন্দরীতির অনুসরণ করেছেন, তার সব কয়টিও সার্থক সনেট নয়। কোনো কোনো সনেটে তিনি শেক্সপীয়ারকেও অনুসরণ করেছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ কাব্য-বিচারে চতুর্দশ-পদীর অন্তর্নিহিত মূল ভাবসৌন্দর্য মাইকেলের কবিতায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। মাইকেলের সনেট পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ সেনের হাতেই পূর্ণতা লাভ করেছিল। তবে এ কথা সত্য যে, এই চতুর্দশপদীর বহু কবিতায় মাইকেল তাঁর হিন্দু ভাবপ্রবণতা ও অসীম স্বদেশপ্রীতির পরিচয় প্রদান করেছেন এবং এইখানেই তাঁর মহতী সাহিত্যসাধনায় পূর্ণচ্ছেদ।

চতুর্দশপদীর শেষ কবিতাটির নাম 'সমাপ্তে'। বাংলা ভাষাকে সম্বোধন করে কবি লিখলেন :

বিসর্জিব আজি মা গো, বিস্মৃতির জলে
হৃদয়-মণ্ডপ হায় অন্ধকার করি ও প্রতিমা!

"এই কবিতায় মধুসূদনের কবি-জীবনের যবনিকা-পতন হইয়াছে। ইহাই তাঁহার কাব্যকুঞ্জের শেষ বংশীধ্বনি।" সনেটের সঙ্গেই মাইকেলের কবিতাগত জীবনের প্রকৃত পরিসমাপ্তি। কীর্তিক্লান্ত কবি জীবন-সায়াহ্নে তাঁর বাণী-প্রতিমাকে বিস্মৃতির জলে বিসর্জন দিয়ে, অবশেষে স্বদেশে ফিরলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন তিনটি ভাষারত্নের মূল্যবান পণ্য, বিপুল ঋণের বোঝা আর হোমার, দান্তে, ভার্জিল, শেক্সপীয়ার ও মিলটন প্রভৃতি য়ুরোপীয় মহাকবিদের মর্মরমূর্তি এবং জার্মান, ইতালি, ফরাসী ভাষার কিছু দুর্লভ গ্রন্থাবলী।

॥ উনিশ ॥

মাইকেল এসে উঠলেন সাহেব পাড়ার বিলাতি হোটেলে, বিদ্যাসাগরের সকল আয়োজনকে উপেক্ষা করে। কিন্তু মাদ্রাজের অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরে আসা আর এইবার য়ুরোপ থেকে ফিরে আসার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য ছিল। সেদিন মাইকেল ছিলেন অখ্যাত এবং উপেক্ষিত। আজ কিন্তু তিনি কীর্তিমান কবি—উনবিংশ শতকের প্রতিনিধি কবি। আজ তাঁর হাতে নবজাগরণের প্রদীপ্ত মশাল—সেই মশালের আলোকে তিনি বাঙালির মন রাঙিয়ে দিয়েছেন। তার ওপর এখন তিনি ব্যারিস্টার। তাই মধুসূদন ফিরেছেন—এই বার্তা শহরে রটে গেল এবং দলে দলে তাঁর গুণগ্রাহী বন্ধুরা ছুটে এলেন তাঁদের প্রিয় কবিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। মাইকেলের এক জীবনচরিতকার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> "মধুসূদন প্রত্যেকের সহিত করমর্দন করিয়া, তাঁহার স্বভাবসুলভ মধুর বচনে আপ্যায়িত করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উপস্থিত হইবামাত্র মধুসূদন তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া, দুই হস্তে তাঁহার গলা জড়াইয়া মুখ চুম্বন করিলেন, এবং আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ক্রমাগত চুম্বন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন··· রামকুমার বিদ্যারত্ন সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, মধুসূদন তাঁহাকে দুই ভুজ প্রসারণ পূর্বক প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া, তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন এবং পণ্ডিতকে পাশে বসাইয়া, কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া নানা কথায় তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।"

য়ুরোপ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর মাইকেল বেঁচে ছিলেন মাত্র দু বছর। এই দু বছরের কাহিনী তাঁর জীবনের ব্যর্থতা ও বেদনার কাহিনী এবং অর্থ-চিন্তার কাহিনী। বাঙালির নিকট সে কাহিনী অতি সুপরিচিত। এখানে তার উল্লেখ নিস্প্রয়োজন। হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করতে গিয়ে তিনি প্রবল বাধা পেয়েছিলেন। ব্যারিস্টারি ব্যবসায়েও তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং অর্থাগম আশানুযায়ী হয় নি। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন :

"যদি পৃথিবীতে ব্যারিস্টারি করিবার অনুপযুক্ত কোনও লোক জন্মিয়া থাকে তিনি মধুসূদন দত্ত। তাঁহার প্রকৃতির অস্থিমজ্জাতে ছিল ব্যারিস্টারির বিপরীত বস্তু।"

মাইকেলের মেজাজের সঙ্গে আইনজীবির পেশা খাপ খাওয়া আদৌ সম্ভব ছিল না। তোষামদ ছিল তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। বিচারপতিদের সঙ্গে তিনি প্রায়ই বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হতেন। বেঞ্চ ও বারের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভেদরেখা আছে, মাইকেলের স্বাধীন প্রকৃতি তা কিছুতেই মানতে চাইত না। বন্ধু গৌর বসাক এজন্য তাঁকে কতবার সাবধান করে দিতেন। কিন্তু অমিততেজস্বী মাইকেলের সেই এক জবাব—"I can never brook anybody's bullying, তা তিনি যিনিই হউন না কেন?" তার ওপর প্রৌঢ় বয়সে তাঁর কণ্ঠস্বর বিকৃত ও কর্কশ হয়েছিল। ব্যবসায়ের পক্ষে এটাও ছিল একটা বড়ো অন্তরায়। এ ছাড়া, "কাব্যামোদী ও নাট্যামোদী বন্ধুগণকে পাইলে মধুসূদন কাজকর্ম ভুলিয়া যাইতেন।" তথাপি তাঁর জীবনেতিহাস পাঠ করে আমরা জানতে পারি যে, ব্যারিস্টারিতে মাইকেলের মাসিক আয় দু'হাজার টাকা পর্যন্ত হয়েছিল। একা মানুষ—তাঁর পক্ষে দু'হাজার টাকা কম নয়। মাইকেল বিলেত থেকে একলাই ফিরেছিলেন; আঁরিয়েতা পুত্র-কন্যাদের নিয়ে সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন। তিন বছর পরে তিনি এসে স্বামীর সঙ্গে আবার মিলিত হন। স্ত্রী-পুত্রকে প্রবাসে রেখে আসার কারণ—আর্থিক অসচ্ছলতা এবং মাইকেল ঠিক করেছিলেন যে, সপরিবারে থাকবার মতো আইন ব্যবসায়ে অর্থাগম হলেই তিনি স্ত্রী-পুত্রদের ভারতে নিয়ে আসবেন। দু'হাজার টাকা আয় হলে কি হয়—বেহিসাবী মাইকেলের পক্ষে তা সামান্যই। তাঁর নিজের খরচ হাজার টাকার কমে কিছুতেই কুলোত না—তার ওপর আঁরিয়েতাকে প্রতি মাসে তিনশো-চারশো টাকা পাঠাতে হতো।

বিপুল ঋণভার পিঠে নিয়েই মাইকেল দেশে ফিরেছিলেন। আইন ব্যবসায়ে আশাতীত উন্নতি হলো না, অথচ ব্যয়সঙ্কোচও তিনি কিছুতেই করতে পারলেন না। ফলে স্ত্রীকে টাকা পাঠানো অনিয়মিত হয়ে ওঠে। পত্নী-অন্ত প্রাণ মাইকেল। ধার করে টাকা পাঠাতে লাগলেন। পৃথিবীতে তাঁকে ধার দেবার মানুষ একজনই ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর।

এই সময়ে ছোট আদালতে জজের পদ খালি হয়। বিদ্যাসাগর মাইকেলের অনুরোধে তাঁর জন্য সেই চাকরির চেষ্টা করেন। অর্থাগম না হলেও, কলকাতার বিদ্বদ্‌সমাজে এবং সকল সম্ভ্রান্ত পরিবারে মাইকেলের প্রতিষ্ঠা ও সম্মান এই সময়ে পূর্বাপেক্ষা শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং মধুর চরিত্রে সকলেই আকৃষ্ট হতেন—বররুচি মাইকেলের বন্ধুত্ব ছিল সকলের কাম্য। সম্ভ্রান্তবংশের পুরমহিলারা পর্যন্ত মাইকেলকে তাঁদের অন্তঃপুরে এনে সমাদরের সঙ্গে ভোজন করিয়ে তৃপ্তি পেতেন। এমন সৌভাগ্য বাংলা দেশে সেদিন আর কারো ভাগ্যে ঘটে নি।

মাইকেল যখন দেশে ফিরলেন তখন বাংলার সাহিত্য-গগন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার দ্যুতিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। নাটকের ক্ষেত্রে দীনবন্ধুর প্রতিভাও এনে দিয়েছে যুগান্তর। মাইকেলের প্রতিভা তখন নিঃশেষিত—তাঁর নূতন কিছু দেবার ছিল না। বাণীর সাধনায় তিনি এই সময়ে একরকম বিরত ছিলেন বললেই হয়। কেবলমাত্র তাঁর "কবিত্ব-সৌরভ এক্ষণে রৌদ্রদীপ্ত বৈশাখের স্বর্ণোজ্জ্বল আম্রমঞ্জরীর প্রাণহরা সুবাসের ন্যায় দিগ্‌দেশ আমোদিত" করে ফিরছিল। মাইকেলের কবিজীবনের একমাত্র পুরস্কার এই যে, জীবিত কালেই তিনি অকুণ্ঠ সমাদর লাভ করেছিলেন। মেঘনাদের সিংহগর্জন আর ব্রজাঙ্গনার মুরলি-নিস্বন তখনো বাংলার কাব্য-সংসারকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। তখনো তাঁর নাটকের অভিনয় নাট্যামোদীদের পরম আকর্ষণের বিষয় ছিল।

কিন্তু মাইকেলের সকল চিন্তা-ভাবনা তখন একটি বিন্দুতে এসে সংহত হয়েছে—অর্থ। আশে পাশে কত ধনী লোক—তাঁদের সকলেরই যে বিদ্যাবুদ্ধি আছে তা নয়—তবু সমাজে অর্থকৌলীন্যে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ। বিত্তহীন জীবন মাইকেলের কল্পনার বাইরে—চল্লিশ হাজার টাকার কম কোনো ভদ্রলোকের চলে না—এই ছিল তাঁর ধারণা। কিন্তু জীবন-সায়াহ্নে ভাগ্যলক্ষ্মী এমন ভাবে মুখ ফেরালেন যে, কিছুতেই তিনি তাঁর ঈপ্সিত অর্থ উপার্জন করতে পারলেন না। এই ব্যর্থতাই তিলে তিলে তাঁর দেহকে ক্ষয় করছিল, আর মনকে করছিল শূন্য। কোন্ ধূসর ছায়ালোকে মিলিয়ে গেছে আজ তাঁর সেই গগনবিহারী

কবি-কল্পনা। এই অভাব, এই ব্যর্থতার মধ্যে মাইকেলের কবি-সত্তা তখন সম্পূর্ণ ভাবেই অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বেঁচে ছিল শুধু তাঁর কঙ্কাল। জীবনের শেষ ছ বছরে যখনই কোনো উপলক্ষে দু'একটা কবিতা তিনি রচনা করেছেন, দেখা যায়, সেই সব কবিতার ভেতর দিয়ে তাঁর অন্তরের এই অভাব—এই অর্থচিন্তাই অভিব্যক্ত হয়েছে বেদনার্ত ভাষায়। এই ছিল তাঁর ললাট-লিখন—নিয়তির নিদারুণ পরিহাস, মর্মান্তিক নিষ্ঠুরতা।

১৮৬৯। মে মাস।

ছেলে-মেয়ে নিয়ে আঁরিয়েতা য়ুরোপ থেকে ফিরলেন।

মাইকেল আগে থেকেই মাসিক ৪০০৲টাকা ভাড়ায় লাউডন ষ্ট্রীটে একখানি সুরম্য দোতলা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। এইখানে তাঁর জীবনের তিনটি বৎসর অতিবাহিত হয়। এই সময়ে ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ে তাঁর কিছু উন্নতিও হয়েছিল। অদৃষ্টের ক্ষণস্থায়ী করুণায় "এই সময়ে তাঁহার সৌভাগ্য-সূর্য উদিত হইয়াছিল ; কিন্তু সেই সূর্য তাঁহার ভাগ্যাকাশের মধ্য পথে উপনীত হইতে না হইতে, কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।" মেদিনী তখন মাইকেলের জীবনের রথচক্র গ্রাস করতে আরম্ভ করলো। প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় মাইকেল তখন উপনীত। দীপাবলী তেজে উদ্ভাসিত সৌধকিরীটিনী স্বর্ণলঙ্কার স্বপ্ন আজ আর কবির চিত্তে কোনো ছায়াপাত করে না। তাঁর জীবন-উদ্যানে যৌবনের কুসুমদাম আজ বিশুষ্ক, মুরজ ও রবাব ধ্বনি নীরব। নিস্তব্ধ দুন্দুভির জীমূতমন্দ্র। প্রদীপ্ত অগ্নি তখন ভস্মাবশেষে পরিণত।

মাইকেল হাইকোর্টে চাকরি নিলেন—প্রিভি কাউন্সিল রেকর্ডস-এর পরীক্ষকের চাকরি। মাসিক বেতন—এক হাজার টাকা। নির্দিষ্ট উপার্জনের মধ্যে মাইকেলের দিনাতিপাত হয়। আর্থিক অসচ্ছলতায় তাঁর চিত্ত তখন ভারাক্রান্ত। ঋণের বোঝা তখন আগের চেয়ে আরো ভারি হয়ে উঠেছে। দেনার দায়ে পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকাংশই তখন একে একে বিকিয়ে গেছে। চাকরি ছেড়ে দিলেন—আবার ব্যারিস্টারি শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর রথচক্র তখন মাটির তলায় অনেকখানি নেমে গেছে।

১৮৭১।

দীর্ঘ পাঁচ বছরের ব্যবধানে মাইকেলের নূতন বই বেরুলো। হেক্টরবধ কাব্য। সম্পূর্ণ নূতন রীতিতে তাঁর প্রথম গদ্যরচনা। এ বই তাঁর "গ্রীকভাষা ও হোমারের প্রতি আন্তরিক অনুরাগের ফল।" হোমারের 'ঈলিয়াদ' কাব্যের উপাখ্যানভাগের অনুবাদ এই বই। অনুবাদও সম্পূর্ণ নয়। বাংলা ভাষায় হোমারের অনুবাদ এই প্রথম। সাহিত্যকর্মের সর্বক্ষেত্রেই মাইকেল প্রথম। অমিত্রাক্ষর ছন্দের মতো মাইকেল এক অভিনব বাংলা গদ্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। "সংকল্পের সূচনা—রেখাপাত হইয়াছিল ; কিন্তু কার্য সিদ্ধি হয় নাই ; আরব্ধ গ্রন্থও সম্পূর্ণ হয় নাই।" অলঙ্কারসমন্বিত গদ্য বাংলা ভাষায় এই প্রথম। হেক্টরবধের গদ্য অনেকটা জার্মান ছাঁচে ঢালা। গ্রন্থখানি মাইকেল তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নামে উৎসর্গ করেন। ভূদেব তখন বাংলা সাহিত্যে একজন বিশিষ্ট প্রবন্ধলেখক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। উৎসর্গপত্রের একাংশে মাইকেল তাই লিখেছিলেন :

> "এ বঙ্গদেশে যে তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম, তাহার কোনই সন্দেহ নাই ; কেন না, তোমার পরিশ্রমে মাতৃভাষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। পরমেশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন, এই প্রার্থনা করি। যে শিলায় তুমি, ভাই, কীর্তিস্তম্ভ লিখিতেছ, তাহা কালও বিনষ্ট করিতে অক্ষম।"

ভূদেব তখন চুঁচুড়ায় সরকারী কর্মে নিযুক্ত। সেখান থেকে তিনি মাইকেলকে চিঠি লিখলেন :

> "ভাই, তুমি স্বপ্রণীত হেক্টরবধ কাব্য গ্রন্থে আমার নামোল্লেখ করিয়া আমাদিগের পরস্পর সতীর্থ সম্বন্ধের এবং বাল্য প্রণয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছ। আমি কখনই সে সম্বন্ধ এবং সেই প্রণয় বিস্মৃত হই নাই, হইতেও পারি না। তোমার শক্তির প্রকৃত গরিমা বোধাতীত ছিল। তুমি ম্রিয়মাণ মাতৃভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করিলে, তুমি ইহাতে সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিলে···তোমার এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ সার্থক।"

১৮৭২।

বাণীর বরপুত্র মাইকেলের ভাগ্য এখন নিম্নগামী।

আর্থিক অবস্থা দারুণ শোচনীয়। মানসিক অশান্তি দুঃসহ।

কর্ণের রথচক্র মেদিনী যেন ক্রমেই গ্রাস করছে। সাহেব পাড়ার ব্যয়বহুল জীবনযাত্রা নির্বাহ মাইকেলের পক্ষে এখন সাধ্যাতীত হয়ে দাঁড়াল। নিরুপায় কবি অবশেষে 'বামুন পাড়ার' মোহ কাটিয়ে উঠে এলেন কলকাতার মেটে ফিরিঙ্গিদের পাড়ায়—বেনেপুকুরে। কলকাতার দেশীয় খ্রীষ্টান পল্লীতে ভাড়া নিলেন একটি সাধারণ বাড়ি। এইখানে এসেই গৌর বসাককে এক চিঠি লিখে কবি জানালেন—"alas, I am miserable" এবং আরো লিখলেন—"ভাই এসো, তোমাদের অপদার্থ মাইকেল মধুসূদন দত্তকে একবার দেখে যাও।" এই সময়ের একটি ঘটনা। "বিপন্ন হইয়া মধুসূদন বর্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুরকে তাঁহাকে রাজকবি করিবার জন্য অনুরোধ করেন। বন্ধু হইলেও বর্ধমানাধিপতি মধুসূদনের গ্রহবৈগুণ্যে তাঁহার অনুরোধ রক্ষায় মনোযোগী হইতে পারেন নাই।"

ব্যারিস্টারি করে দিন আর চলে না। আবার মাইকেল চাকরি নিলেন—পঞ্চকোটের মহারাজার ম্যানেজার নিযুক্ত হলেন। তখন তিনি ঋণভারে অবসন্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য। পাওনাদারদের উপদ্রবেই মাইকেল কলকাতা ছেড়ে এইখানে চলে আসেন। কিন্তু বিরূপ ভাগ্য এখানেও তাঁকে অনুসরণ করলো। স্বাধীনচেতা মাইকেল ম্যানেজারি করতে গিয়ে প্রতি পদে স্বার্থান্বেষী ও অসাধু রাজকর্মচারিদের দ্বারা বাধা পেতে লাগলেন। আট মাসের বেশি এ চাকরি তিনি করতে পারেন নি। পঞ্চকোটের চাকরিই মাইকেলের ইহজীবনের শেষ কর্ম। অতঃপর? মাইকেলের এক জীবনচরিতকার লিখেছেন:

> "১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে মধুসূদন যখন পুনর্বার হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি কণ্ঠনালীর প্রদাহ, হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম, প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি, রক্তবমন ও তদবস্থায় জ্বর প্রভৃতি নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সেই অনিন্দ্যসুন্দর অনবদ্য স্বাস্থ্য, সেই মত্তমাতঙ্গাধিক শারীরিক শক্তি মলিন ও নিস্প্রভ হইয়া গিয়াছে!"

এ যেন কুরুক্ষেত্রের রণে ভগ্নউরু কুরুরাজের অবস্থা।

মাইকেল যখন এইভাবে প্রাণসংশয় পীড়ায় শয্যাগত, তখন বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে দুইটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বছর (১৮৭২) সাধারণ রঙ্গালয়—ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং এই বছরই স্বদেশ, সমাজ, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির আলোচনায় নবজাগ্রত বাঙালিকে প্রবুদ্ধ করবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রতিষ্ঠা করেন। ন্যাশনাল থিয়েটার দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক নিয়ে পাদপ্রদীপের আসনে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলো ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে মাইকেল এই খবর পেলেন। এই ন্যাশনাল থিয়েটারেই ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকখানিও মঞ্চস্থ হয়। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে মাইকেল এ সংবাদও পেলেন। জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্ন মাইকেলের, কিন্তু এর স্রষ্টার গৌরব দীনবন্ধু মিত্রের। আবার, মাইকেল ও দীনবন্ধুর মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান মাত্র চার মাসের। ন্যাশনাল থিয়েটার ও বঙ্গদর্শন—এই দুটি ঘটনাই মাইকেলের জীবিতকালের সর্বশেষ ঘটনা এবং উনিশ শতকের রেনেসাঁর তৃতীয় পর্বের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বেঙ্গল থিয়েটার স্থাপিত হলো। বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য মাইকেল এই সময়ে দু'খানা নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন। একখানি মাত্র তিনি সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। সেই নাটকখানির নাম 'মায়াকানন'। মাইকেলের সর্বশেষ রচনা। নাটক দিয়েই মাইকেলের সাহিত্য-জীবন শুরু, নাটক লিখেই সেই জীবনের অবসান। বাহান্ন বছর বয়সে, মনেপ্রাণে জর্জরিত ও ভগ্নস্বাস্থ্য মাইকেল একটি নূতন থিয়েটারের জন্য একখানি নূতন নাটক রচনা করছেন, নিঃসন্দেহে এ ঘটনা তাঁর প্রতিভারই পরিচায়ক। নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ অবশ্য এর জন্য তাঁকে অগ্রিম পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন। মাইকেলের মুন্সী কৈলাসচন্দ্র বসু এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "মায়াকানন তাঁহার শেষ সম্পূর্ণ নাটক। গ্রন্থ রচনাকালে তাঁহার লেখনী ধারণে শক্তি না থাকায় আমি তদীয় শয্যাপার্শ্বে বসিয়া 'মায়াকানন' লিখিতাম। মুহুর্মুহু রক্তবমন হইত, রোগের জ্বালা দুঃসহতর হইত, তথাপি নাটক রচনায় বিরতি ছিল না।"

দুরারোগ্য রোগ, দারুণ অর্থকষ্ট, মানসিক অশান্তির মধ্যে মাইকেল এই বিয়োগান্ত নাটকখানি রচনা করেন। নাটকের মর্মন্তুদ দৃশ্য মাইকেলের জীবনেরই করুণ কাহিনী। এই নাটকের সব কথাই প্রায় মাইকেলের জীবনের কথা। তাই নাটক হিসাবে এর বিশেষত্ব কম। কোনো চরিত্রই পুষ্টিলাভ করে নি। উপাখ্যানভাগ সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

জীবনের শেষ কয়টি দিন মাইকেল বিষাদের মধ্যেই অতিবাহিত করেন। তাঁর উল্কা জ্বালাময়ী প্রকৃতির মানস-আকাশ এখন শুধু বেদনা ও ব্যর্থতার নিবিড় মেঘে ঢেকে গেছে। শুধু শোনা যায় এক ভূলুণ্ঠিত জীবনের করুণ বিলাপের অন্তঃসঙ্গীত। তারপর, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন, রবিবার, বেলা দুটোর সময়ে আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে মাইকেলের মৃত্যু হলো। অনন্ত কল্পনার নভোলোকে যৌবনের দীপ্ত প্রত্যয় নিয়ে বিদ্রোহী কবির বিশ্বপরিক্রমা আজ শেষ। মৃত্যুর পূর্বে মাইকেলের শেষ কথা—"আমি মানুষের গড়া গির্জা মানি না; আমার ঈশ্বর আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্রামাগারে আশ্রয় দিবেন।" বিপ্লবী-চিত্তের যন্ত্রণাদাহ আজ শেষ। যে বেদনায় মাইকেল সাংসারিক সুখ এবং দুঃখে সর্বাধিক জ্বলে পুড়েছেন—সেই বেদনা আজ আর নেই। বঙ্গের পঙ্কজ-রবি অস্তাচলে গেলেন—পিছনে রেখে গেলেন অগ্নিদগ্ধ বিশুদ্ধ স্বর্ণের বিভা—তাঁর জীবনব্যাপী কবিকর্ম, যার মধ্যে সার্থক হয়েছে উনিশ শতকের সংঘাতমুখর নবজাগরণ। প্রাণ-গঙ্গার নিরুদ্ধ গতিকে অবারিত মুক্তি দিয়ে কাব্যে নবীন প্রেরণার সঞ্চার করে নবযুগের শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিনিধি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন দিবা দ্বিপ্রহরে। নীরব হলো কবি-পুরুষের কণ্ঠস্বর।

আমাদের চোখের সামনে উনিশ শতকের নবজাগরণের ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে যেন একখানি পরিপূর্ণ গ্রীক ট্র্যাজেডি অভিনীত হয়ে গেল। বাংলার মাটিতে মাইকেলের মত বিরাট প্রতিভাধরের জন্ম নিঃসন্দেহে বাঙালি জাতির বহু তপস্যার ফল। বাংলার সাহিত্য-ইতিহাসে কবির আসন, অক্ষয় অমরত্বে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু বাংলার বর্তমান ইতিহাসে মাইকেলের আসন আজো শূন্য ও অপূর্ণ।

॥ গ্রন্থ-নির্দেশিকা ॥

১। **মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত**—যোগীন্দ্রনাথ বসু
২। **মধুস্মৃতি** —নগেন্দ্রনাথ সোম
৩। **কবি শ্রীমধুসূদন** —মোহিতলাল মজুমদার
৪। **মাইকেল মধুসূদন** —প্রমথনাথ বিশী
৫। **মধুসূদন** —শশাঙ্কমোহন সেন
৬। **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ**—শিবনাথ শাস্ত্রী
৭। **সেকাল আর একাল** —রাজনারায়ণ বসু
৮। **আত্মচরিত** —রাজনারায়ণ বসু
৯। **হিন্দুকলেজের ইতিবৃত্ত** —রাজনারায়ণ বসু
১০। *Life of David Hare* —Peary Chand Mitra
১১। *Bengal Celebrities* —Ram Gopal Sanyal
১২। *Recollections of Alexander Duff*—Lal Bihari De
১৩। *Alexander Duff* —George Smith
১৪। *Life of Derozio* —Edward Thompson
১৫। *Recollections of Michael M. S. Dutt*
—Rev. K. M, Banerjee
১৬। *Life of Michael Madhusudan Dutt*
—Kishori Lal Haldar

"এই প্রাচীন দেশে দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন। স্মরণীয় বাঙালির অভাব নাই। কুল্লুকভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দদাস, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন-নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল। কাল প্রসন্ন, সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও। তাহাতে নাম লেখ, 'শ্রীমধুসূদন'।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

॥ দাম চার টাকা ॥